চিত্রদর্শন

চিত্রদর্শন

কানাই সামন্ত

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড
৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড : কলিকাতা ৯

শান্তিনিকেতন
৩ কার্তিক ১৮৭৯ শক

শ্রীমান্ কানাই সামন্তর চিত্রদর্শন বহিটির প্রায় সব প্রবন্ধ আমি পড়েছি বা শুনেছি। ইহার সব লেখা খুবই তথ্যপূর্ণ ও মনোজ্ঞ হয়েছে। ভারতীয় চিত্রশিল্প সম্বন্ধে এইরূপ একটি বহির অভাব ছিল, তাহা শিল্পী কানাই সামন্ত পূরণ করেছেন। শিল্পের বিষয়ে তিনি আরও এইরূপ আলোচনা ক'রে শিল্পী ও শিল্পরসিক-দিগকে শিল্পের যথার্থ স্বরূপ বুঝিবার সাহায্য করিতে থাকুন এই আমার আশীর্বাদ।

নিবেদন

এই গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রেরণায় লেখা। অনেকগুলি বিশ্বভারতী পত্রিকা, তরুণের স্বপ্ন, উত্তরসূরী, দেশ প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় পূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। পাণ্ডুলিপি থেকেই পুস্তকে স্থান পেয়েছে— ভারততীর্থদর্শন, অবনীন্দ্রনাথ, চিত্রসূত্রাবলী। বহু প্রবন্ধই লেখা হত না, যদি না অযাচিতভাবে এই গ্রন্থপ্রকাশে উৎসাহিত হতেন শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ফলতঃ গ্রন্থ-প্রকাশের সংকল্প গ্রহণের পরেই, এমন-কি ১৩৬৪ কার্তিকে (শক ১৮৭৯) পাণ্ডুলিপি ছাপাখানায় পাঠানোর পরেও, বহু প্রবন্ধ লেখা হয়েছে। কাজেই, প্রকাশন বা মুদ্রণ -সংক্রান্ত বহুখ্যাত দীর্ঘসূত্রতা সব সময় আর সকল প্রকারেই যে অহিতকর তাও বলতে পারি নে।

ধারাবাহিক একটি প্রবন্ধ না হওয়াতে, একই প্রসঙ্গ বা একই প্রকার উক্তি কোথাও কোথাও দ্বিরুক্ত হয়ে থাকবে, নূতন তথ্যের আবিষ্কারে বা তত্ত্বের ভাবনায় আত্মখণ্ডন হয়েছে কি না তাও নিশ্চিত বলা যায় না— আশা করি সুধীমানসহংস নিজগুণে নীর ত্যাগ ক'রে, পরিমাণে অল্পই হোক, ক্ষীরটুকু গ্রহণ করবেন।

মুদ্রণের পূর্বে বা পরে, কোনো-না-কোনো সময়ে, পূজনীয় শিল্পী শ্রীনন্দলাল বসু এই গ্রন্থের সকল প্রবন্ধই পড়েছেন বা শুনেছেন, প্রসন্নমনে অনুমোদন করেছেন —এটি আমার পরম সৌভাগ্য বলতে হবে। তাঁরই আঁকা পদ্মপ্রতীকে আখ্যাপত্র অলংকৃত। অনেকে অনেক দিক দিয়ে আনুকূল্য করেছেন, যথাস্থানে উল্লেখ করতে যত্ন করেছি। অনুজকল্প শ্রীমান্ সমীরণ চট্টোপাধ্যায় ও প্রীতিভাজন শ্রীমান্ সাধন চট্টোপাধ্যায়, গ্রন্থপ্রকাশে এঁদের উৎসাহ এবং সহযোগিতা নানাভাবে ফলপ্রসূ হয়েছে। লেখকের সতীর্থ শিল্পী শ্রীশিশিরকুমার ঘোষ অজন্তা গুহা-চিত্রের আদলে এই গ্রন্থের প্রচ্ছদ এঁকে দিয়ে বিশেষ বন্ধুকৃত্য করেছেন, বাচিক কৃতজ্ঞতা-নিবেদনে সে ঋণের শোধ হবে না। প্রুফ দেখার বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে সহায়তা করেছেন শ্রীগগনচন্দ্র দে, শ্রীজগদিন্দ্র ভৌমিক এবং শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত —এ তাঁদের বিশেষ প্রীতিরই পরিচয় ব'লে স্বীকার করি। সুহৃদ্‌বর শ্রীপুলিনবিহারী সেন যে বন্ধুকৃত্য করেছেন তারই উজ্জ্বল নিদর্শনরাজি এ গ্রন্থের বিশেষ ভূষণস্বরূপ হয়েছে। ভূষণই বা বলি কেন, তাঁর সক্রিয় আনুকূল্য ব্যতীত বহু চিত্র বা চিত্রের ব্লক বর্তমান লেখক ও প্রকাশকের অলভ্য হত এবং সেই-সব সাকার সাক্ষ্য না হলে এই গ্রন্থের নানা প্রতিপাদ্য বিষয়ও অব্যক্ত বা অপরিস্ফুট থেকে যেত। শান্তিনিকেতন-আশ্রমিকসংঘ কর্তৃক প্রকাশিত

An Album of Nandalal Bose অতি মূল্যবান গ্রন্থ; তারই কতকগুলি ব্লক এবং তা ব্যবহার করার অনুমতি-লাভের ব্যাপারে, আশ্রমিকসংঘ এবং বন্ধুবর শ্রীক্ষেমেন্দ্রমোহন সেনের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ আছি। এই উৎকৃষ্ট প্রতিচিত্রাবলীর গুণে গ্রন্থের মান ও মর্যাদা বহুগুণে বর্ধিত। অন্যান্য ছবি বা ছবির ব্লকের জন্য যাঁদের কাছে গ্রন্থকার ও প্রকাশক ঋণী, কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁদের নামোল্লেখ করা হয়েছে বিস্তারিত আলেখ্যসূচীতে।

শ্রদ্ধেয় শ্রীঅজিত ঘোষ মহাশয় তাঁর সংগ্রহভুক্ত বহু চিত্রের প্রতিরূপ-প্রকাশে অনুমতি শুধু দেন নি, উৎসাহ দিয়েছেন এবং নানা মূল্যবান গ্রন্থ দেখবার সুযোগ দিয়ে বাধিত করেছেন।

গ্রন্থশেষে, পরিশিষ্টেরও শেষে, অবনীন্দ্রপ্রতিভা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত কিন্তু সারগর্ভ আলোচনা করেছেন আচার্য নন্দলাল। এইখানে শিল্পীশ্রেষ্ঠ নন্দলালের প্রাতিভ সৃজনের নবতন স্ফূর্তি সম্পর্কে ন্যূনতম উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না। চলতি-কালের হিসাবে, অথচ চিরকালের জমার ঘরে, আজ এই তারিখে মাত্র যেটি লিপিবদ্ধ করা চলে, প্রায় এক বৎসর পূর্বে, 'নন্দলাল' প্রবন্ধ -রচনাকালে তা সম্ভবপর ছিল না।

বর্তমান প্রসঙ্গে কিছু বলবার পূর্বে শিল্পী নন্দলাল সম্পর্কে শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথের একটি উক্তি এ স্থলে উদ্ধার করা যেতে পারে। একখানি চিঠিতে তিনি লিখেছেন: আর্টিষ্ট মাত্রেই দুই পথ অবলম্বন করে; এক প্রাচীন শিল্পের মধ্যে নিবিষ্ট হওয়া আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে প্রাচীনের সঙ্গে যোগ রাখিয়া নূতন নূতন সৃষ্টির দিকে অগ্রসর হওয়া। [১]সুরেন্দ্রের জীবন প্রথম পথে গিয়াছে। নন্দলাল দ্বিতীয় পথে চলিতেছে।[২]

এখন আলোচ্য বিষয়ে সংক্ষেপে বলা যাক্। পূজনীয় শিল্পী নন্দলালের অজস্র শিল্পকৃতির যতদূর ইঙ্গিত গ্রন্থনিবদ্ধ 'নন্দলাল' প্রবন্ধে ও বিভিন্ন প্রতিচিত্রে ধৃত হয়েছে, পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার-বিশ্লেষণ ও বর্ণনা নেই বটে— সেজন্য যোগ্যতর জনের সুপরিণত রূপরসজ্ঞতা, প্রচুর তথ্যসংকলন ও সুচির অধ্যবসায় অপরিহার্য — বিভিন্ন পর্যায়ের ও বিচিত্র শৈলীর যে আলেখ্যমালা স্মরণে জাগরূক রেখে ঐ প্রবন্ধ লেখা হয়েছে, আমাদের বিশেষ সৌভাগ্যে তার পরেও শিল্পীর অনিঃশেষ চিত্রসৃষ্টির ধারায় নূতন প্রেরণা, নূতন রূপরস, নূতন প্রাণ ও নূতন ছাঁদ দেখা

[১]সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন নন্দলালের সতীর্থ। বাখরগঞ্জ জেলার শুক্তাগড়ে জন্ম; মাত্র ২৪ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। নন্দলাল ও সুরেন্দ্রনাথ উভয়ের নামোল্লেখে অবনীন্দ্রনাথকে বলতে শুনেছি: আমার ডান হাত, বাঁ হাত।

[২]প্রবাসী, পৌষ ১৩১৬, পৃ. ৭৫৯

দিয়েছে। রূপরসিকের পক্ষে নূতন বিস্ময় অবশ্যই বলা যেতে পারে। জনসমাজে-অপরিচিত কালী-তূলির এই ছবিগুলি সম্পর্কে উপস্থিত এইমাত্র বলা যেতে পারে, অবনীন্দ্রনাথের শেষ দিকের বহু চিত্রে[৩], রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সের কবিতায়, বিরলভূষণ— 'আমার এ গান ছেড়েছে তার সকল অলঙ্কার' —স্বভাবসরল রূপ-রীতির আশ্রয়ে যেমন গহন গভীর উপলব্ধি, নির্ভর ও শান্তি, পারগামী ভাবনা ও কল্পনা অচেষ্টায় পরিস্ফুট হয়েছে, এ ক্ষেত্রেও অনুরূপ একটি ব্যাপার লক্ষণীয়। পূজনীয় প্রবীণ শিল্পীর এই অভিনব চিত্রকৃতির চমৎকারজনক পরিচয়-লাভে দেশ-বিদেশের দৃষ্টিবান্ রসিকজন যথাকালে ধন্য হবেন। ইতি

কানাই সামন্ত

জোড়াসাঁকো। কলিকাতা
মহালয়া ১৮৮১ শকাব্দ

[৩]এরূপ বহু ছবি শ্রীমতী প্রতিমাদেবীর সংগ্রহে ছিল ; ভারত সরকার ক্রয় করেছেন

প্রসঙ্গসূচী

চিত্রসূচী

কতকগুলি মূলচিত্রের বর্তমান ঠিকানা না জানায়, বা ভ্রান্তি-বশতঃ, ঠিকমত ঋণ-স্বীকার করা গেল না এ ত্রুটি মার্জনীয়। আচার্য শ্রীনন্দলাল বসুর যাবতীয় চিত্রকৃতির প্রতিচিত্র পূজনীয় শিল্পীর অনুমতি-ক্রমে মুদ্রিত।

উৎসর্গ

পূজনীয়

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ও

শ্রীনন্দলাল বসু

শ্রীচরণেষু

জন্মাষ্টমী

১৮৮১ শক
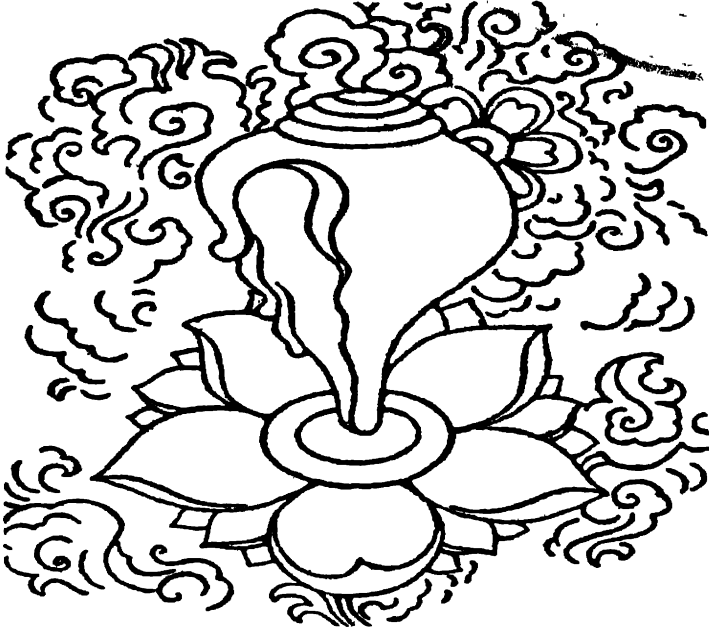
শঙ্খ ও শতদল।

উন্মীলিত রূপের পরিপূর্ণতায় উন্মুখর 'ধ্বনি'র আবির্ভাব।

আলোকে-ও-চেতনায়-প্রস্ফুটিত শতদলের আনন্দিত ছন্দিত মিলন বিশ্বের শত দিকে। অর্থবহ বাণী যুগপৎ শ্রুত এবং অশ্রুত: অন্তঃকর্ণে তার রেশ নিঃশেষিত হয় না কোনো-কালে।

নেত্রগোচর অনিন্দ্যরূপ, শ্রুতিগোচর তানলয়-বদ্ধ সুর, আসলে অভিন্ন : উৎপত্তি ও লয় তার চেতনায় বা আনন্দে।

আনন্দিত চেতনার প্রতি পদক্ষেপে অগণনিত রূপের শতদল সততই উন্মুদিত ও মুদ্রিত হয়, সুর ও স্বর ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়— যেমন মর্তজীবনে তেমনি মানুষের রূপকলায় (নৃত্য গীত চিত্র মূর্তি ও কবিতায়) এই নিঃসীম তাৎপর্য নিহিত দেখি।

কৃষ্ণলীলা

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শিবসীমন্তিনী

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
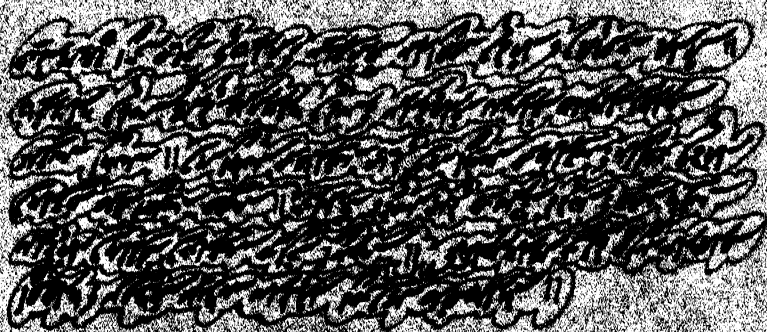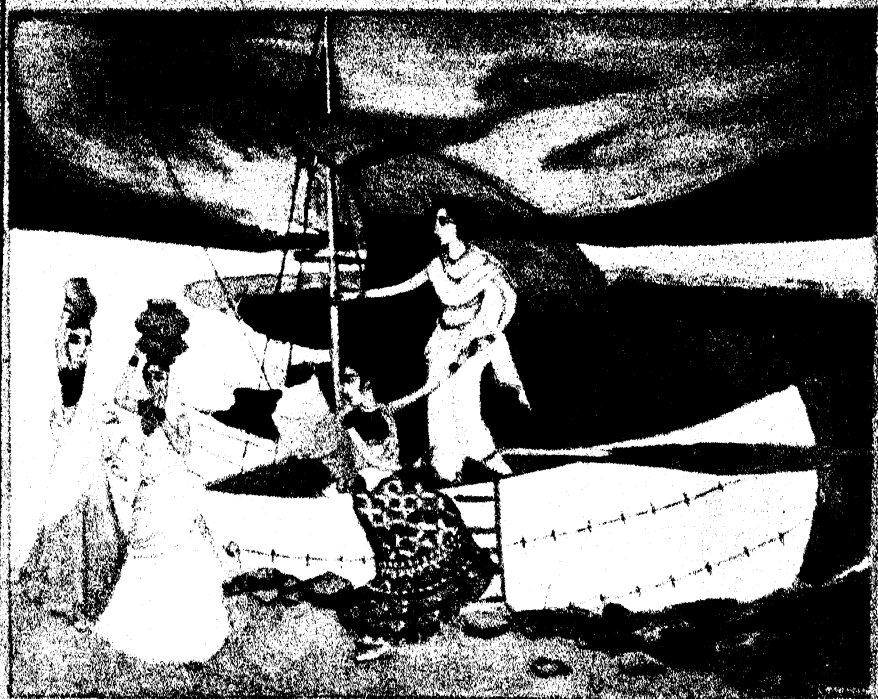
শিল্পের স্বরূপ

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।

তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি ॥

একই বৃক্ষে দুই সুপর্ণসখা। একটি পাখি মধুর বা তিক্ত ফল ভোগ করে, অন্যটি চেয়ে দেখে।

সুখকর আর দুঃখকরের উপলব্ধি ঘটে তারই যে ফলভুক্। অতএব সেই বোঝে কী যে ভালো আর কী যে মন্দ, কোন্‌টি তার লোভের সামগ্রী আর কোন্‌টি তার ত্যাগ করাই ভালো। অথচ যেমন ভাবেই চেষ্টা করা যাক, ভালো আর মন্দ, হর্ষ আর বিষাদ, জ্ঞান ও অজ্ঞান, আলো এবং অন্ধকার— অচ্ছেদ্য বাঁধনে বাঁধা। অবিমিশ্রভাবে একটিকেই বেছে নেবার কোনো উপায় নেই।

এ দিকে যে শুধু দ্রষ্টা সেই মুক্ত ও শান্ত, শাশ্বতকাল সেই তো সুখী, আনন্দময়। ফল সে ভোগ করে না, ভোগ করে ফলভোক্তাকে। কাজেই বিভিন্ন ফল, বিভিন্ন স্বাদ, বিভিন্ন ক্ষণের বিচিত্র উপচয় আর ক্ষয়— কিছুতে নেই তার কোনো আসক্তি। শুভে অশুভে, সুখে দুঃখে, লাভে ক্ষতিতে, জয়ে পরাজয়ে যে একান্ত ভেদ জীবের অমূলক কল্পনামাত্র সেই ভেদকে সত্য বলে সে তো গণনা করে না; সেই ভেদের ভূমিতে উর্ধ্বাসীন তার স্থিতি, পদ্মপত্রে জ্যোতির্বিচ্ছুরিত শিশিরবিন্দুরই মতো। অভেদের সম্বন্ধে আর অখণ্ড সমগ্রের উপলব্ধিতে দেখা যায়, নিখিলের সর্ব সত্তাই অনির্বচনীয় আনন্দের স্ফুরণ; অবিকৃত আনন্দই অখণ্ড একের স্বভাব।

উপনিষদের পরবর্তী শ্লোক-দুটিতে বলা হয়েছে, সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বের টানাপোড়েনে বোনা জটিলঘন জালে বিজড়িত এই পাখি সহসা উর্ধ্বে চেয়ে আবিষ্কার করে আপন মহিমায়, আপন আলোকে প্রচ্ছন্ন, আনন্দিত, অবিচলিত, শান্ত ওই বিহঙ্গকে যে তার আপনারই স্বরূপ; চেয়ে চেয়ে সত্তা থেকে স্খলিত হয়ে পড়ে তার ক্ষণিক যত উল্লাস আর অলীক যত যাতনা, ক্লেশ— পার্থিব সুখ সেও তো নিশ্চিত দুঃখেরই সম্ভাবনা— চেয়ে দেখতে দেখতে আপন ঋত ও মহিমময় স্বরূপেই হয় এ আবৃত, পায় চিরন্তন আবাস ও নিঃশেষ আত্মপরিচয়।

মুণ্ডক উপনিষদের আশ্চর্য এই রূপাখ্যান, মন্ত্রময়ী এই বাক্‌পরম্পরা, ঋজুগতি নিশিত শরের মতো বিদ্ধ হয়েছে দেখি নিখিল জীবন-রহস্যের অন্তরতম অন্তরে।

ফলভুক্ বিহঙ্গ তো অন্য কেউ নয়, মন প্রাণ দেহের আবরণস্তরে আবৃত এই মানবাত্মা। ঊর্ধ্বে শান্তিতে আসীন বিহঙ্গম আত্মারই আত্মা বা পরমাত্মা। যে পর্যন্ত আছে মানুষ হর্ষ শোক, পুণ্য পাপ, আলো অন্ধকার, জাগৃতি ও মোহ, থাকা আর না-থাকার খণ্ড ক্ষুদ্র ছিন্ন বিচ্ছিন্ন জীবনে ক্ষণনির্ভর হয়ে— প্রত্যেকটি অস্থির ক্ষণ এই আছে এই নেই, আছে কি নেই জানবার সময় ও সুযোগ নেই কোনো— যে পর্যন্ত এই মায়িক জগতে মায়ার অধীন হয়ে আছে, সে পর্যন্তই তার পরিচয় সাধু বা অসাধু, প্রাজ্ঞ বা অজ্ঞ, ধনী বা দরিদ্র, সুস্থবুদ্ধি বা বাতুল, মানুষের তথা মনুষ্যসমাজের নৈতিক ও মানসিক বিচার-বিবেচনায় নির্ধারিত এমন অসংখ্য অভিধানে।

এই মানুষ শিল্পী নয়, কবি নয়, স্বরূপদ্রষ্টা ঋষি নয়। শিল্পী কবি বা ঋষির পদবীতে কখন হয় সে উত্তীর্ণ? যখন আপন মুক্ত শান্ত নিরাবৃত স্বরূপ থাকে তার দৃষ্টি বা চেতনার গোচরে। যতক্ষণ সেই স্বরূপের ধর্মেই থাকে সে বিধৃত, যে ধর্মের স্বল্পও মহাভয় থেকে, অজ্ঞান ও মোহ থেকে ত্রাণ করে। যে পর্যন্ত আপনাকে সে জানে আপন স্বরূপেরই জ্যোতি ও চেতনার, শান্তি ও সমতার, স্বভাবগত ও সর্বগত আনন্দের নিষ্ক্রিয় আধার বা প্রণালী -রূপে— উন্মুক্ত দ্বার বা বাতায়ন -রূপে। যে ভাবে বা যে উপলক্ষেই হোক, অন্তরতম আত্মার সঙ্গে এই একাত্মতা যে ভাগ্যবান্ যে পরিমাণে অর্জন করে সেই পরিমাণেই সত্য ও সার্থক হয়ে ওঠে তার শিল্পস্রষ্টৃত্ব কবিত্ব বা ঋষিত্ব।

তখন তুচ্ছ মৃৎপাত্র আর শিলামূর্তিই অমৃতে বা রসে উপচে ওঠে। মানুষের মুখের ভাষাই ছন্দের বেগে ও সুরের পাখায় চিন্তার অতীত ঊর্ধ্বে আর কল্পনার অমেয় গভীরে নিয়ে যায় এই মানুষী চেতনাকে। তখন মৃত্যুতেও অমরতার উপলব্ধি ঘটে, বন্ধনেও মুক্তির স্বাদ পাওয়া যায়, অস্থির বাসনা-বেদনার অন্তরে স্থির শান্তি ও গভীর সুখের স্মিতহাস্য দেখা যায়— এক কথায়, সত্যের মুখ থেকে মায়াগুণ্ঠনের অপসৃতিতে মানুষ 'নন্দতি নন্দতি নন্দত্যেব'।

সত্য কী বস্তু? আমরা যা হয়ে উঠছি সেই সত্য। তর্ক দিয়ে যা নির্ণয় করতে চাই, ইন্দ্রিয় দিয়ে যা দেখি শুনি, সত্য তা নয়।

তর্কসহচারী ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষে যা জানি তা জানি বাইরে থেকে আর অনিশ্চিত ভাবে। অনুভবে, অর্থাৎ যা ভব, যা হয়েছে, তারই অনুসরণে, আমরা অন্তরের নিধিকেই অন্তরে পাই। আর, নিষ্কল চৈতন্যের অবর্ণ ভাস্বরতায় স্বভাবতই দীপ্ত হয়ে ওঠে যে প্রেম তাতে ঘুচে যায়— আমি আর তুমির ভেদ, এই ক্ষণ আর পরক্ষণের মায়া, সত্যের সম্পর্কে সকল তর্ক আর সকল সংশয়।

এ প্রশ্ন তবে নিরর্থক, শিল্পী, কবি, ঋষি, কে কতখানি বাঁধা নীতির বাঁধনে।

শিল্পী কবি বা ঋষির আসন ও অস্তিত্ব সুনীতি দুর্নীতির ঊর্ধ্বে। সুখ-দুঃখ শুভ-অশুভের উৎপত্তি তথা সুনীতি-দুর্নীতির বিচার, বিভেদের বোধ থেকেই এসেছে— মুহূর্ত থেকে মুহূর্তের ভেদ, অভিজ্ঞতা থেকে অভিজ্ঞতার ভিন্নতা, ব্যক্তি থেকে ব্যক্তির দেহমনোবিচ্ছিন্ন অলীক ও অসংখ্য সীমা। সর্বব্যাপী একের জ্যোতির্-বিভাসিত সাক্ষাৎকারে বা তার আভাসমাত্রেও এই ভেদ ও অনৈক্যের ঐকান্তিক সীমা যায় লুপ্ত হয়ে। এরূপ প্রত্যক্ষে বা উপলব্ধিতেই যেমন ঋষির সত্য-আবিষ্কার তেমনি শিল্পী বা কবিরও রসরূপের সৃষ্টি। এই দৃষ্টি আর এই উপলব্ধি যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ সে লোকাচার শাস্ত্রাচার সমাজবিধি প্রভৃতি সাংসারিক সকল নীতির ঊর্ধ্বে; তার নাম নেই, সংজ্ঞার্থ নেই, সীমাবদ্ধ ব্যক্তিত্ব নেই— যে পরিচয়ে তাকে অন্য ব্যাপারে বা অন্য সময়ে চিনি আর জানি সে তো তার স্বরূপ নয়।

আরণ্য মৃগ বা ব্যাঘ্র নীতিবিহীন; যেখানে মন নেই, আত্মসমীক্ষা নেই, সেখানে আদৌ উদ্ভব হয় নি নীতির। মানুষের আছে মন, মানুষের আছে সমাজবদ্ধ জীবনযাত্রা, কাজেই মানুষেরই আছে সামাজিক সুনীতি বা দুর্নীতি। কিন্তু শিল্পী বা কবি বা ঋষি মনুষ্যদেহধারী হলেও, তাদের অন্তর্নিহিত শিল্পীসত্তা বা ঋষিসত্তা বিশুদ্ধ চেতনামাত্র। অর্থাৎ, সে শুধু জ্যোতি, সর্বত্র প্রসারিত হয়ে সব-কিছুকে প্রকাশ করে; সে শুধু বায়ু, সর্বত্র প্রবাহিত হয়ে নিশ্বাসে নিশ্বাসে সব-কিছুকে জীবন দেয় ও নিখিল জীবনকে আহরণ করে। আকাশের আলো, বায়ু— তার কি আছে কোনো নীতির বালাই?

প্রশ্নের জড় মরে না তবু— তবে কি শিল্পী কবি ঋষি এদের কায়িক বাচিক মানসিক কোনো প্রকারের কোনো চেষ্টা থেকেই কোনো অকল্যাণ বা পাপের সূচনা হয় না? না, তা হতে পারে না, যতক্ষণ এবং যে ব্যাপারে সে যথার্থই শিল্পী, কবি, ঋষি। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কথায়, বেতালে তার পা পড়ে না নৃত্যে যে সিদ্ধ; বহির্ভূত নীতিতে নয়, কিন্তু আন্তর্ভৌম ছন্দে ছন্দোময় তার সত্তা— আত্মার এই ছন্দ বাইরের দিক থেকে সংযম বলে প্রতীয়মান হলেও ভিতরের দিকে মুক্তি ছাড়া অন্য কিছু নয়।

গায়কের মুক্তি গানে, সুর ও তালের চিরবিচিত্র ও চিরচঞ্চল সমন্বয়ে; সুর বা তালের অবহেলায় বা তা থেকে স্খলনে নয়। কবির মুক্তি ছন্দোবেগতরঙ্গিত বাক্যে ও বাঙ্‌নিবদ্ধ প্রতিমা-পরম্পরায়; ছন্দোবিচ্যুত কোলাহলে বা মৌনে নয়। শিল্পীর মুক্তি রূপের পূর্ণতায় ও সৌন্দর্যে; অসুন্দর আকারহীনতায় নয়— অমৃতের আধার তো হতে পারে না মৃত্তিকার তাল বা ভগ্ন ভাণ্ড। প্রেমিকের মুক্তি সেবায় ও আত্মোৎসর্জনে; অহমিকাবদ্ধ বিরাগে বা ঔদাসীন্যে নয়। সত্যদ্রষ্টা ঋষির

মুক্তি বিশ্বতোমুখ চৈতন্যের প্রবাহে ও প্রসারে ; যা-কিছু ম্লান ও নিষ্প্রভ করে সেই আনন্দকে, সেই আলোককে, সেই শুধু দুর্নীতি— লোকাচার ও দেশাচার -লঙ্ঘনে কী যায় আসে যদি যথার্থ জীবন্মুক্তি থাকে অক্ষুণ্ণ।[১]

সামাজিক নীতি নিয়তপরিবর্তনশীল, দেশ কাল জাতি ও পরিবেশের নিত্য-পরিবর্তনে। নিত্যমুক্ত ও স্বভাবে অধিষ্ঠিত যারা তাদের যে নীতি সে তো বাইরের কোনো বিধিনিষেধ নয়, আপন অন্তরাত্মারই বিধান, অন্তরাত্মারই ইচ্ছার লীলা ও শক্তির প্রয়োগ।

মানব-সাধারণের চিত্তে ও জীবনে শিল্পের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া তবে কি কেবলই কল্যাণকর? পূর্ববর্তী আলোচনা থেকেই যদিও এ প্রশ্নের উত্তর স্পষ্ট হওয়া উচিত তবু সুনির্দিষ্ট ভাবেই বললে দোষ নেই।

সত্য ও সার্থক শিল্প— মন্দির, মূর্তি, চিত্র, কবিতা, গান— নীতিবিচারের বহির্ভূত বা উর্ধ্বস্থিত। এবম্বিধ রসরূপের স্রষ্টা বিশ্বস্রষ্টার মতোই উপস্থিত বিষয়ের সমুদয় মানসিক ও নৈতিক মূল্য বা মান সম্পর্কে বিবিক্ত; সে সবই রসসৃষ্টির উপলক্ষ মাত্র, লক্ষ্য নয়। আদিকবির মতোই এই রসরূপের কবিও বহুধাবিচিত্র জীবনের বৈচিত্র্যকে প্রকাশ করে আপন চেতনা দিয়ে, আস্বাদন করে অনাসক্ত অনুরাগে বা আনন্দে, এবং সেই স্বরূপের উদ্ভাস ও আনন্দের দিব্য-ভোগকেই সৃষ্টি করে, শরীরী করে ও রসিকমাত্রেরই দৃষ্টি শ্রুতি চিত্ত ও চেতনার গ্রাহ্য করে নানা ছলে— ধ্যানী বুদ্ধ; রাত্রিচর তস্কর; রভসবদ্ধ তরুণতরুণী[২]; দৃপ্ত শার্দূল, অরণ্যমেঘে প্রচ্ছন্ন-অনল বজ্রের মতো।

রূপকে উদ্ভাসিত করে আলোক। সূর্যের আলোক। কোথায় সে পড়ে না? কোথায় সে হেসে ওঠে না, হাসিয়ে তোলে না, এমন-কি, তথাকথিত কদর্যকে,

১ সাধু, ঋষি, পরমহংস এঁরা যে লৌকিক আচারও প্রায়শঃই রক্ষা করেন সে কেবল অজ্ঞ ও অবিপশ্চিত জনসাধারণের প্রতি করুণারই বশে। তাদের বুদ্ধিভেদ বা বিভ্রান্তি যাতে না ঘটে।

২ আত্মার দ্বারাই বিশ্বজীবনের সব-কিছু জানা যায়, চেনা যায়। সে পরিচয়ে আসক্তি নেই ব'লেই মলিনতা নেই। উপনিষদেই আছে—

যেন রূপং রসং গন্ধং শব্দান্ স্পর্শাংশ্চ মৈথুনান্।
এতেনৈব বিজানাতি কিমত্র পরিশিষ্যতে॥

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের তান্ত্রিক মতে সাধনার সিদ্ধিপর্বের কথাও স্মরণ করা যেতে পারে। গাঢ়বদ্ধ যুবক-যুবতীকে দেখামাত্র নিবিড় ব্রহ্মানন্দের উপলব্ধিতে তিনি সমাধিস্থ হয়ে গিয়েছিলেন। অর্বাচীন রুচিবিচারে নিন্দিত ও লজ্জিত পুরী ও কোণার্ক -মন্দিরের আদিরসাত্মক বহু মূর্তিকেই আচার্য নন্দলাল মনে করেন ভারতীয় 'শিল্পসৃষ্টির কতকগুলি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন'।

মলিনকে ? স্বরূপকে উদ্ভাসিত করে আনন্দের চেতনা বা চেতনারই আনন্দ; সেও কিছুই পরিহার করে না; সু কু, পুণ্য পাপ, হর্ষ বিষাদ, এ-সব কোনো দ্বন্দ্বের অপেক্ষা রাখে না। এই চেতনায় বা আনন্দে প্রতিষ্ঠিত হলে তবেই মানুষ শিল্পী বা কবি; আসক্তি বা বিরাগ তার পরধর্ম, সব-কিছুকে প্রকাশ করাই তার কাজ। সেই প্রকাশ সুনীতি বা দুর্নীতির কোনো খবর রাখে না। স্রষ্টারূপে বা দ্রষ্টারূপে যে জানে, যে দেখে সেই প্রকাশকে, সেই হয় মুক্ত; অন্তত যতক্ষণ দেখে, যতক্ষণ চেনে, ততক্ষণ থাকে সে মুক্ত— আর, পরেও স্মৃতি থেকে যায়। এই মুক্তিতে যে অপরিসীম কল্যাণ নিখিল নীতিশাস্ত্র ও সমাজব্যবস্থার তা স্বপ্নেরও অগোচর।

শিল্প প্রকাশস্বরূপ, স্বরূপেরই প্রকাশ। প্রত্যেক রূপের অন্তরে তার স্বরূপ। আপন আপন স্বরূপেই বিধৃত আছে প্রতিটি রূপ। বদ্ধ ও মুগ্ধ মানবাত্মাকে সৌন্দর্যে আনন্দে চেতনায় মুক্তি দেওয়াই সকল শিল্পের সব-কিছু রূপায়নের অর্থ ও পরিণাম।

বৈদিক ঋষি-পরিদৃষ্ট মন্ত্রের বিদ্যুচ্চকিত উদ্ভাসে সংশয়মোহগহন মানস অন্ধকারে সহসা সত্যের দিশা দেখা গিয়েছে। মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিকে প্রণাম। সত্যপ্রকাশক মন্ত্রকেও প্রণাম। মুখের কথা আর এই মন্ত্র সমধর্ম নয়। সাধারণ কবিকল্পনা আর এই মান্ত্রিক ইমেজ বা প্রতিমা সেও বিভিন্ন ভূমিতে।

সমুদয় শিল্প সম্পর্কে যে সত্যের ইঙ্গিত আছে এই দৈববাণীতে, আজ পর্যন্ত মানুষ স্রষ্টার সম্পূর্ণ অধিগত যদি না'ও হয়ে থাকে তা, আদর্শরূপে, লক্ষ্যরূপে, ধ্রুবতারা রূপে নিত্যই রয়েছে সম্মুখে। আদর্শ সাকার হবে তখনই, শিল্পী ও সমাজ উত্তীর্ণ হবে লক্ষ্যে, শিল্প যখন আর অবসর-বিনোদনের বা বিলাসের বা খাম-খেয়ালের বা কোনো সাংসারিক প্রয়োজন-সিদ্ধির উপায় ও উপকরণ ব'লে গণ্য হবে না। শিল্পের জন্যই শিল্প, এ কথার কোনো অর্থ নেই ঠিকই। শিল্প জীবনকে প্রকাশ করবে, আর জীবন সীমাবিহীন আনন্দ চৈতন্য ও সত্তাকে প্রকাশ করবে— বিন্দুতে বিন্দুতেই সিন্ধু।

আজ পর্যন্ত মানুষের জীবনও সম্পূর্ণতা পায় নি, শিল্পও পায় নি; কিন্তু যাত্রাপথ সম্মুখে পড়ে রয়েছে ঐ। পড়ে রয়েছে? সে কি টেনেও নিয়ে যাচ্ছে না? আপাততঃ কবির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে এ কথা বলতেও দোষ নেই: পথে চলাই সেই তো তোমায় পাওয়া।

১৯৫১

চিত্র

রূপভেদাঃ প্রমাণানি ভাবলাবণ্যযোজনম্।
সাদৃশ্যং বর্ণিকাভঙ্গ ইতি চিত্রং ষড়ঙ্গকম্॥

বাৎস্যায়ন-প্রণীত কামসূত্রের টীকায় যশোধর এই শ্লোকটি প্রসঙ্গক্রমে সংকলন করেছেন, কোন্ আকরগ্রন্থ থেকে সে আমাদের জানা নেই। শিল্পী ও পথিকৃৎ অবনীন্দ্রনাথ এই শ্লোকের বিশদ ব্যাখ্যায়, ভারতীয় চিত্রকলা যে কী বস্তু সেটি সবিশেষ বুঝিয়েছেন। আমরাও তাঁরই অনুসরণে বিষয়টি সংক্ষেপে বুঝে নিতে পারি।

উত্তম চিত্রের, তথা চিত্ররচনার, ষড়ঙ্গ— অর্থাৎ ছয়টি অঙ্গ সম্পর্কে এই শ্লোকে বলা হয়েছে।

প্রথমেই নিখিল রূপরাজির ভিতর থেকে একটি বিশেষ রূপ বেছে নেওয়ার কথা। বিশ্বের ভূমিকায় বিশেষের কণ্ঠেই বরমালা না দিলে তো আর্টের উদ্ভব হতে পারে না; চিত্র বলো, মূর্তি বলো, কবিতা বলো, কিছুই প্রত্যক্ষ ও পরিচিত হয় না। ছন্দোবিধৃত ও রসনিষ্ণাত হলে সেই বিশেষ রূপই তখনকার মতো বিশ্বরূপের প্রতিভূ হয়ে দাঁড়ায়। সে আলোচনা পরে। উপস্থিত এইটুকু স্মরণ করলেই হবে যে, জড়ের সঙ্গে জীবের প্রভেদ আছে; উদ্ভিদ্ পশু পাখি সরীসৃপ কীট পতঙ্গ মানুষ কেউ কারও মতো নয়; আর উল্লিখিত যে-কোনো শ্রেণীর মধ্যেও যে-কোনো একটি, আকারে আয়তনে— জাতি কুল লিঙ্গ বয়স ও অবস্থার গুণে— অন্য সবগুলি থেকেই পৃথক্। ষড়ঙ্গের, অর্থাৎ চিত্ররচনার অপেক্ষাকৃত বহিরঙ্গের এইটি হল প্রাথমিক প্রণিধানের বিষয়, প্রথম পাঠ। দেখে বুঝতে পারা চাই চিত্রিত মানুষটি নর অথবা নারী, অল্প অথবা অধিক - বয়সী, সুস্থ সবল অথবা রুগ্ন দুর্বল, কোন্ দেশের কোন্ জাতির কোন্ শ্রেণীর কিরূপ লোক— স্থূলকায় অথবা কৃশ, বামন অথবা প্রাংশু। আবার, নর বা বানর সেটিও, অবশ্য, স্থির হওয়া চাই। ঘোড়া এঁকে সেটি যে ঘোড়া, গাধা নয়, অম্বুদ্‌গত শৃঙ্গ ভেড়াও নয়, এ তো লিখে দিলে চলবে না।

রূপভেদের প্রয়োজনে আপনি এসে পড়ে প্রমাণ, অর্থাৎ নানাবিধ মাপজোপ। বানর থেকে নর বিশেষ হয়েছে সুদীর্ঘ একটি অঙ্গ নেই ব'লেই নয়; হাত-পায়ের, মুখ-চোখের, মান-প্রমাণের আরও বহুবিধ পার্থক্যে। মানুষে মানুষে জাতি কুল

স্বাস্থ্য ও বয়ঃক্রম -জনিত যা-কিছু ভেদ সেও পরস্পর মাপজোপের অসংখ্য ভেদ-রূপেই আমাদের চক্ষুগোচর হয়। অর্থাৎ, নির্দিষ্ট প্রমাণগুলির প্রয়োগ জানলেই অভীষ্ট রূপ বা সেই রূপের জাতি কুল বয়স ও অবস্থা পরিষ্কার এঁকে দেখানো যাবে।

ষড়ঙ্গকে চিত্ররচনার বহিরঙ্গ বলেছি বটে, রূপভেদ ও প্রমাণের পরেই তবু চিত্ররচনার নিগূঢ় গভীর রহস্যের দিকে, অন্তরঙ্গ তাৎপর্য এবং সেটি ফুটিয়ে তোলার অপরূপ কৌশলের দিকে, শিল্পী ও রসিকের ক্রমিক আরোহণ-পর্ব সূচিত হচ্ছে।

এক নজরে ধরা পড়ে এমন তথ্যের জোগান বা বিজ্ঞাপন দেওয়ার কাজে, চার্ট্ বা পোস্টার - রচনায়, ষড়ঙ্গের সূচনার দুটি অঙ্গই যথেষ্ট বলা যেতে পারে। কিন্তু, ছবি বলে তারই আদর করল না মানুষ চিরদিন। চিরদিনের আদর কাড়তে হলে চিরকাল হৃদয়ে দোলা দেয় এমন জিনিস হওয়া চাই তো। যা-কিছু খবর এবং তথ্য কোনো না কোনো প্রয়োজনের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা; আজ হোক কাল হোক, প্রয়োজন ফুরিয়ে যায় আর প্রয়োজনসাধক বস্তুও অনাদৃত বা বিস্মৃত হয়। ফুরোতে চায় না ভাব ও লাবণ্য -যুক্ত বস্তু। ভাব বলতেই হৃদয়ের ভাব, হৃদয়ের অভিব্যক্তি। তাই ভাব সম্পর্কে হৃদয়ের আসক্তি, অনুরাগ, বিস্ময়, যাই বলো, কিছুতে শেষ হয় না। অন্তরের ভাবকে বাইরে অভিব্যক্ত হতে দেখলে মুগ্ধ হয়ে বলে—

তোমায় হিয়ার ভিতর হৈতে
কে কৈল বাহির।

বলে—

জনম অবধি হম রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।

এই ভাব দিয়ে দেখা হয় ব'লেই সহৃদয়ের কাছে সূর্য-চন্দ্র-তারার উদয়াস্ত পুরাতন হয় না, শিশু বা নারীর মুখ চিরসুন্দর। হর্ষ বিষাদ ভক্তি প্রীতি ভয় বিস্ময় কৌতুক বা ঘৃণা কোনো-একটি ভাব যে রূপের আধারে ভরে ওঠে সেই আমাদের নানা প্রকারে কেবলই আকর্ষণ করে এবং সহজে স্মৃতি হতে মুছে যায় না। এই ভাবই হল রসের নিজস্ব উপাদান এবং রসেই যে সর্ববিধ শিল্পের পরাকাষ্ঠা ও পরাগতি সে অবশ্য আমরা সকলেই জানি বা মানি।

ভাবের আধার হলে, সুন্দর বা কুৎসিত, তরুণ বা জরাগ্রস্ত, এ-সকল বিচার-বিবেচনা অবান্তর হয়ে পড়ে। স্নেহময়ী মায়ের কাছে-যে কানাছেলেও পদ্মলোচন। আর, সহৃদয় ব্যক্তি ছেলেকে দেখতে হলে বরং মায়ের অনিমেষ চোখের দেখা দিয়েই দেখবেন। এই-যে বিশেষ দেখার বিশেষ স্বাদ— রূপে রূপে ভাবের পরিস্ফুটনে

ভঙ্গীর সমাবেশ শুধু নয়, মনের মাধুরী অথবা ভীত-চকিত মুগ্ধ-বিস্মিত হৃদয়ের স্পর্শ— এটিকেই লাবণ্য বলা হয়েছে। অর্থাৎ, ভঙ্গী দিয়ে যার গঠন সেই ভাবেরও ভাব হল লাবণ্য। 'লবণ' থেকে লাবণ্য শব্দের উৎপত্তি ধরা যেতে পারে, আবার লব শব্দের সঙ্গেও তার যোগ রয়েছে। অম্ল মধুর কটু তিক্ত কষায় নানা স্বাদ থাকলেও, লবণ না হলে যেমন রন্ধনের সমুচিত আস্বাদন হয় না, অভাবটি স্পষ্টই বুঝতে পারা যায় অথবা 'কী যেন নেই' 'কী যেন নেই' মনে হতে থাকে— চিত্র-রচনায় ভাবের পরিস্ফুটনে ভঙ্গী আছে, অথচ ভাবলাবণ্য নেই, সে হল অনুরূপ ঘটনা। রূপে ভাব যুক্ত হল ভঙ্গীর দ্বারা, অতঃপর লেশমাত্র, লবপরিমাণ, লাবণ্য দিতে পারলেই বাহ্যতঃ অসুন্দর রূপেও সৌন্দর্য পূরা হয়ে উঠবে। লাবণ্য শব্দের ব্যাখ্যায় শ্রীরূপগোস্বামিপাদ বলেছেন: মুক্তাফলেষুচ্ছায়ায়াস্তরলত্বমিবান্তরা প্রতি-ভাতি যদঙ্গেষু। নিটোল মুক্তাটির আকারের ধারণা বা বর্ণনা সহজেই করা যেতে পারে, বর্ণের কথাও বলা যায়, কিন্তু তার ঢলঢল সর্বাঙ্গে যে তরলিত আভা সেটির কোনো বর্ণনাই হয় না; চিত্রকর কী কৌশলে সেটি আপন পটে ফুটিয়ে তুলবেন সেও বলা কঠিন। কিন্তু, শ্রীরাধাগোবিন্দরূপে ঘনীভূত, উজ্জ্বলরসের উজ্জ্বলতা ফুটবে না সেই লাবণ্য না হলে। সেই কথাই বলা চলে অন্যান্য ভাব ও রস সম্পর্কে। কায়া নয় কান্তি— রূপের মুকুর থেকে ঠিক্‌রে পড়া হৃদয়ভাবের দ্যুতি এই লাবণ্য।

ষড়ঙ্গতত্ত্বের প্রথম পদক্ষেপেই যথাযথ প্রমাণ -সহ রূপভেদ, দ্বিতীয়ে ভাবলাবণ্য-যোজনা, আর তৃতীয়ে পুনরাবর্তন— কোথায়? সাদৃশ্যতত্ত্বে। সাদৃশ্য বলতে বুঝি নে শুধু গোরুর মতো গোরু অথবা মানুষের মতো মানুষ, যত্ন-মধুর বাহ্য আকার-অবয়বের নকল করে যত্ন-মধুর প্রতিচ্ছবিমাত্র। কারণ, যথোচিত মান-পরিমাণ-সহ রূপভেদ যখনই নিষ্পন্ন হল তখনি তো ছবিতে প্রতিচ্ছবির যতটা প্রয়োজন তা পাওয়া গিয়েছে। একই বিষয়ের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ অনাবশ্যক ও অনুচিত, বিশেষতঃ সূত্ররচনায় বা তত্ত্ববিচারে। সাদৃশ্য বলতে সারূপ্য ব্যতীত মনে ওঠে তুলনা বা উপমার কথা। সকল যুগের সকল কবিকৃতিতে এই তুলনার বা উপমার ভূয়িষ্ঠ প্রয়োগ দেখা যায়। কাব্যালংকারের মধ্যে এটিকেই অতুলনীয় বলা যেতে পারে। এবং স্থূল, সূক্ষ্ম— রূপের, তেমনি ভাবের— নানাবিধ উপমা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, কাব্যশরীরের বিভূষণ এটি শুধু নয়, সে অর্থে অলংকারও সব সময়ে নয়। অবশ্য, প্রধানতঃ চোখের দেখাতেই সহজপ্রতীয়মান তুলনা যা দেওয়া যেতে পারে, কেবল কাব্যে নয়, শিল্পেও তার ব্যবহার এবং উপযোগিতা প্রচুর— আচার্য অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলাল লিখে ও এঁকে তা ভালোভাবেই বুঝিয়েছেন[১] ভারতীয় চিত্র ও মূর্তির পরম্পরাগত আদর্শে। তাতে দেখা যাবে সিংহকটি বা বক্ষঃ-

[১] বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ গ্রন্থমালায়: ভারতশিল্পে মূর্তি: অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কথাট এগুলি উপর থেকে চাপানো কতকগুলি বাঁধা ধারা-ধরণ নয়, মন-গড়া আকার হলেও বাস্তববিরুদ্ধ নয়, এবং ভাবপ্রকাশের উপযোগীও বটে। পদ্মপলাশ নেত্রে নয়নবিশেষের সীমাঙ্কন শুধু নয়, গড়নও সুন্দরভাবে সূচিত হচ্ছে। আবার, হরিণের সঙ্গে, খঞ্জনের সঙ্গে তুলনা যে নিছক রীতির অনুরোধেই হতে হবে এমনও নয়— কারণ, আকৃতি ও প্রকৃতি দু দিক দিয়েই কোনো সুন্দরীর চকিতচঞ্চল নয়ন-দুটি হরিণের মতো বা খঞ্জনের মতো হওয়া অসম্ভব নয়। তা হলেও, কাব্যে উপমালংকারের বা চিত্রে সাদৃশ্যপ্রয়োগের এ-সবই হল বাহিরের কথা।

অতিপুরাতন একটি রচনায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, বিশেষকে নানাভাবে বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া, নন্দিত হৃদয়ের পুলক ও বিস্ময়কে সেইভাবে ব্যক্ত এবং জাগ্রত করা, উপমাপ্রয়োগের এই হল নিঃসীম সার্থকতা। কেননা—

বিরলে বসিয়ে চাঁদের মুখ নিরখি

এ কথায় আকারের সাদৃশ্য সূচিত হচ্ছে অল্পই; চাঁদের মতো কিম্বা ততোধিক শোভাময়, ঘর-বার-আলো-করা, মনোহর ও প্রীতিপ্রদ তাঁর বাছনির মুখ এই কথাই মা বলতে চেয়েছেন। আর, 'ধনকে নিয়ে' বিরল বনে যদি বা যান, তা হলেও তাঁর কোলের সন্তানের যোগে তিনি যে আভূমি-আকাশ যেখানে যা-কিছু সুন্দর ও মধুর আছে তার সঙ্গে যুক্ত রইলেন সেও ভালোভাবেই বলা হয়েছে। প্রেয়সীর—

যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল

অথবা, প্রিয়তমের রূপ—

দেখিবার আঁখি পাখি ধায়

এ শুধু কথার কথা তো নয়, সাদৃশ্য বা উপমা উপর-উপর কোনো অর্থে নয়। এক রূপের সঙ্গে অন্যান্য রূপের, এক গতিপ্রকৃতির সঙ্গে অন্য গতিপ্রকৃতির সংযোগ-সাধন; সেই উপায়ে রস ও রহস্যের সৃজন; ভেদ থেকে শুরু করে নিখিলের যত্রতত্র ঐক্যে ও আত্মীয়তায় উত্তরণ।

ভেদের মধ্যে অভেদের উপলব্ধি, অনন্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে অনুস্যূত ঐক্যের জ্ঞান, এ যেমন দর্শনবিজ্ঞানের সারমর্ম তেমনি রূপসৃষ্টিরও অন্যতম মূলপ্রয়োজন। আমাদের মনে হয়, রূপভেদের পর রূপসাদৃশ্যের সন্ধান এই হিসাবেই সার্থক ও সংগত। বিশেষকে বিশ্বের ছন্দে মিলিয়ে দেওয়ার পক্ষে তার উপযোগিতা রয়েছে প্রচুর।

ষড়ঙ্গের সর্বশেষসাধন হল বর্ণিকাভঙ্গ। আসলে এটি দুই, এক নয়। বর্ণ বিলেপন করে যে তূলি তাকেই বর্ণিকা বলা হয়েছে। যেমন তূলি না হলে বর্ণ তেমনি বর্ণ না হলে তূলি নিষ্ফল। অতএব, বর্ণিকাভঙ্গে বর্ণের রুচি আর তূলি-চালনার বৈশিষ্ট্য, চিত্রকরের এই দ্বিবিধ কৃতি ও নৈপুণ্যই লক্ষ্য করা হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে কোনো চীনা সমঝদার কালী তুলি ও রঙ সম্পর্কে যা বলেছেন[২] *সংকলন করতে চাই—*

Ink applied meaninglessly to silk in a monotonous manner is called dead ink : that appearing distinctly in proper chiaroscuro is called living ink.

অর্থাৎ, রেশমী পটে নিরর্থকভাবে পর্দা-দীন যে কালী বুলানো হয় তা প্রাণহীন, সজীব কালী হল তাই যা মনোমত[৩] ধূপছায়া-পর্যায়ের দ্যোতক ও পরিস্ফুট।

কালীর সম্পর্কে যা বলা হল প্রকারান্তরে রঙ সম্পর্কেও তা খুবই সত্য। ছবিতে বহু বর্ণের সমাবেশ হলেই হবে না, বর্ণের বৈচিত্র্যে উজ্জ্বল-অনুজ্জ্বলের বিচিত্র পর্দায় পরিষ্কার সংগীত বেজে ওঠা চাই। কেননা—

Colouring, in a true pictorial sense, does not mean a mere application of variegated pigments. The natural aspect of an object can be beautifully conveyed by ink-colour only, if one knows how to produce the required shades.

অর্থাৎ, ছবিতে বহুবিধ রঙ ব্যবহার করলেই সার্থক বর্ণবিলেপন হল না। কেবল কালীর রঙেই যে-কোনো বস্তু সুন্দরভাবে ফুটে উঠতে পারে যদি জানা থাকে কোথায় কোন্ পর্দার ব্যবহার হবে।— পরে আরো বলা হয়েছে—

In ink-sketches the brush is captain and the ink is lieutenant, but in coloured painting colours are the master and the brush the servant. In other words, ink complements, but colours supplement, the work of the brush.

অর্থাৎ, কালী-তুলির কাজে তুলিকারই প্রাধান্য, কালী তার সহায়। রঙের কাজে রঙগুলি মনিব, তুলি থাকে ওদের অধীনে। অন্যভাবে বলতে গেলে, তুলির কাজের অনুগত থাকে কালী, রঙ তাকে ছাপিয়ে যেতে চায়।

কথাটা সর্বৈব মিথ্যা নয়। এবং বহু ক্ষেত্রেই সত্য। তুলিকে প্রাধান্য দিতে চেয়েছেন ব'লেই সেরা সেরা চীনা শিল্পীদের ঝোঁক বেশি কালীতুলির চিত্র-

[২] Chap. XI, The Flight of the Dragon by Laurence Binyon, in Wisdom of the East Series.

[৩] এ ক্ষেত্রে চোখে দেখার অনুকরণে আলোছায়ার বা উজ্জ্বল-অনুজ্জ্বলের বিন্যাস নয়। গাঢ় থেকে গাঢ়তর, গাঢ়তম এবং ফিকে থেকে ক্রমশঃ আরো ফিকে, কালীর বিচিত্র টোন্ বা পর্দার সমাবেশে কালিমার একটি স্পৃহনীয় প্যাটার্ন্ বা নক্সার রচনা —শিল্পীর এইমাত্র লক্ষ্য থাকে।

রচনায়। তাঁরা জানেন, কাগজে, কাপড়ে, পট্টবস্ত্রে, নিরঞ্জন শুভ্রতার বুকে, কালো কালীতেই রামধনুর সব ক'টি রঙ, তথা প্রভাত সন্ধ্যা দুপুর আর বর্ষা শরৎ শীত বসন্তের সকল রূপরাগ, দেখাতে পারেন মায়াবী চিত্রকর। অবনীন্দ্রনাথের ভাষায়— 'কালী তখন আর কালী থাকে না, যদি মন তাহাকে রাঙায় আপনার বর্ণে'।

বর্ণসংগীতির দ্বারা বিবিধ ভাবের বিচিত্র ব্যঞ্জনা দেওয়া যায়, সে কথা অবনীন্দ্রনাথের চিত্রকৃতি-প্রসঙ্গে আমরা কথঞ্চিৎ আলোচনা করেছি— কিছু বলা হয়েছে কিনা জানি নে। উপস্থিত, বর্ণের বদলে বর্ণিকার কথাই আর-একটু বিশদভাবে বলা দরকার। চীনা চিত্রকর ও চিত্রজ্ঞগণ এ বিষয়ে বহু আলোচনা করেছেন ; সব আমাদের জানাও নেই। এপর্যন্ত জানি, ও দেশে উৎকৃষ্ট লেখাঙ্কনে আর উৎকৃষ্ট চিত্রে কোনো তফাত করা হয় না। এ কথা ঠিকই লেখাঙ্কনে আসল যেটি দেখবার জিনিস সে হল তূলির টান এবং তারই বশে কালীর সচ্ছন্দ প্রবাহ ও পর্দা। সাবলীল তূলির প্রত্যেক টানে শুধু যে বিস্ময়কর সৌন্দর্য আছে তা নয়, আছে লেখকের চরিত্রের দ্যোতনা, ব্যক্তিসত্তার সুনিশ্চিত ছাপ। সেই তূলিচালনায় কখনো আছে শাণিত তরবারির বিদ্যুচ্চকিত গতি, কখনো বা শ্যামায়মান বনান্ধকারে কামিনীফুলদলের নিঃশব্দ ঝ'রে পড়া, কখনো আবার শরৎপূর্ণিমায় নিস্তরঙ্গপ্রায় তড়াগের বুকে দূরের সুরলহরীর অতিলঘু স্পর্শ। সকল কবিত্ব বাদ দিলেও এ কথা সত্যই, লেখাঙ্কনে, তূলির টানে টানে যতটা প্রকাশ করেন আপনাকে লেখক বা শিল্পী, প্রকাশ হয় তাঁর স্থায়ী চরিত্র আর বিশেষ সময়ের বিশেষ মেজাজ, তন্ময়তা অথবা তারই এতটুকু অভাব ও অসংগতি, অন্য কোনো উপায়েই তা হতে পারে না। অর্থাৎ, পাশ্চাত্য মতের স্টাইল, ব্যক্তিসত্তার অলিখিত অথচ সুস্পষ্ট স্বাক্ষর, সেটি আছে তূলির ভঙ্গীতেই।[৪] বর্ণিকাভঙ্গের সেটি হল বিশেষ কথা, তেমনি ষড়ঙ্গেরও সারকথা বা শেষকথা। লেখাঙ্কনে ও কালীতূলির আলেখ্যে শুধু নয়— আসলে তূলি ধরে আঁকা যাবতীয় শিল্পসৃষ্টিতে। প্রচলিত ব্যবহার -অনুযায়ী ছবি আঁকার পর ছবিতে স্বাক্ষর লেখার প্রয়োজন হয়ে থাকে ; নইলে অনেকেই সে ছবির মূল্য বা মর্যাদা নির্ধারণ করতে পারে না। কিন্তু ছবির কোনো এক কোণে, এমন-কি পাঁচ জায়গায়, বানান ক'রে নাম লেখার চেয়ে, ছবির সর্বত্রই অলিখিত লেখার স্বাক্ষর রাখা— সে যে বহুগুণে চমৎকারজনক ও শ্রেয়স্কর তাও কি বলতে হবে? শিল্পী ও সমঝদারগণের সিদ্ধান্তই এই যে, আঙ্গিকের যোগে অথচ অজ্ঞাতভাবে বিষয় ও বিষয়ীর অবিভাজ্য মিলন, তারই অন্য নাম 'সার্থক শিল্প -সৃষ্টি'।

৪ বলা বাহুল্য, চীনে বা জাপানে তূলিতেই লেখা ও আঁকা দু কাজ হয়ে থাকে।

দেখা গেল ষড়ঙ্গের সব-ক'টি অঙ্গই অতি প্রয়োজনীয়, সেগুলির তাৎপর্যও অতিশয় পরিষ্কার। অথচ, এখানেই থামলে, শিল্পী ও রসিক স্বতঃই বলে ওঠেন: এহ হয়, আগে কহো আর! অদ্ভুত অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী অবনীন্দ্রনাথ সে কথা বুঝেছিলেন। তাই 'ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ'[৫] গ্রন্থের নিবন্ধগুলি লেখবার সময়ে, সম্ভবতঃ ভারতীয় চিত্রকলা সম্পর্কে অন্য কোনো গূঢ়ার্থদ্যোতক বচন না পেয়ে, যে বিশ্বাস ও উপলব্ধি তাঁর অন্তরে ছিল, সকল কালের সকল রসিকের অন্তরেই আছে, সংকলিত শ্লোকের ব্যাখ্যায় সে প্রসঙ্গও যোগ করতে বাধ্য হয়েছেন— ছন্দ ও রসের প্রসঙ্গ। অথচ, ছন্দ ও রসের কথা এ শ্লোকে একেবারেই নেই। থাকবার হলে অতিশয় স্পষ্টভাবেই থাকত না কি? কেননা, যে-কোনো শিল্পসৃষ্টিতে রস ও ছন্দের অস্তিত্ব এবং উপযোগিতা কোনো দিক দিয়েই গৌণ বা অপ্রধান বলা যায় না।

রস বা ছন্দের উল্লেখ নেই। কারণ, আসলে এটি চিত্রণকর্মের ষড়্‌বিধ উপায়ের, তথা চিত্রের ছয়টি অঙ্গের অথবা অঙ্গে-অঙ্গে লীন লক্ষণের বিবরণ মাত্র— চিত্রের প্রাণধর্মের বা আত্মস্বরূপের নির্দেশ নয়। সে হয়তো যথাবিধি ও যথাক্রমে মূল গ্রন্থের অন্য কোনো শ্লোকে বা শ্লোকরাজিতে নিবদ্ধ ছিল, আজ অবলুপ্ত। উপায়ে উদ্দেশ্যে উপাদানে উপকরণে একশা করে দেখবার কোনো কারণ ছিল না। যা হোক, কামসূত্রের 'জয়মঙ্গল' টীকায় উদ্‌ধৃত এই শ্লোকের বিচ্ছিন্নতা ও তজ্জনিত 'অপূর্ণতা' অপ্রত্যাশিতভাবে দূর করেছে অন্য শাস্ত্রের অন্য দু-চারটি শ্লোক। তন্মধ্যে, বক্তব্যে ও অর্থব্যঞ্জনায় যে শ্লোকটি অতুলনীয়, প্রথমতঃ তারই আলোচনা সেরে নিতে চাই পৃথগ্‌ভাবে। শ্লোকটি[৬] হল—

বিনা তু নৃত্যশাস্ত্রেণ চিত্রসূত্রং সুদুর্বিদম্।
জগতোঽনুক্রিয়া কার্যা দ্বয়োরপি যতো নৃপ ॥

[৫] বিশ্বভারতী-প্রকাশিত বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ গ্রন্থমালার অন্তর্গত।

[৬] বিষ্ণুধর্মোত্তর উপপুরাণে তৃতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোক। ১৯১২ খৃস্টাব্দে ক্ষেমরাজ কৃষ্ণদাস -কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থের পাঠ বা অপপাঠ -অনুযায়ী, এ শ্লোকের সব্যাখ্যা ইংরেজি অনুবাদ করেছেন ভারতশিল্পতত্ত্ববিদুষী শ্রীমতী স্টেলা ক্রাম্‌রীশ। দ্বিতীয় ছত্রের ইংরেজি এই—

Hence no work of (this) earth, (oh) king should be done even with the help of these two, (for something more has to be done).

অর্থ বোঝা যায় না, বিশেষতঃ প্রসঙ্গের সঙ্গে মিলিয়ে। এজন্য দায়ী পূর্বলব্ধ পাঠ: জগতো ম ক্রিয়া কার্যা দ্বয়োরপি যতো নৃপ। (নু স্থলে ন, আর কিছুই নয়।) স্থান কাল ও প্রসঙ্গের বিচারে, কিছু অর্থ আদায় করতে হলে এই ভাষান্তর হতে পারে: যেহেতু, হে নৃপ, জগতের

নৃত্যশাস্ত্র সহায় না হলে চিত্রসূত্র অতিশয় দুর্জ্ঞেয়, যেহেতু উভয়েরই কার্য বা করণীয় হল জগতের অনুক্রিয়া।

এই শ্লোকের প্রত্যেক শব্দটি বিশেষ তাৎপর্যবাহী, কাজেই সার্থক। চিত্রের বিবিধ অঙ্গ অথবা বিচিত্র লক্ষণ এ শ্লোকের লক্ষ্য নয়। চিত্রের কার্য, অতএব তার স্বভাব স্বধর্ম বা প্রকৃতি হল এ ক্ষেত্রে একমাত্র বিচার্য বিষয়। কী কার্য নৃত্যের অথবা চিত্রের? জগতের অনুক্রিয়া। বিশ্ব-আকৃতির অনুকৃতি নয়। তা যদি হ'ত তা হলে ক্রিয়া অনুক্রিয়া অথবা জগৎ শব্দ একেবারেই অর্থহীন হ'ত।

জগৎ শব্দের প্রকৃত অর্থ হল যা স্বভাবগতিশীল, যা প্রতিনিয়ত চলছে। চিত্রকর্মে ও তার গূঢ়ার্থবিচারে বিশ্বভুবনের আকৃতিসমূহ চোখে দেখার চেয়ে তার আসল প্রকৃতিটি মনে ধারণা করাই একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে। বহিঃ-প্রতীয়মান আকৃতিতেই বিশেষভাবে আকৃষ্ট হলে অনুকরণের কথা উঠত, আর্ট যে কোনো না কোনো ভাবে চোখে দেখা রূপেরই অনুরূপ এই ভ্রান্ত ধারণার অবকাশ থাকত। কিন্তু অতি প্রাচীন ঋষি আর অতি-আধুনিক বিজ্ঞানী উভয়েই জানেন— অস্থিরকে স্থির ব'লে ধারণা করা মিছে। চিরচলিষ্ণু জেনেই তার সঙ্গে সম্পর্ক রচনা করতে হবে চিরপরিবর্তমান চলার ছন্দে, ক্রিয়ার ছন্দে। বিজ্ঞানের ভাষা বর্তমান লেখকের তেমন পরিচিত নয়, তার সামগ্রিক তত্ত্ব তেমন বিস্তারপূর্বক ব্যাখ্যা করা যাবে না— প্রয়োজনও অবশ্য নেই। মোটের উপর মিল আছে জানি নবীনে এবং প্রাচীনে। প্রাচীন, বিষ্ণুধর্মোত্তরের যিনি বক্তা বা সংকলনকর্তা তাঁর থেকে বহুগুণে প্রাচীন, ঋষি বলছেন—

যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্।[৭]

জগতের সমস্ত-কিছুই প্রাণ থেকে নিঃসৃত হয়ে সর্বদা প্রাণেই গতিমান রয়েছে। জড়বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই প্রাণ হল energy বা প্রৈতি[৮], নিয়তকম্পন, নিয়তগতি। 'যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বম্' পদবন্ধনের অর্থ আরো পরিস্ফুট হবে ঈশোপনিষদের

ক্রিয়া (যথাযথ) করণীয় (অর্থাৎ, অনুকরণীয়) নয় (নৃত্য এবং চিত্র) উভয়েরই। তা হলেই, বিধি হিসাবে যা বলবার বিষয় সেটা অন্তত ঘুরিয়ে নিষেধের ছলেও বলা হয়। কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে নিষেধের চেয়ে বিধিরই বিশেষ উপযোগিতা; এজন্য পূর্বপাঠকে আমরা লিপিকরপ্রমাদ ব'লেই গণ্য করছি। ১৯১২ খৃস্টাব্দে মুদ্রিত গ্রন্থে লিপিকরপ্রমাদের অপ্রতুলতা নেই; বহু স্থলে, যা অর্থহীন মনে হয় তারই দু-একটি অক্ষরের অদল-বদলে চমৎকার একটি বক্তব্য ফুটে ওঠে।

নূতন পাঠ, বন্ধুবর শ্রীকালিদিণ্ডিমোহন বর্মা একখানি নেপালী পুঁথি থেকে উদ্ধার করে দিয়ে আমাদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন হয়েছেন।

৭ কঠোপনিষৎ। ৮ রবীন্দ্রপ্রয়োগ।

অনুরূপ শ্লোকাংশে : যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। শ্রীঅরবিন্দ-কৃত ইংরেজি ভাষান্তর : whatsoever is individual universe of movement in the universal motion.

অর্থাৎ, নিখিল গতির অন্তর্গত অগণ্য গতিসর্বস্ব ভুবন।

জগৎ-ব্যাপারটি এমন যে, অনন্ত আকাশে অনন্ত নক্ষত্ররাজি ভ্রাম্যমাণ রয়েছে কল্পনাতীত দূর সুদূর কক্ষপথে, অসংখ্যের মধ্যে একটি হল আমাদের এই সূর্য, সূর্যকে ঘিরে বহু গ্রহ, গ্রহগুলি ঘিরে কত চন্দ্রমা— নিয়তই একটি প্রদক্ষিণ করে চলেছে প্রদক্ষিণপর অন্য বৃহত্তর সত্ত্বকে। ভয়ে বিস্ময়ে অনন্ত (?) আকাশ থেকে দৃষ্টি ও কল্পনা ফিরিয়ে যদি আনি দেখতে পাব (চোখে অবশ্য দেখবার নয়) প্রত্যেক জড়জীবের মধ্যে অনুপরমাণু, এবং প্রত্যেক পরমাণুর মধ্যেও বুঝি মহাশূন্য-পূর্ণ-করা নিখিল নাক্ষত্র্য জগতের প্রতিবিম্ব ঝলকিত— নানাজাতি অচিন্ত্যগতি বৈদ্যুতকণের অশ্রান্ত ভ্রমণবেগে।

রূপস্রষ্টা ও রসিকের পক্ষে, অবশ্য, এতটা জানা বা 'দেখা' সব সময়ে অপরিহার্য নয়। যদি দেখেন তা হলেও, শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপদর্শনে অর্জুন যেমন ধন্য হয়েছিলেন, আবার ভয় পেয়ে বলেছিলেন, হে বিশ্বমূর্তি, তোমার সৌম্য সৌম্যতর যে নারায়ণ ও নর রূপ তাই আমায় দেখাও— শিল্পী এবং শিল্পরসিকও তাই বলবেন। নয়ন ও মনের অগ্রে অনন্তরূপের যে অশেষ বিভ্রম সে তিনি ত্যাগ করবেন না, তবে এটুকু সর্বদাই মনে রাখবেন— বিশ্ব গতিময় আর তারই গতির অন্তরে গতিময় প্রত্যেক বস্তু, প্রত্যেক প্রাণী, প্রত্যেক ব্যক্তি। স্থির কিছু নেই। তুলি ধ'রে ফুটিয়ে তুলতে হবে স্থিরপ্রতীয়মান পটে এই অস্থিরকেই। সেটি যে কেমন করে সম্ভবপর সেই তো উত্তম রহস্য।[১]

সবই গতিশীল এ কথার অর্থ— সবই সক্রিয় বা সক্রীড়। রূপের অনুকরণ-আকাঙ্ক্ষা যদি ছেড়ে দেওয়া যায়, ক্রিয়ার অনুকরণ তো করা যেতে পারে?

[১] অনুকরণের দিকে ঝোঁকা যে মূঢ়তা এবং উদ্দেশ্যসিদ্ধির উল্টোমুখে চলা, সদ্য তার একটি প্রমাণ পেয়েছি। নূতন এই ছেলেভুলোনো (stereoscope) খেলনার রন্ধ্রযুগলে চোখ লাগিয়ে, অতিকারী কাচচক্ষুর ভিতর দিয়ে দেখা যায় অতিশয় বাস্তব, অতি প্রত্যক্ষ দৃশ্যাবলী —মূলে রয়েছে তার অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রঙিন আলোকচিত্র-যুগ্মক। মায়াবী কাচচক্ষুর গুণে ছোটো ছবি ছোটো থাকে না, তা ছাড়া পুরোদস্তুর তিন আয়তন নিয়ে দেখা দেয়। কিন্তু, তাই দেখে রূপরসিকমাত্রই মর্মাহত হবেন। কারণ, জড় পাহাড় পর্বত মূর্তি মন্দিরে আপত্তির কিছু নেই, জীবগুলি (পশু পাখি মানুষ) জীবনের বিবিধ ভঙ্গী উদ্যত ক'রে অকস্মাৎ বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে যেন মরে গিয়েছে। এই জীবন্মৃতের ভুবনে বা ডামির রাজত্বে ঘুরে ফিরে দম বন্ধ হয়ে আসে, পালাতে পারলে বাঁচি। কী কুৎসিত! অথচ, অনুকরণ যে ষোলো আনা তাতে আর সন্দেহ নেই।

মোটের উপর সেটিই হল নাট্য বা অভিনয়। অথচ অনুক্রিয়া শব্দে সেটিই যে বর্তমান শিল্পসূত্রের বক্তা মার্কণ্ডেয় মুনির অভীষ্ট, নানা কারণে তাও তো মনে হয় না। মনে হয় না এজন্যই যে, নাট্যের সঙ্গে চিত্রের তুলনা না দিয়ে নৃত্যের সঙ্গেই তাকে একসূত্রে গাঁথা হয়েছে। নৃত্য হোক আর নৃত্তই[১০] হোক, নির্দিষ্ট কোনো ঘটনা বা কাহিনীর প্রসঙ্গ থাক্ আর নাই থাক্, উপমানভূত কলাকৃতিতে দেখা যায় ছন্দেরই একান্ত প্রাধান্য। সন্দেহ থাকে না যে আলোচ্য শাস্ত্রমতে চিত্রেও সেইটেই বাঞ্ছিত। তা ছাড়া, শাস্ত্রকারের বক্তব্য কিছু শূন্য আকাশের ক্ষেতে ফ'লে ওঠে নি। চিত্ররচনার যে রীতিপদ্ধতি চলে এসেছে এ দেশে খৃস্ট-জন্মের পূর্ব হতে পাঠান-মোগলের রাজত্বকাল পর্যন্ত, নানা যুগে নানা প্রদেশে বিচিত্র বিকাশ তার বহু বিবর্তন, হয় তো অতীত বর্তমানের সচেতন সংযোগ থাকে নি সব সময়— অথচ, ছন্দের প্রাধান্য রয়েছে সর্বদাই অক্ষুন্ন। ফলতঃ সূত্রনিবদ্ধ শব্দাবলী আর সূত্রার্থপ্রমাণ চিত্রপরম্পরা[১১] উভয়েই সমস্বরে বলছে, 'অনুক্রিয়া' বলতে তথাকথিত 'অনুকরণ' নয়।

এই ভবের খেলায়, নিত্যনৈমিত্তিক দেখাশোনায়, মেলামেশায়, ঘাত-প্রতিঘাতে, প্রতি ক্ষণে আমাদের কত ভাব— কত অনুভব! অনুভব ব্যাপারটা

১০ উদ্ধৃত শ্লোকে 'নৃত্য' থাকলেও, অন্য বহু শ্লোকে 'নৃত্ত' আছে। কতটা শাস্ত্রকারের অভিপ্রায় আর কতটা লিপিকারের 'অবদান' বলা কঠিন। অনেকে বলেন, আখ্যানকথন বা ঘটনাব্যাখ্যান -শূন্য 'নৃত্ত'কলাটি যেমন প্রাচীনতর শব্দটিও তেমনি— নৃত্যের তুলনায়। চিত্রে ঘটনা বা আখ্যান প্রায়শঃই থাকে, সুতরাং নৃত্য উপমান অসংগত নয়। আর নৃত্যেরই অপেক্ষাকৃত অবচ্ছিন্ন বা abstract রূপ হল নৃত্ত, এ হিসাবে তার সম্পর্কেও শিল্পী বা রসিকের যথেষ্ট সাভিনিবেশ, সচেতন থাকা দরকার। মোটের উপর বলা চলে, নৃত্ত বা নৃত্য যে শব্দেরই ব্যবহার হয়ে থাক্, তাৎপর্যের খুব বেশি পার্থক্য ঘটে না।

১১ 'বিষ্ণুধর্মোত্তরম্' কোন্ শতকে কখন রচিত সে বিষয়ে আমাদের নিশ্চিত ধারণা নেই। নানা প্রমাণে বা অনুমানে শ্রীমতী ক্রামরীশ মনে করেন, চিত্রকলা সম্পর্কে যে-সব অধ্যায় সেগুলির রচনা খৃস্টীয় সপ্তম শতকে, অজন্তা-চিত্রশৈলীর প্রৌঢ় পরিণতির ও বিশেষ উৎকর্ষের সমকালে। এ সিদ্ধান্ত একেবারে তর্কাতীত হোক বা না হোক, এটি অন্তত স্পষ্টই দেখতে পাই— সংকলিত শ্লোক আর পূর্ণপরিণত অজন্তা-চিত্রশৈলী পরস্পরকে যেভাবে ব্যাখ্যা করে ও উদ্ভাসমান সৌন্দর্যে চিনিয়ে দেয় তা যার-পর-নেই বিস্ময়জনক। সূত্রে ও শিল্পসৃষ্টিতে এতটা মিল অন্যত্র খুঁজে বার করা সহজ নয়। সূত্র এবং চিত্র (অথবা বলা সংগত, চিত্র এবং সূত্র) একই কালের রচনা হলে, বিস্ময়ের হেতু অল্প হয়, অন্তত হেঁয়ালি থাকে না। একই কার্যকারণসূত্রে দুটি সহজেই বাঁধা পড়ে। উভয়ের পিছনে আর সামনে, অতীতে ও বর্তমানে, কখনো ম্লান কখনো উজ্জ্বল সাজে চলেছে এক অশেষ শোভাযাত্রা— সেই হল ভারতীয় চিত্রকলার অচ্ছিন্ন পরম্পরা।

কী? ভব, যা হয়েছে, প্রাণের টানে, সত্তার আনন্দে বা বেদনায়, তাই পুনরায় হওয়া। এই অনুভব-রূপ ক্রিয়ায় অনুভবগম্য বিষয়টির কতই না বাদ পড়ে যায়— বহু কাঁটাখোঁচা, বহু খুঁটিনাটি, বাহিরের বহুবিধ প্রক্ষেপ। অর্থাৎ, যা আকস্মিক, যা আগন্তুক, যা আরোপিত, সে-সব অনায়াসে ও অজ্ঞাতে পরিহার করে বস্তু বা ব্যাপারের যা সার, যা স্বরূপ, তাই আমরা অনুভব করি বা করতে চাই— অন্তরে অন্তরে তারই সঙ্গে আমাদের সত্তাকে মিলিয়ে বা মিশিয়ে দিই। অনুক্রিয়াও ঐরূপ। কোনো ক্রিয়ার যেটি নিহিত মর্ম বা নিগূঢ় 'রূপ'— যা অলক্ষ্যে আদ্যন্ত ক্রিয়ার অন্তরে অন্তরে অনুস্যূত থেকে তাকে ধারণ করে আছে, চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে— সেই অস্খলিতসুন্দর গতি ও বেগ, সেই ছন্দ, তাকে গ্রহণ করা, তাকে ধারণ করা — তাকেই এক উপাদান থেকে অন্য উপাদানে, এক ক্ষেত্র থেকে অন্য ক্ষেত্রে, বলা চলে এক সৃষ্টি থেকে আর-এক সৃষ্টিতে সঞ্চারিত ও সক্রিয় করে দেওয়া, এই হল অনুক্রিয়ার স্বরূপ বা স্বধর্ম কী নৃত্যে আর কী চিত্রে। যে-কোনো ক্রিয়ার মধ্যে দেশ কাল পাত্র এবং অবস্থা-হেতু যা-কিছু অস্বাভাবিক বা অবান্তর, যা-কিছু শক্তি ও সুষমার প্রকাশে ব্যাঘাত বা বাধা, সেগুলি কম-বেশি পরিত্যাগ করেই অনুক্রিয়া-রূপ ছন্দটি ফুটে উঠতে পারে এবং ওঠে। নৃত্ত বা নৃত্যের বেলায় এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ ওঠে না। আর, চিত্রের স্থলেও বিতর্কের কোনো সম্ভাবনা দেখি নে, পরম্পরাগত ভারত-চিত্রকলার নানা দিগ্‌দেশে কার্যতঃ অথবা মনে মনে একবার চোখ বুলিয়ে নিলে।

পূর্বেই একপ্রকার বলা হয়েছে, ষড়ঙ্গপ্রসঙ্গে ছন্দের অনুল্লেখে আচার্য অবনীন্দ্রনাথ যেমন বিব্রত তেমনি হয়তো বিস্মিত হয়েছিলেন। এ দিকে দেখেছিলেন, চীনদেশে খৃস্টীয় পঞ্চম শতকের শেষে বা ষষ্ঠের সূচনায় যে ছয়টি চিত্রসূত্র বিধিবদ্ধ ও লিপিবদ্ধ হয়েছিল (তার পূর্ব থেকেই প্রবর্তিত ও প্রচলিত থাকা অসম্ভব নয়) ঐ সূত্রাবলী সব রকমে ছন্দকেই শিরোধার্য করে রেখেছে। চীনা ভাষা থেকে সেই প্রথম সূত্রটির ইংরেজি ভাষান্তর অনেকে অনেক প্রকার[১২] করেছেন। জড়ে[১৩] জীবে তরুলতায় সর্বত্র জীবনের সব দৃশ্যতঃ-ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ছন্দের ভিতরে ভিতরে বিশ্বের বা বিশ্বাত্মার যে ছন্দ অনুস্যূত সেটির ধ্যানধারণা ও প্রকাশ— এই-যে উল্লিখিত সূত্রের মোটের উপর নির্দেশ সে বিষয়ে কেউ সন্দেহ করেন না—

At any rate, what is certainly meant is that the artist

[১২] দ্রষ্টব্য : ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ, অথবা, The Flight of the Dragon.

[১৩] তথাকথিত জড়কে সত্যই অচেতন ও জীবনহীন ব'লে ধারণা করা, জাত-শিল্পীর, বিশেষতঃ প্রাচ্যশিল্পীর পক্ষে অসম্ভব।

must pierce beneath the mere aspect [appearance] of the world to seize and himself to be possessed by that great cosmic rhythm of the spirit which sets the currents of life in motion.[১৪]

অর্থাৎ, বহিঃপ্রতীয়মান রূপের প্রতিফলন হৃদয়ে ধরাই আর্টের উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য হল তার নিখিল রূপকে সঞ্জীবিত ও সঞ্চলিত করে রেখেছে যে প্রাণ, যে ছন্দ, মনুষ্যসৃষ্ট রূপের ছলে সেই অরূপেরই প্রকাশ।

আমাদের মনে হয়, ভারতের রসরূপদ্রষ্টা চিত্রসূত্রকার অনুক্রিয়া শব্দে এই ছন্দের প্রতিই লক্ষ রেখেছেন।

প্রশ্ন তবু ওঠে, চিত্রের কথা বলতে গিয়ে বিশেষ ক'রে নৃত্যের কথাই বা কেন এল? ভালো নাচিয়ে হলে তবেই ভালো চিত্রকর হয়ে থাকে এমন আজগুবি সম্ভাবনার কথা শুনি নি আর বিশ্বাস করাও কঠিন।

নাচতে জানবেন এমন নয়, নাচের তত্ত্ব জানবেন চিত্রকর। এমনও বলা চলে, যথাবিধি নৃত্যশাস্ত্র তিনি নাইবা জানলেন, নৃত্যশাস্ত্রের যেটি সারকথা, যেটি দেহের বিচিত্র গতিচ্ছন্দের কথা বৈ অন্য কিছু নয়, অন্তর বা বাহির যেখান থেকে যেমন ক'রেই হোক, যখনই সেটি ধ্যানধারণায় ধরবেন চিত্রশিল্পী তখনই চিত্রকর্মে তাঁর দখল হবে পুরা। চিত্রের প্রসঙ্গ-মাত্রে নৃত্যের উল্লেখ কয়েকটি গুরুতর কারণে। প্রথম তো, দৃষ্টিগ্রাহ্য কলাসৃষ্টিগুলির মধ্যে নৃত্তেই অথবা নৃত্যেও ছন্দের বিশুদ্ধ রূপ ও সর্বময় প্রভুত্ব সব থেকে বেশি। সুতরাং নয়ন-মনোগোচর ছন্দের বিষয়ে যিনি উপদেশ দিতে চাইবেন নৃত্ত বা নৃত্য ছাড়া আর কোন্ কলাকে তিনি আদর্শরূপে খাড়া করবেন? দ্বিতীয়তঃ, অনেকেই বলেছেন, হয়তো ভারতীয় শাস্ত্রকারদেরও অভিন্ন অভিমত এই যে, মানুষের সকল কলা-সৃষ্টির মধ্যে নৃত্ত বা নৃত্যই আদিম। রূপকলাসমূহের মধ্যে তো বটেই। তৃতীয়তঃ, ভারতীয় ধারাবাহী চিত্রকলায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্তই যে রূপ যার-পর-নেই আদরণীয় এবং মুখ্য সে হল মানুষেরই রূপ, অথবা রূপান্তর। অরণ্যপর্বত স্থলজল আকাশ পশুপাখি নিয়ে বিশাল প্রকৃতি যখন যে ফাঁকে একটু উঁকিঝুঁকি দিয়েছেন সে হল ছবির পটভূমিরূপে অথবা পাড়-হিসাবে। মনুষ্য-রূপের ছন্দ, তার দেহের বিচিত্র গতি ও স্থিতির মাত্রা ও যতি, এগুলি নৃত্যকলাতেই যে বিশেষভাবে প্রকটিত তার আর সন্দেহ কী। মূর্তিকলাও প্রধানতঃ মানুষ নিয়ে, মনুষ্যদেহী দেবতা নিয়ে, আর এ দেশে সে ক্ষেত্রেও পরিস্ফুট ছন্দের শ্রী ও শক্তি কিছু অল্প নয় — বিশেষতঃ ধাতুমূর্তিসমূহে— তবে, রঙ ও রেখা -নির্ভর হওয়াতে, বিহিত উপায়

[১৪] The Flight of the Dragon.

করে রেখারই প্রশংসা করেন শিল্পীরা বা শিক্ষাদাতা আচার্যগণ। যাঁরা শিল্পী বা আচার্য নন, অথচ সমঝদার, তাঁরা ছায়াসুষমার বা তজ্জনিত গড়নেরই প্রশংসা করেন চিত্রে— এই গড়ন চিত্রিত রূপকে দেয় প্রয়োজনমত বাস্তবতা। এক দিকে রেখানিহিত ছন্দোবেগে রূপ ছুটে যেতে চাইছে অরূপে বা অলক্ষ্যে, অন্য দিকে দেখি গড়ন দিয়ে, বাস্তবতা দিয়ে, ভার বা ওজন চাপিয়ে, তাকে ধরে রাখতে চায় মাটির পৃথিবী, যেন বলে, 'আহা, হাওয়ায় পা ফেলো না। আমার বুকের উপর দিয়ে চলো।'

চিত্রে স্ত্রীজাতি বা অনুরূপ যাঁদের প্রকৃতি তাঁরা পছন্দ করেন অলংকরণ। কেননা, মণ্ডনে আরও যেন মধুর সুন্দর করে স্বভাবসুন্দর রূপকে। মেয়েরা নিজেও তো নানা বিভূষণ ধারণ করেন দেহে। তা ছাড়া, খুঁটিনাটি এটি-সেটিতে তাঁদের যথেষ্ট মনোযোগ, যা না হলে কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে ভূষিত করা যায় না। অথবা, 'ভূষণমিচ্ছন্তি' প্রয়োগে যদি মনে করি, মণ্ডনদ্রব্য তো নয়ই, চিত্রের এখানে-সেখানে কারুকার্য বা মণ্ডনকার্যও নয়, সমুদায়-চিত্রে-ওতপ্রোত মণ্ডনগুণই দেখতে চান স্ত্রীজাতি, তা হলেও অনুচিত বা অবাস্তব ব্যাখ্যা কিছু হয় যে এমনও নয়। বরং তার বিপরীত। চিত্রে ছন্দঃপ্রাধান্যের অবশ্যম্ভাবী ফল হল অল্প বা অধিক পরিমাণে, প্রচ্ছন্ন বা প্রকট -ভাবে, মণ্ডনগুণ, মণ্ডনধর্ম; ছন্দের দূরগামী এবং পারগামী তাৎপর্যটি যথাযথ ধারণা করা দুরূহ হলেও, ছন্দের সেই বহির্লক্ষণে আকৃষ্ট হওয়া, তজ্জনিত রূপসুষমায় বা কান্তিতে মুগ্ধ হওয়া স্ত্রীস্বভাবোচিত সন্দেহ নেই। এই মণ্ডনগুণ থাকে রূপ ও রঙ উভয়েরই।

আচার্য পণ্ডিত ও স্ত্রীজাতি -বহির্ভূত জনসাধারণ, চিত্রে এঁরা দাবি করেন বর্ণাঢ্যতা, বর্ণসুষমা ঠিক নয়, উচ্চগ্রামে বাঁধা রঙচঙ— দেশকাল-বিশেষে দ্বন্দ্বমান রঙের কোলাহলে বা কলহেও অভিরুচি হতে পারে— যেহেতু চড়া সুর আর প্রবল প্রকট রূপই এঁদের প্রিয়।

বাকি রইল রসের প্রসঙ্গ। সকল সার্থক কলাসৃষ্টির রসেই সূচনা যদি না'ও হয়, অথবা জ্ঞানতঃ না হয়, রসেই স্থিতি ও গতি তার আর সন্দেহ নেই।

বিষ্ণুধর্মোত্তর গ্রন্থে অখণ্ড একটি অধ্যায়ের ঊনচল্লিশটি শ্লোকই 'শৃঙ্গারাদিভাব-কথনে' নিযুক্ত, তার পরে চিত্রসূত্রের সমাপ্তি। কিন্তু, রসের নামরূপ যতই আলোচিত হয়ে থাক্, রসের সংজ্ঞার্থ কিছু পাওয়া যায় নি— উক্ত অধ্যায়ে রসের তত্ত্বকথা বা মর্মকথা এমন কিছু বলা হয় নি যাতে রসিকচিত্তের চিরচমৎকার জন্মাতে পারে। শাস্ত্রকারের আদৌ সে উদ্দেশ্য ছিল না মনে হয়। অথচ, এ কালের আমরা তার কমেও সন্তুষ্ট হতে পারি নে। রসের যে স্থায়ী ও ব্যভিচারী

-ভেদে শ্রেণী ও সংখ্যা বেঁধে দেওয়া যায়— কী বেশ, কী ভূষণ, কী ভাবভঙ্গী, কখন কী আচার আচরণ হবে আগে থেকে সবেরই নিখুঁত বর্ণনা দেওয়া যায় বা দেওয়ার কোনো প্রয়োজন আছে— হয়তো এ বিশ্বাসই আমাদের নেই। রস কী সে সম্পর্কে আমাদের বক্তব্যকে পরিস্ফুট করতে সাহায্য করেছেন মার্কণ্ডেয় মুনি, রসলক্ষণের বিস্তারিত বর্ণনা দিতে গিয়ে নয়, কিন্তু পূর্বোক্ত শ্লোকরাজিতে যার চরমে বলা হয়েছে— সকল কলাসৃষ্টি তত্ত্বতঃ জানেন, যিনি গীত জানেন।

যেটিকে অর্থের, অর্থাৎ মননের, পারে পৌঁছে রস বলে, উপায় ও উপাদানের চরমে পৌঁছে সেটিকেই সুর বলা হয়ে থাকে— এই আমাদের বিশ্বাস। প্রকারান্তরে এ কথা পূর্বেই বলেছি। অথচ, সুরের বিচারবিশ্লেষণে আমাদের যোগ্যতা নেই যেমন, বস্তুলাভ হতে পারে এ আশাও মিথ্যা। আলোচ্য চিত্র-কলায় সুর হয়েছে রূপ। সুতরাং, রসকে অনির্বচনীয় রস ব'লেই স্বীকার ক'রে নিয়ে, রসের বিস্তারিত নামরূপ আচার-আচরণের হিসাবনিকাশের মধ্যে না গিয়ে, রস এবং রূপের সম্পর্কটি নিয়ে শুধু কতদূর কী বোঝা যায় ভেবে দেখতে হবে। এ ব্যাপারে সুপ্রচলিত একটি বচনের তাৎপর্য গ্রহণ করে আমরা লাভবান হতে পারি। বহু ধীমান রসিক ব্যক্তির বহু শত বৎসরের কাব্যবিচারের পরিণামে সেটি পাওয়া গিয়েছে। অবোধ অচেতনকে প্রবোধ দিতে বিশল্যকরণীর মতোই অব্যর্থ। অবশ্য, বিশল্যকরণী চাই ব'লেই গন্ধমাদন উৎপাটন করে আনব না— পণ্ডিতজন আমাদের এ অক্ষমতা ক্ষমা বা উপেক্ষা করবেন।

বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্[১৭] —অতিপ্রসিদ্ধ এই বাক্য। পরিষ্কার অর্থ তার: রস যার আত্মা, সেই বাক্যই কবিতা। কবিতার দেহ হল বাক্য বা বাগর্থ।

ভাব অনুভূতি আবেগ বা প্রক্ষোভ —এগুলি রস নয়। ইক্ষু থেকে 'রস', তা থেকে গুড়— তৎপূর্বে তাড়ি হবারও একটি সম্ভাবনা আছে সন্দেহ নেই— গুড় থেকে অল্প বা অধিক পরিষ্কৃত চিনি, চিনি থেকে মলিন বা উজ্জ্বল স্ফটিকের মতো দানা-বাঁধা মিছরি, এ যেমন পরিবর্তনপরম্পরা, পণ্ডিতেরা বলেন— অতি স্থূল সুখদুঃখ বাসনাবেদনার বিক্ষোভ থেকে উত্তরোত্তর-উৎকর্ষের সিঁড়ি ভেঙে আর নানা ভাবান্তর রূপান্তর পার হয়ে, অবশেষে ব্রহ্মাস্বাদসহোদর রসে পৌঁছনো যায় এবং 'বোধে বোধ'[১৮] হয়ে থাকে। সেখানে সুখ দুঃখ শোক সান্ত্বনা ভয় ক্রোধ

[১৭] সাহিত্যদর্পণ।

[১৮] ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষা।— সংস্কার কামনাদির নানা কক্ষপথে ঘুরে ঘুরে অবশেষে আনন্দলোকে বা রসলোকে কিভাবে পৌঁছন কবি ও রসিক, কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত তা ছক এঁকে দেখিয়েছেন আর চমৎকার ব্যাখ্যা করেছেন 'কাব্যপরিমিতি' গ্রন্থে। অনেক জটিল তত্ত্ব অতি সহজে এবং অত্যন্ত মৌলিক পদ্ধতিতে বোঝানো হয়েছে।

ঘৃণা সবই অনির্বচনীয় আনন্দের বা চেতনারই নানা নাম, নানা রূপ— যা ছিল ব্যক্তিগত তাই হল বিশ্বজনীন— বিশ্বসত্তার সব-কিছু ব্যক্তির অনাসক্ত অনুরাগ, স্বচ্ছ দৃষ্টি এবং আনন্দময় প্রতীতির বিষয় হয়ে উঠল।

যে বিচার ও সিদ্ধান্ত কাব্য সম্পর্কে সত্য, প্রকারান্তরে সেটি অন্যান্য কলাসৃষ্টি সম্পর্কেও অবশ্যই সত্য এবং অর্থদ্যোতক হবে। এ হিসাবে রসাত্মক ও ছন্দোময় হলেই বাগর্থকে কাব্য, ধ্বনিতরঙ্গকে গীত, ধ্বনিতরঙ্গিত বাগর্থকে সংগীত, জড়-পিণ্ডকে মন্দির বা মূর্তি, অঙ্গভঙ্গীকে নৃত্ত বা নৃত্য, ক্রিয়ারূপকে অভিনয় এবং বস্তু বা [১৮]অবস্তু -রূপকে চিত্র বলা যেতে পারে। প্রত্যেক ক্ষেত্রে রসই আত্মা, ছন্দই প্রাণ। বাক্ অথবা ধ্বনি অথবা আকৃতি হল শরীর মাত্র। শরীরকে চালনা করে যেমন প্রাণ বা ছন্দ, বিভিন্ন উপায়ে ও উপাদানে, অন্নে, তাকে গঠনও করে সেই— প্রথম থেকে শেষ পর্যন্তই। প্রত্যেক ক্ষেত্রে ভাব আবেগ তত্ত্ব তথ্য -যোগে এক-একটি সূক্ষ্মশরীরও গড়ে ওঠে; আমাদের দেশে 'মন'কে 'সূক্ষ্ম শরীর'ও ব'লে থাকে, তারও স্রষ্টা যেন প্রাণ বা ছন্দ— আকর্ষক ও আশ্রয়দাতা।

অতীত বর্তমানের কলালোকে একটি চিন্তনীয় ব্যাপারের প্রতি রূপস্রষ্টা আর রসিক জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এ আলোচনা শেষ করতে চাই।

বিভিন্ন উপাদানে বিভিন্ন কলাসৃষ্টি, বিভিন্ন ইন্দ্রিয়সহায় চিত্তবুদ্ধির যোগে তার বিচিত্র উপভোগ, বহু ক্ষেত্রেই কলাসৃষ্টি রূপ ধরেছে দুই প্রকার— অনুষঙ্গী ও [১৯]অবচ্ছিন্ন, অথবা বলাও যেতে পারে মূর্ত এবং বিমূর্ত, concrete এবং abstract। নৃত্তে তাই কাহিনী নেই, যন্ত্রের বা কণ্ঠের গীতেও কথা নেই বা কথার বিশেষ মূল্য নেই, স্থাপত্যে জগৎসংসারের কোনো-কিছুর স্পষ্ট সাদৃশ্য বা অনুষঙ্গ নেই, অথচ উল্লিখিত প্রত্যেক কলাসৃষ্টিই ছন্দোবেগবান তো বটেই— রসাত্মক যে সে বিষয়েও কোনো সন্দেহ উপস্থিত হবে না। কাব্য এবং চিত্রের ক্ষেত্রে সাদৃশ্যহীন বা অনুষঙ্গরহিত কোনো-প্রকার রসাত্মক কলাসৃষ্টির বিষয়ে আমাদের কিছু জানা ছিল না। একেবারে অর্থহীন অথচ ছন্দোবদ্ধ কোনোরূপ শব্দসংহতি আজও প্রাচ্যে বা পাশ্চাত্যে কোথাও রচিত ও কাব্য ব'লে আদৃত হচ্ছে কিনা জানি নে। যেখানে জাগ্রতে-জানা-চেনা কিছুর সঙ্গে সাদৃশ্য নেই, অন্তত স্বপ্ন অথবা মনোবিকারের

১৮ বস্তু শব্দে সচেতন অচেতন সর্ববিধ দৃষ্ট বস্তুই বোঝাচ্ছে। 'অবস্তু'র এই সংজ্ঞার্থে স্থান হয় কিনা সন্দেহ। অবস্তু যদি বস্তুরই দেহ ধারণ করে কথা নেই, যেমন বুদ্ধ বা নটরাজ মূর্তিতে অথবা চৈনিক ড্র্যাগনে। abstract বা অবস্তু থাকবে অথচ রেখায় বা রঙে, ছন্দ শুধু নয়, রসের উদ্রেক করবে —এমন হয় ব'লে আমাদের জানা নেই।

১৯ রবীন্দ্রপ্রয়োগ।

সঙ্গেও সাদৃশ্য আছে— রসসৃষ্টি হওয়া না-হওয়ার কথা সর্বদাই পৃথগ্‌ভাবে বিচার্য। চিত্রের বেলায় ব্যাপার হয়েছে বিচিত্র। স্বপ্নসাদৃশ্যে অথবা অবচেতনগূঢ় কামনা-কল্পনা স্মৃতিবিস্মৃতির প্রেরণায় ও উপাদানে রচিত হয়ে, অথবা জ্যামিতি বা ঘনমিতির চতুর ছদ্মবেশে অল্পাধিক আত্মগোপন ক'রে, যেসব চিত্ররীতি অ-পূর্ব সার্থকতার, কী জানি হয়তো রসাত্মতারও, দাবি উপস্থিত করেছিল একদিন— তারই 'শেষ' বিবর্তনে প্রায়-সকল-সংস্কার-ও-অনুষঙ্গ-মুক্ত যে 'কেবল রূপ' নিয়ে আজ দেখা দিয়েছে চিত্র পাশ্চাত্যেদেশে তাকেও কি কলাসৃষ্টি বলব? কার্পেটে কাপড়ে, হাঁড়ি-কলসীতে, ধামা-কুলোয়, যুগে যুগে সভ্য বা অসভ্য জাতিদের মধ্যে এতদিন যা নক্সা রচিত হয়ে এসেছে— যখন সাদৃশ্য থাকে নি— সেও তা হলে বুদ্ধ বা ম্যাডোনার মুখচ্ছবি, চৈনিক জল স্থল আকাশের দৃশ্যকাব্য, ভ্যান্‌ গগের আঁকা প্রদীপ্ত পুষ্পস্তবক, বা টার্নারের মায়াতুলিতে উদ্‌বোধিত তাণ্ডবমত্ত সমুদ্র, সে-সবেরই সমশ্রেণীতে স্থান পাবে কি? অথবা, ধনী-নির্ধন শিক্ষিত-অশিক্ষিত প্রায় সর্বশ্রেণীর নেত্রপ্রীতিকর হওয়াতেই অন্ত্যজ বলে গণ্য হবে এবং স্পর্শ বাঁচিয়ে দূরে থাকবে, অন্তত ফ্রেমে বাঁধানো হয়ে বাসর বা বৈঠকখানার দেওয়াল থেকে ঝুলবে না?

জড়পিণ্ড দিয়ে রসসৃষ্টির বেলায় সাদৃশ্যযুক্ত মূর্তির বড়ো শরিক ছিল সাদৃশ্যমুক্ত স্থাপত্য— জীবনযাত্রা তথা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যবহারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তার অন্য একটি বিশিষ্টতাও আছে— বর্তমানে পরম্পরানিষ্ঠ মূর্তি ও স্থাপত্যের মাঝখানে আর-এক 'বিমূর্তমূর্তিকলা' পাশ্চাত্যে রচিত হয়েছে বা হচ্ছে যাকে কখনো মূর্তি কখনো বা অব্যবহার্য স্থাপত্য ব'লে ভ্রম হয়। স্বপ্নের অনুষঙ্গে, প্রত্যক্ষ স্থূল স্থিতির নিশ্চয়তায়, রস বা রসের আভাস কোথায় কতদূর থাকে, অথবা আদৌ থাকে না, মহাকালই তার যোগ্য বিচারকর্তা।

ইতিমধ্যে ভারতের ধারাবাহী চিত্রকলার বিচার বিবেচনা থেকে এই আমরা জেনেছি যে, দুই আয়তনের ক্ষেত্রে উদ্ভাসমান, ছন্দোবিধৃত, ছন্দেই মুক্ত, রসাত্মক যে রূপ তারই নাম চিত্র বা ছবি।

শ্রীনিকেতন

কার্তিক ১৯৫৭

কারুকলা

সম্প্রতি কোলকাতা শহরে চীনা কারুশিল্পের একটি প্রদর্শনী হয়ে গেছে। একদিন সেটি দেখবারও সৌভাগ্য হয়েছে। কলিকাতার যাদুঘরে সুন্দরভাবে সাজানো; সুন্দর আলোর ব্যবস্থা; সহাস্য স্বেচ্ছাসেবক-সেবিকার সমাবেশ— শিক্ষিত, সজ্জন, সুবেশ নরনারীর ভিড়ও নিতান্ত কম ছিল না। প্রদর্শনীতে প্রবেশ ক'রে যেন ভিন্ন একটা জগতে এসে পড়া গেল, সেখানে সবই সুন্দর। কত-রকম উপাদানে কত-রকম ব্যবহারের উদ্দেশে কত বিচিত্র গড়নের মনোহারী দ্রব্যসামগ্রী তার যেন সংখ্যা নেই। যেহেতু চোখের দেখাকে কলমের লেখায় ফুটিয়ে তোলা অসম্ভব, এটুকু বলাই যথেষ্ট— কাঠের কাজ, হাতীর দাঁতের গড়ন, সোনারুপার ও অন্যান্য ধাতুর বাসনপত্র বা অলংকার, সেলাইয়ের কাজ, ছাপ-দেওয়া কাপড়, কার্পেট, মাদুর, কঠিন থেকে কঠিন পাথর কেটে পানপাত্র বা ফুলদানি, বাঁশের কাজ, তালজাতীয় আঁশের কাজ, গালার কাজ, পোড়া মাটির ও চীনামাটির বহু ঢঙের বহু রঙের বহুবিধ আধার— বিচিত্র-কারু-খচিত আর নিরাভরণ, সুন্দর— সব-কিছু নিয়ে মুগ্ধ নয়নের উৎসব আর রূপশোভার দীপান্বিতা। কাঠ, আইভরি, রেশম, পশম, তুলা, সোনা, রুপা, অন্যান্য ধাতু, এসব উপাদানে চীনা কারিগর যা সৃষ্টি করেছেন দেখা গেল, উৎসাহ পেলে ভারতের কারিগর, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে, তার সমকক্ষতা সহজেই করতে পারবেন বলা যায়— এমন-কি, অধিকতর নৈপুণ্য আর অধিকতর সৌন্দর্যরুচির প্রমাণ উপস্থিত করাও অসম্ভব হবে না হয়তো। কিন্তু বাঁশের কাজ, আঁশের কাজ যা দেখলেম, চীনের বাইরে আর কোথাও তা হয়েছে বা হতে পারে এ কথা জোর করে বলতে পারি নে। কেবল শোনা কথার উপর উল্লেখ করতে পারি, ভারতের পূর্বসীমান্তে, ত্রিপুরারাজ্যে, ঘরামির কাজ অত্যন্ত উঁচুদরের একটি কারুকর্ম। ত্রিপুরা-রাজ্যের কারিগর বেত-বাঁশ খড়-কুটা এমন-সব তুচ্ছ উপাদানে এমন গৃহ নির্মাণ করে, সৌন্দর্য যার কল্পনাতীত। বেত বা বাঁশের উপাদানে বোনা ঘরের দেয়াল— সেই বুনোনের অকল্পনীয় বৈচিত্র্যে কত রূপে কত রঙে কত সারসহংসসেবিত কমলবন চার ধারে বিকশিত, বিহসিত, চোখে দেখি নি সত্য, এ কথা শুনেছি, তখনকার দিনে ইংরাজ-রাজ-অতিথি এলে পাকা দালানে উঠেছেন আর ত্রিপুরা-রাজ স্বয়ং থেকেছেন ঐ পর্ণকুটীরে ; রাজ-আতিথ্য গ্রহণ ক'রে রবীন্দ্রনাথও বলেছেন, 'আমার লোভ ঐ

উটজে, প্রাসাদে নয়।' মুর্শিদাবাদ কৃষ্ণনগর অঞ্চলেও মাটির ঘর, মাটির দেয়াল (যেন পঙ্খের-কাজ-করা) এবং খড়ের চাল (তার বাতার বাঁধুনিতে থাকত অনেক রঙের অনেক কারুকার্য) এমন সুন্দর হত যে, সেও পাকা ইমারত তুচ্ছ ক'রে বসবাসের যোগ্য। এও শোনা কথা, চোখের দেখা নয়। চোখে দেখলাম, চীনা কারিগর অতি সূক্ষ্ম তারের মতো ক'রে বাঁশের চেয়াড়ি চিরে চিরে তাইতে বুনেছে ছোটো ছোটো সাজি, পেতে, কৌটো— বিবিধ গঠন, বিচিত্র কারুকার্য। তালজাতীয় গাছের আঁশ থেকে চল্লিশ নম্বরের সুতো বেরিয়ে এসে হাত-ব্যাগে বোনা হয়েছে, তার হাতলের পাশে উড়ে এসে বসেছে রূপনগরের পাখি। বাঁশের সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্ম কাঠি দিয়ে বোনা এক-জোড়া জুতো, ছড়ার ছন্দে যাকে 'জুতুয়া' ছাড়া আর-কিছু বলা চলে না, এত সুন্দর যে মনে হয় কারিগর যদি খুশী হয়ে উপহারই দেয় বা সোনাদানার বিনিময়ে বিক্রি ক'রে ফেলে, এ জিনিস আমাদের অগোছালো ঘরে দুয়োরে, অসুন্দর পরিবেশে রাখব কোথায়— স্বপ্নপারাবারের অন্য পারে অলোকসুন্দরী যে রাজকুমারী আছে নিভৃত নিদমহলে, সোনার কাঠি ছুঁইয়ে তাকে না জাগাতে পারলে কার রাতুল দুটি চরণকমলে শিল্পীর এ কল্পনার রূপ, সাধনার সামগ্রী, সাধের সৃজন সার্থক হবে? দেশ-বিদেশের কারখানা-ঘরের আবশ্যক অনাবশ্যক মালে বোঝাই আমাদের গুদাম-ঘরের মতো বাসের ঘর, সেখানে এই জুতো-জোড়াটি মানাবে কি? শেষ পর্যন্ত কাচের আল্‌মারিতেই তুলে রেখে দিতে হবে সন্দেহ নেই।

এ প্রদর্শনীতে বেতের কাজ হয়তো ছিল না, বাঁশের ও আঁশের উপাদানে রচিত শিল্পদ্রব্য ছিল অপূর্ব। গালার কাজ, পোড়ামাটির কাজ, চীনামাটির পানপাত্র ও ফুলদানি— এগুলিতে চীনা কারিগরের বৈশিষ্ট্য ও নিপুণতা বিশ্ব-বিখ্যাত। প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের অন্য কোনো দেশে এ-সব শিল্পসৃষ্টি নিয়ে এমন চর্চাও হয় নি, তাই এমন কল্পনাতীত সৌন্দর্যরুচি ও উৎকর্ষ আশাও করা যায় না। পোর্সিলেন বলবা-মাত্র চীনা শিল্পসৃষ্টির কথাই মনে হয়।[১] তার শত-শত-বৎসর-ব্যাপী পরম্পরা ও সাধনা, তাকে ঘিরে কত কল্পনা ও কাহিনী, কত শিল্পী-কারিগর আমীর-ওম্‌রাহ রাজা-বাদশার আগ্রহ উৎসাহ ও আনন্দ। বস্তুতঃ চীনা রূপ-কল্পনার প্রসঙ্গ-মাত্রে তিনটি বস্তুর কথাই মনে হয়— তার অরণ্য-পর্বত-সরিৎ-সমুদ্র-আকাশের ছবি, দু-এক-বিঘত কাগজ বা কাপড়ের জমিতে দুই শত ক্রোশের বিস্তার; তার লেখাঙ্কন বা ক্যালিগ্রাফি; তার চীনামাটির পানপাত্র, কলস, ফুলদানি। শেষোক্ত রূপসৃষ্টিগুলি ব্যবহারের বস্তু ব'লেই শিল্পমর্যাদায় সব সময়

১ ইংরেজিতে আবার চীন দেশ আর চীনা পোর্‌সিলেন অভিন্ন শব্দেই নির্দেশ করা যায়।

যে ন্যূন বা অকুলীন এমন বলা চলে না। একটি পোর্সিলেন জার বা কলসের রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হয়ে জড় উপাদানেই চেতন সত্তার উদ্ভাস অনুমান ক'রে সময়-সময় কবির ঐ উক্তি মনে মনে উচ্চারণ করতে হবে: নয়ন ন তিরপিত ভেল। ফলতঃ এরূপ ক্ষেত্রে ফুল্ল চেরী-চন্দ্রমল্লিকার আধার বা পানের পাত্র নিরাকার রসেরই আধার, অমৃতেরই পাত্র হয়ে উঠেছে। ভিতরে ভিতরে সব ভেদ ঘুচে গিয়েছে চারুকলায় ও কারুকলায়। দেশ-বিদেশের সমঝদার রসিকজন এই দৃষ্টিতেই এই শিল্পসৃষ্টিগুলি দেখে থাকেন।

সার্থকনাম কারুশিল্পে ও চারুশিল্পে আসলে কোনো ভেদ নেই। ঋষিকবি হুইট্‌ম্যান যেমন বলেছেন, দেহে আত্মায় বিরোধ নেই, ব্যবধান নেই, তারা প্রতিবেশী নয়, পরস্পরের অনুতে অনুতে অনুপ্রবিষ্ট হয়েই আছে— দেহ আত্মময় আর আত্মাও দেহময়। একটি চীনা গল্প মনে পড়ে। এক কারিগর কাঠের আসন বেদিকা প্রভৃতি নির্মাণ করত। সেগুলির রূপের ও কারিগরির তুলনা ছিল না। চীনা বাদশার কানে গেল ঐ কথা। তিনি তার কাজ দেখলেন। ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, বলি মোড়লের পো, বিশ্বকর্মার কাছে মন্ত্রতন্ত্র পেয়েছ তুমি, না, বিশ্বকর্মাই চুপিচুপি এসে এগুলি গ'ড়ে গেছেন, না, ইন্দ্রচন্দ্রের কারিগর তুমি, শাপভ্রষ্ট, ছদ্মবেশে আমার রাজ্যে এসে বাস করছ? কারিগর কী আর বলবে? সে বলে, না হুজুর, আমি গ্রামের অশিক্ষিত চাষা, মন্ত্রতন্ত্র জানি নে, দেব-দেবীর প্রসাদ আমি কোথা থেকে পাব? তবে আবাল্য এই আমার এক শখ, এক নেশা। একটা-কিছু তৈরির খেয়াল ভর করলে দিন রাত ঐ চিন্তা আর ভুলতে পারি নে; ক্রমে একটা গড়ন মনের ভিতর ফুটে উঠতে থাকে; সপ্তাহ যায়, পক্ষ যায়, সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ ক'রে গড়নটি দেখতে পাই মনের মধ্যে; মনের পটে জ্বল্ জ্বল্ করতে থাকে; তখন ঐটিকে বাইরে আকার না দিলে তো নাওয়া-খাওয়ায় সুখ পাই নে— বনে পাহাড়ে ঘুরে ঘুরে খুঁজতে থাকি কোন্ সুঁদরি গাছে, শাল গাছে, সেগুনের গুঁড়িতে আমার ঐ মনের গড়নটি ধরা আছে। সেটির আবিষ্কার হলেই বনের গাছ কেটে ঘরে আনি আর কাজে লেগে যাই। খাওয়া-দাওয়া ভুল হয়ে যায়; শেষ পর্যন্ত শরীর ভুল হয়ে যায়; নিজের হাত-পা আছে কি নেই সেও টের পাই নে— তখনই আমার গড়া শেষ হয়। আমি খুশী হই, যে দেখে সেই খুশী হয়। রহস্য আছে কিনা বলতে পারি নে। কী ক'রে কী হয় ঠিক বলতে পারি নে হুজুর।

এটি গল্প বা সত্য, হলপ ক'রে বলি কেমন ক'রে? ভিন্ন দেশের ভিন্ন যুগের কথা। সত্য হোক বা না হোক, রবীন্দ্র-ব্যাখ্যাত আরো-সত্যের পর্যায়ে এর স্থান। আর্য শুভঙ্করের সেই দেউলের কথাও মনে পড়ে 'তেহাই সলিলে' যার, পাঁকে

আর মৃৎ-প্রস্তরের সুদৃঢ় স্তরেও সন্দেহ নেই— বাকিটা নয়নগোচর আর নভো-মুখী। তেমনি যা-কিছু মানুষের প্রাণের রূপ, মনের সৃজন, চিত্র, মূর্তি, কবিতা, তেমন-তেমন থালা-বাটি, হাঁড়ি-কলসী, আসন-পীঁড়ি, ছাতা-ছড়ি, পাদুকা-পিলসুজ, কাপড়-উড়ুনি, পুতুল-খেলনা, হাতের পায়ের কানের কণ্ঠের সিঁথির ও শিরের ভূষণ— সোনায়-রুপোয় তামায়-পিতলে মানিক্যে-মুক্তায় শঙ্খে-পুঁতিতে— জড় যদিও তার উপাদান, চিন্ময় তার ছটা। বস্তুতে অবস্তুতে তার নির্মাণ; স্বপ্নে সত্যে আরো-সত্যে তার স্থিতি ও গতি।

সমুদয় শিল্পচেষ্টা আর শিল্পসৃষ্টি অখণ্ড মানবজীবনের অঙ্গীভূত। জীবন যদি দেহ মন হৃদয়বৃত্তি বা চেতনা কোনো একটিমাত্র ভূমিতে আবদ্ধ না হয়, মানুষের শিল্পচেষ্টা আর শিল্পসৃষ্টিও তা হলে সর্বতোমুখ। সেই সমগ্রতায় কারুশিল্প ও চারুশিল্প উভয়েরই নানারূপ সার্থকতা আছে, যথাযোগ্য স্থান আছে; এক দিকের বিকাশ ও বৃদ্ধির অভাবে অন্য দিক ব্যর্থ ও পক্ষাঘাতগ্রস্ত হবে সন্দেহ নেই। কারুশিল্পে চারুশিল্পে স্বরূপতঃ ভেদ নেই, আমাদের চিন্তায় এত দূর যেতে নারাজ হলেও অন্তত এ অভিমতে কারও আপত্তি উঠবে কি— কারুশিল্পেই চারুশিল্পের প্রতিষ্ঠা, আবার চারুকলাই কারুকলার জননী। অলৌকিক প্রতিভা-বলে শিবের বা সূর্যের বা সরস্বতীর বিগ্রহ একটি গড়া হল, চারুশিল্পের অতি-উৎকৃষ্ট সেই নিদর্শন, তাকে স্থাপন করবার উপযোগী মন্দির চাই। সেই মন্দিরও হবে উন্নত শিল্পকীর্তি। তার ভিতরে বাইরে, গর্ভগৃহে, নাটমন্দিরে, স্তম্ভে তোরণে, চত্বরে চূড়ায়, অন্ধিসন্ধিতে, ধূপে দীপে, বসনে ভূষণে, ছত্রে চামরে, শঙ্খে ঘণ্টায়, আস্তরণে কানাতে, শতবিধ সহস্রবিধ আয়োজনে, নিত্যনৈমিত্তিক পূজার্চনায় উৎসবে, একটি সজাগ প্রীতি ও সৌন্দর্যরুচির পরিচয় থাকা চাই— ভক্ত, পূজারী, প্রতিষ্ঠাতা, সমাজস্থ আবালবৃদ্ধবনিতা, এদের অন্তরকে বাহিরে রূপ দেওয়া চাই অন্তহীন কলাকৌশলে। চারুশিল্পকে ঘিরে ঘিরে অজস্র কারুশিল্পের সুন্দর সমাবেশ না হলে কেমন ক'রে এ অসাধ্য সমাধা হবে? কোনোদিন হয়ও নি। তবে আজকালকার 'কৃষ্টি'লুভী আমরা, ছোটো বড়ো মাঝারি রকমের মধ্যবিত্ত— চিত্র মূর্তি, শ্রীক্ষেত্রের পট, বিষ্ণুপুরের তাস, কাথিওয়াড়ি খেলনা, জাপানী ছাতা বা হাওয়াই-দ্বীপী কঞ্চুলিকা, সাত হাট ঢুঁরে ঢুঁরে কুড়িয়ে-বাড়িয়ে এনে ঘর বোঝাই করতে ত্রুটি করি নে। তাতে কি ঘরেরই শ্রী ফেরে, না, আমাদের সেই সাধুপ্রয়াস লক্ষ্য ক'রে উৎকীর্ণ অবলোকিতেশ্বর আর চিত্রিতা দেবী বা মানবী কণাপরিমাণ স্মিতপ্রসাদ বিকিরণ করেন? রেল-স্টেশনের তৃতীয় শ্রেণীর 'আরাম'-ঘর-সদৃশ আমাদের দিনগত পাপক্ষয়ের বিশৃঙ্খল বিশ্রী পরিবেশে কেই বা কার পানে চেয়ে দেখে? জড়ো করা হয়েছে এইমাত্র। প্রাণ থেকে প্রাণ তো

পায় নি। যে এনেছে আর যাকে আনা হয়েছে উভয়ের মধ্যে আত্মীয়সম্পর্ক-স্থাপনের সময় বা সুযোগ ঘটে নি। সমস্ত পরিবেশ নিয়ে, গৃহস্থালি নিয়ে, নিত্য-নৈমিত্তিক জীবনযাত্রা নিয়ে, সুন্দরের ইতস্ততোবিক্ষিপ্ত অভিজ্ঞানগুলি গেঁথে গেঁথে, রুচিরা মালিনী অথবা বিদ্যুন্মালা দূরে থাক্, ভুজঙ্গপ্রয়াতেও কাজ নেই, একটি কোনো 'মুক্ত ছন্দ' বা 'গদ্যছন্দ' পর্যন্ত রচিত হতে পারে নি।

মধ্যবিত্তের জীবনযাত্রাই ভালো করে জানি; তাই তার উল্লেখ। সমাজের আরও নীচে, আরও উপরে, বস্তিতে আর 'বিড়লা-মন্দিরে', ব্যাপার আজ একই প্রকার দাঁড়িয়েছে। উত্তরাপথে আর দাক্ষিণাত্যে বড়ো বড়ো তীর্থস্থল আর দেব-মন্দিরকে কেন্দ্র করে সুপ্রাচীন কাল থেকে যে-সব কলা ও কারুশিল্পের অনুশীলন হয়ে এসেছে এখনো সব তার লোপ পায় নি জানি, একটা-দুটো কোণার্ক আর সোমনাথমন্দির বিচূড় ও পরিত্যক্ত হলেও, অন্য বহুশত স্থাপত্যকীর্তি প্রাচীন হিন্দুর জ্ঞান বৈরাগ্য ঐশ্বর্য বীর্য ও সৌন্দর্যরুচির শাশ্বতবাহিনী ত্রিপথগামিনী ধারার কূলে কূলে দাঁড়িয়ে রয়েছে— মহাকাল সব তার সংহরণ করেন নি আর জাতির তামসিকতা-মূঢ়তা অথবা বিজাতির আক্রমণ সব তার অপসারণে সমর্থ হয় নি— কিন্তু ধনীর জীবন আজ জড়বস্তুর ভারে ভারাক্রান্ত; মধ্যবিত্তের জীবন বিশৃঙ্খল ও ভয়চকিত, বাড়ি ছাড়ার নোটিশ পাওয়া গেছে, উঠতে হবে, এই যেন ভাবটা সর্বদা। এই ভাব ত্যাগ করা দরকার। সাম্যমূলক অর্থনীতির প্রয়োগে ও সামঞ্জস্যপূর্ণ নূতন সমাজব্যবস্থায়, অদূর ভবিষ্যতে তারই অনুকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি হবে কি? তখন, মন্দির নাহয় নাই হল, ঠাকুর-ঘরও তো রচনা করতে পারব চিলে কোঠায়। সাত্ত্বিক পূজাপদ্ধতিতে শালগ্রাম শিলা রাখা চলে ঘুঁটের ঝুড়ির ভিতরে; গৃহীজীবনের আদর্শ সেটি নয়। ভাবে ভোলা পরমহংসের অন্তরের রূপলোকে, রসলোকে, অপরিসীম ঐশ্বর্য থাকলেও বাইরে আছে দৈন্য, রিক্ততা। কিন্তু শিল্পের সার্থকতা সেখানেই, যেখানে অন্তরে আর বাহিরে মিল, অন্তরের চূড়ান্ত প্রকাশ বাইরে। কাজেই উপায় উপকরণ চাই বহুবিধ, যত্ন চাই প্রচুর। এই ঠাকুর-ঘরে কেমন শুচিশুদ্ধ প্রসন্ন দেহমন নিয়ে আসতে হবে, বসতে হবে, কিভাবে এই ঘরের ধূপসুরভি বাতাসে আর অরুণালোকিত অবকাশে মনকে মেলে দিতে হবে, মগ্ন করতে হবে— সেও জানা চাই। মোট কথা, 'ঠাকুর একটি প্রতিষ্ঠা করব' বললেই হল না। ঠাকুর তো থাকবেন না নিঃস্ব শ্রীহীন পরিবেশে; তাঁর সুন্দর ও সরস ঠাকুরালির অনুকূলে চতুঃষষ্টি কারুকলার কিছুই বাদ দিলে চলবে না— এবং আমাদের ওঠা-বসা আসা-যাওয়া কামনা-কল্পনা ভাবনা-অনুভব ছন্দে বাঁধতে হবে।

কথার কি পুনরুক্তি হল? উপমা-অলংকারে ঢেকে গেল? এই কথাই

বলতে চাই, ঠাকুর-প্রতিষ্ঠাতে ঐ যেমন দায়িত্ব তেমনি সমুদয় রূপসৃষ্টি নিয়ে। অর্থাৎ, রসরূপ শিল্পই আমাদের ঠাকুর, চারুশিল্পের আমরা পূজারী, বহুবিচিত্র কারুকর্মের সংগতিতে সে পূজার আয়োজন।[২] চিত্র বা মূর্তি সে কি যেমন তেমন ক'রে যেখানে-সেখানে ফেলে রাখবার জিনিস? তা হলে কেনই বা শিল্পী তাকে জীবনসাগর মন্থন ক'রে লোকলোচনের আকাশে উদ্ধার ক'রে এনেছে? কেনই বা কেউ তাকে ঘরে আনল? টাকা আছে ব'লে? সভ্যসমাজে এই একটা দস্তুর আছে ব'লে? কেউ কি এই শিল্পসৃষ্টিকে বরণ ক'রে নেবে না? এর সঙ্গে অন্যান্য পরিবেশ ছন্দিত ক'রে, নন্দিত ক'রে নেবে না? তা হলে তো মরুবালুতেই শেষ হয়ে গেল রসের ধারা। ব্যাপক সফলতা রইল না শিল্পীর শিল্পচেষ্টায়। এভাবে শিল্প বাঁচে না, শিল্পীও বাঁচতে পারে না দীর্ঘদিন। কারণ, সৃষ্টি নিরুদ্দেশ হয় না। শূন্য ভুবনে কেউ ছবি আঁকে না, কেউ গান গায় না, কেউ নাচে না। আনন্দই শিল্প-সৃষ্টির হেতু। সেই আনন্দ একেবারে অহেতুক নয়। আনন্দের জন্য দুইয়ের প্রয়োজন আছে, বহুর প্রয়োজন আছে। না হলে ঢেউ ওঠে না। চেতনার ঢেউকে বলি আনন্দ— সুখে হোক, দুঃখে হোক, হাস্যে করুণায় অথবা বিষাদে। অন্তর-বাহিরের ঘাত-প্রতিঘাতে যেমনি সেই ঢেউ ওঠে, ধন্য হয়, কৃতার্থ হয় শিল্পী। ক্ষান্ত হয় না, নিষ্ক্রিয় হয় না তা ব'লে। আনন্দ আপনাতেই আপনি সার্থক, সম্পূর্ণ। অথচ ভাবভাষার নিয়ম লঙ্ঘন ক'রেই বলতে হবে, সেই স্বভাবসার্থক সম্পূর্ণ আনন্দ ভাবভাষার কাছে, রূপরেখার কাছে, দারুপ্রস্তরের আকারে অবয়বে, পুনঃপুনঃ আত্মদান ক'রে সার্থকতর, সম্পূর্ণতর হয়। সেখানেই শিল্পীর বিশেষ সম্পূর্তি, বিশেষ সার্থকতা। শেষ কি? তা নয়। শিল্পীর সেই একক সিদ্ধি ও সম্পূর্ণতা অন্যের উদ্দেশে, অনেকের উদ্দেশে, বিশাল সমাজ ও সীমাহীন দেশ কাল লক্ষ্য ক'রে ভূয়ঃ ভূয়ঃ উৎসর্গিত হয়ে নিত্যই সার্থকতর হতে পারে, তবেই তার নিঃশব্দ কণ্ঠের গানে আকাশ ভুবন পূর্ণ হয়ে ওঠে: তার অন্ত নাই গো যে আনন্দে গড়া আমার অঙ্গ। না হলে মৃত্যু— যাদুঘরের কবরখানায় সাজিয়ে রেখে কোনো ফল হবে না। তা হলে শুষ্কতার মরুবালুরাশির দিনে দিনেই বাধাহীন নিঃশব্দ সঞ্চার।

[২] এ প্রবন্ধ ফেলে রেখে, পাঠক নাহয় 'জাপান-যাত্রীর' চতুর্দশ অধ্যায় পড়ে দেখুন কেমন ঠাকুর, কী ভাবের পূজা। আমরা যেখানে ঠাকুর ব'লে পূজা করি, শিল্প ব'লে নয়, এবং চতুর্বর্গ ফলের অথবা অহৈতুকী ভক্তির প্রত্যাশা করি, জাপানীরা (চীনা সংস্কৃতি, ভারতীয় প্রভাব, ঐ ক্ষুদ্র দ্বীপাবলীতে সুসংহত সুশৃঙ্খল সুচারু রূপ পেয়েছিল) সার্থক শিল্পমাত্রের পূজা করে (নাইবা হল নির্বাণদাতা বুদ্ধ) এবং জীবনে লাভ করে শৃঙ্খলা সৌন্দর্য শান্তি সুখ। শিল্প সম্পর্কে একটা হল ধার্মিকের দৃষ্টি, আর-একটা রসিকের। একটি আর-একটির পরিপূরক হলেই ভালো হয়।

এ বিষয়টিকে প্রধানতঃ কারুশিল্পের দিক থেকেও দেখা যায়। বস্তুতঃ চীনা-শিল্প-প্রদর্শনী দেখতে গিয়ে দর্শকের মনে সেই ভাবেই কথাটা উঠেছে, অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিত বিস্ময়ের চমকে মনকে নাড়া দিয়েছে। এই-যে অপরূপ পেয়ালাটি, পিরিচটি, অথবা এই-যে বাঁশের চেয়াড়ির সাজি বা পেতে বা পরী-পাদুকা, এর যে-কোনো একটিকে ঘরে স্থান দিলে সে কি রাত-দুপুরে বা দিন-দুপুরে, গোপন খিড়কি-দুয়ার খুলে অথবা সদর-দেউড়ি দিয়ে, নিজের জ্ঞাতিবন্ধু আরও পাঁচ জনকে ডেকে আনবে না নিঃশব্দ ইঙ্গিতে? আমার যে খুকুমণির রাতুল পা-দুটিতে এই শ্যাম-সোনালি জুতুয়া দুটি পরিয়ে দেব, তার মন রেখে, এর মান রেখে ও ছন্দ রেখে, তেমনি ঘাগরা, তেমনি ওড়না, তেমনি হাতের চুড়ি, গলার হার, চুলের ফিতে, ফোটা ফুলের সাজ দিতে হবে না কি? আর, খুকুমণির মাকেও কিছু হেলা করা যায় না। তা হলে? জরুরী প্রয়োজন যখন, লটারির বাজি জিতেও নাহয় দশ-বিশ হাজারে সবটার সুরাহা কিছু করা গেল, তবু ভেবে দেখতে হবে অগস্ত্য-অ্যাভিনিউএর এক-ফালি ফ্ল্যাটে, একটা বারান্দা ও সাড়ে তিনখানা ঘরে, এ চৈনিক বিলাসিতার দৈনিক আকৃতি-প্রকৃতি অচিরেই ধূলিমলিন ও শোকাবহ হয়ে দাঁড়াতে পারে— তা ছাড়া চারি দিকের সমাজের সঙ্গে, শহরের সঙ্গে, কোথাও কোনোক্রমেই খাপ খাবে না। দাঁড়কাকের এ ময়ূরপুচ্ছবিলাস মিছে হবে।

ফলতঃ, অনুকরণের দ্বারা শিল্পসমৃদ্ধি লাভ করাও অসম্ভব। যে দেশকালের শিল্পসৃষ্টি সেই দেশকালেই শোভা পায়। যে-কোনো সৌন্দর্যসৃষ্টির মূলমন্ত্রটি, সৃজনমন্ত্রটি, শিখে নিতে পারি যদি, তা হলে আমরাও কৃতকার্য হব, কৃতার্থ হব। বাহ্য অনুকরণের দ্বারা নয়। এ কথাও ভেবে দেখবার যোগ্য, এই পিরিচ-পেয়ালা, এই ছড়ি-ছাতা, এই সাজি-পেতে ঠিক-ঠিক মানায় বা মানাতে পারে এমন একটি পরিবেশ নিঃসন্দেহই আছে; এগুলির সঙ্গে ছন্দ রেখে গ্রামান্তবাহিনী নদীটি, পূর্ব দিকের পাহাড়-কয়টি, কুটিরটি, বাগানটি, উঠোনটুকু, আর উঠোনে-আলোছায়ার-ঝিলিমিলি-টানা বাঁশঝাড় ভূর্জ দেওদার ঝাউয়ের জটলা, এসবও সেই পল্লীবাসী ছেলে বুড়োর জীবন ঘিরে আছে। আর ঘরে সেলাইয়ের কল, খাকী পোষাক, মোটর-বাইক বা নাকী সুরের আওয়াজ-বন্দী যন্ত্র নাহয় নাই রইল, তবু সেই দূর বা অদূরবর্তী দেশে কালে ছন্দপতন হবার মতনও অনেক-কিছু আছে বা ছিল। বালিগঞ্জে টালিগঞ্জে 'কৃষ্টি'র উগ্র আগ্রহে যে পরিমাণ কমেডির সৃষ্টি হতে পারে তা না হোক, ফুলে-ভরা ডাল কি কেউ মুচড়ে ভাঙে নি? আঁস্তাকুড়ের আবর্জনা কি আবশ্যকের অতিরিক্ত স্তূপীকৃত হয়ে নেই? জমিদার মহাজনের অত্যাচার কি মুখ বুজে সইতে হয় না? তা ছাড়া, ছেলেটা হয়তো মিথ্যাবাদী, স্ত্রী মুখরা, লম্পটের পাল্লায় পড়েছে বয়স্থা কন্যা— জ্বরজ্বালা জরার কথা ছেড়েই দাও।

জীবনের সবটা সুন্দর নয়, সর্বত্র সুন্দরের ছন্দ প্রবল নয়, প্রসারিত নয় —এ কথা অস্বীকার ক'রে লাভ নেই। এইমাত্র বলা যায়, স্বপ্নে ও বাস্তবে চিরদিনের যা অসংগতি সে তো আছেই, তা ছাড়াও বর্তমান শূদ্রযুগে কুশ্রীতা ও শুষ্কতা বহুগুণ বেড়ে গিয়েছে ; আর, শ্রী নেই, শালীনতা নেই, রস নেই —এজন্য লজ্জা পাব যে এমন চিত্তদৌর্বল্যও আমাদের ঘুচে গেছে মনে হয়। লজ্জা নেই এইটেই লজ্জার কারণ। সুন্দর-অসুন্দরের ভেদবুদ্ধি ঘুচে গিয়ে অদ্বয়জ্ঞানসিদ্ধির পথেই শনৈঃ শনৈঃ এগিয়ে চলেছে মনুষ্যজাতি এমন যদি না হয়, তা হলে দেশ জুড়ে কারুশিল্পের নব-উজ্জীবনের বিশেষ প্রয়োজন। কারখানা-ঘরে তার যে সুলভ অনুকৃতি হয় মুহূর্তে দশ-হাজার বিশ-হাজার হারে তাতে মূলের রঙ ঢঙ কিছুটা থাকলেও, শিল্পীর 'মনের মাধুরী' থাকে না। (সেটি বড়ো সূক্ষ্ম জিনিস, আর সেটির সদ্ভাব বা অভাব বুঝে নিতেও হয়তো আবাল্য অভিজ্ঞতারই প্রয়োজন)। কলে-ছাঁটাই চালে যেমন পালিশ থাকে, থাকে না অতিপ্রয়োজনীয় ভাইটামিন বা প্রাণপদার্থ। অথবা ফুলের উপমা দিয়ে বলা চলে, সে শুধু কাগজের ফুল, প্ল্যাস্‌টিকের 'মন্দারমালা', গন্ধ নেই, মধু নেই, শিশিরস্নিগ্ধ পেলব স্পর্শ নেই— শিল্পদ্রব্যে যা হল শিল্পীর বা কারিগরের মনেরই স্পর্শ, মনেরই গন্ধমধু। কারিগরের হাতের তৈরি কারুসামগ্রীগুলি আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার নানা প্রয়োজনে আমাদের ঘর-গৃহস্থালির যত্রতত্র ঠাঁই করে নিয়ে যদিবা সৌন্দর্যের স্বপ্রকাশ দিন বা স্বপ্নস্মিত পৌর্ণমাসীর সৃজনে অশক্ত হয়, মুহুর্মুহু জ্ব'লে নিভে খদ্যোতস্নিগ্ধ দ্যুতির চমকে মানুষের স্থূল জড়জীবনের কিছু যে উদ্ভাসিত করে না এমন নয়। আবার এও জানি, এই জড়ভারপীড়িত স্থূল প্রয়োজনের জীবনে, ঝাঁজা-ব্যস্ততায়-নিরবকাশ অন্ধ জীবনে, চারুশিল্প আসে স্থিরোজ্জ্বল দীপবর্তিকা জ্বালিয়ে, স্বচ্ছ কাচবুদ্‌বুদের অভ্যন্তরে দিগ্‌দাহিনী চপলাকে অচপল স্থৈর্য দিয়ে— চাঁদের মায়ামুকুরে যেমন রূপান্তরিত হয় সৌরজ্যোতি তেমনি অপরূপ প্রতিভাও সৃজন ক'রে অলৌকিকের। অন্ধকে দৃষ্টি দেয়।

চারুশিল্পের প্রতিষ্ঠা হল কারুশিল্পে। কারুশিল্পের অভাবে চারুশিল্পের বোধন হয় না, যথাযোগ্য স্থাপনাও অসম্ভব ব্যাপার। যার বোধন হল না, উপযুক্ত আশ্রয় ও পরিবেশ —আয়োজন ও অনুষ্ঠান— জুগিয়ে দেওয়া হল না, সে তো থাকবার নয়, পথ ভুলে যদিবা এসে থাকে।

কারুশিল্পের প্রেরণাও বহুভাবে আসে চারুশিল্প থেকে। কারণ, রূপকল্পনার মূলপ্রেরণা, মূলতত্ত্ব, রসরূপস্রষ্টা শিল্পীর আয়ত্তে। কারুশিল্পে ঐ মূলতত্ত্বেরই বহু-বিচিত্র ব্যবহারিক প্রয়োগ। অতএব শিল্পীর কাছে কারিগর সাক্ষাৎ ভাবে শিক্ষা নিতে পারে, অথবা অসাক্ষাতে দীক্ষা নিতেও পারে।

অথবা আদিশিল্পী আদিকবির কাছেই সৃজনরহস্যের মর্ম অবগত হয়ে যে-কোনো শিল্পী, কারিগর, রূপরচনায় উৎসুক উন্মুখ হলে পরে, উপাদানভেদে, প্রয়োজনভেদে, আবেগ ও অনুভূতির স্তর ও তীব্রতা -ভেদে, একই প্রেরণা বিবিধ চারুশিল্প হয়, কারুশিল্প হয়, রূপ থেকে রূপান্তরে অনিঃশেষ গতিতে ধাবিত হয় —এরূপও বলা চলে।

এই কথাই সুনিশ্চিত, কায়মনোবাক্যের বিবিধ উপায়ে, চিন্ময় ও মৃন্ময় দ্বিবিধ উপাদানে, ধ্যান-ধারণা আবেগ-অনুভূতি অথবা দৈনন্দিন ব্যবহার এ তিনের যে-কোনো ক্ষেত্রে, যা-কিছু রসের রূপ দেওয়া হয়ে থাকে সে-সকলই পরস্পরের পরিপূরক ; পরস্পরের বিম্ব-প্রতিবিম্ব নিয়ে 'আলো'-ছোঁড়াছুঁড়ির নিঃশব্দ হোলি-খেলা খেলে ; সকলে মিলেই এই মানবজীবনকে আলোময়, উৎসবময়, আনন্দময় করবার যোগ্যতা রাখে। কিছুই অবহেলার বস্তু নয় ; কারণ, সকলের যোগেই প্রত্যেকের সার্থকতা। পরিণামে, আমাদের এই মর্তজীবন নিখুঁত সুন্দর হতে তো পারে না, সর্বৈব মধুময় হওয়াও অসম্ভব— কিন্তু সুধাধৌত সৌন্দর্যের ঐ আকাশে মুখ তুলে ধরতে পারে, দৃষ্টি তুলে ধরতে পারে এবং পরিপূর্ণ সুন্দর, আনন্দরূপমমৃতম্‌, তারই একটু আভাস, একটি প্রতিচ্ছবি নিভৃত অন্তরে অঙ্কিত করে ধন্য হতে পারে।

কারু ও কলা মানবজীবন সুন্দর করে ; জীবনের অনেক অসংগতি, হৃদয় মনের অনেক মূঢ়তা রূঢ়তা ও অসাড়তা দূর করে। কেমন ক'রে করে ? ছন্দ দিয়ে। শাস্ত্রে বলেছে, শিল্প ছন্দোময় করে জীবনকে। প্রত্যেকটি কারুকর্ম ও কলার নিজের ছন্দ আছে— যে ছন্দ না হলে তার কোনোরূপ সংহতি সম্ভবপর হয় না, রূপ নিরূপিত হয় না, তার অন্তর্নিহিত আনন্দবেদনা কোনো গতিবেগই পায় না— নিজের এই ছন্দ মানবজীবনে প্রসারিত করে মানবজীবনকেও সে ধীর অলক্ষ্য গতিতে ছন্দোময় করে তোলে।

কারুদ্রব্যের প্রতি লক্ষ করলে দেখতে পাই, দুটি জিনিস মিলে তার সম্পূর্ণতা — তার গড়ন, তার মণ্ডন। গড়নের অঙ্গে অঙ্গে লীন হয়ে আছে বিশেষ বস্তুর বিশেষ স্পর্শ, আবার শিল্পবিশেষে স্থূল সূক্ষ্ম বহুবিধ টানা-পোড়েনে বহুবিচিত্র বুনোন। অর্থাৎ, দৃশ্যগুণের সঙ্গে-সঙ্গেই স্পৃশ্যগুণ, ইংরেজিতে যাকে বলি টেক্‌শ্‌চার। এটি যে হাতে ছুঁয়েই জানতে হবে এমন নয়, অনুমানে ও অনুভবেই জানা যাবে, সমঝদার ব্যক্তি চোখের দৃষ্টি দিয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে জেনে নেবেন। ছন্দ জিনিসটি আছে রূপসৃষ্টির আদি-অন্তে মধ্যে। রূপসৃষ্টির কোনো মুহূর্ত, কোনো অংশ ছন্দচ্যুত হতে পারে না, হলেই অঙ্গহীন হয় বা মারা পড়ে।

কলায় কারুকর্মে ছন্দের সঞ্চার, ছন্দের শাসন নিয়ন্ত্রণ ঠিক তেমনি, প্রাণের যেমন দেহে। কবিতা হলে বলা যেত— তার ভাষায় ছন্দ আছে; ভাবে ছন্দ আছে; আবেগ-উদ্দীপনার উদ্ভবে বিলয়ে ছন্দ আছে; আর ভাব ভাষা আবেগ অনুভূতি সব-কিছুকে একত্র ক'রে, মিলিত ক'রে, অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধে অবিচ্ছিন্ন ঐক্য দিয়ে একটি সর্বব্যাপী প্রবল ও অব্যর্থগতি ছন্দ আছে, যে জন্যে কবিতাটি কবিতা হয়েছে— অরূপ রসের আধার হতে পেরেছে।

যে-কোনো কারুসামগ্রীর গড়নের ছন্দ, সেটি বস্তুর ব্যবহারযোগ্যতার যে সীমা, দৈনন্দিন প্রয়োজনের যে ছন্দ, তাকে অতিক্রম করে না আর করা উচিতও নয়। মূল গড়নের ব্যাপারে স্বভাবের অন্ধ অনুবৃত্তি, স্বভাবের অন্তর্গত ফুল-ফল গাছপালা পশুপাখি এসবের রূপের অনুকৃতি অতিশয় বিরল। সব দেশে আর সব যুগে। প্রয়োজনকে দেউড়িতে দাঁড় করিয়ে অনাবশ্যক আড়ম্বর করতে গেলে প্রয়োজন ব্যাহত হয় আর গড়নও মারা পড়ে, সে চেষ্টা কোনো কালের কোনো উৎকৃষ্ট কারুকর্মে বড়ো-একটা করা হয় নি। স্থাপত্যশিল্পে এই প্রয়োজনের একটা অনতিক্রমণীয় দাবি আছেই, গড়নের দিক দিয়ে সে শিল্পও তাই অবচ্ছিন্ন, অর্থাৎ স্বভাবের অনন্ত রূপের কোনোটির অনুকৃতি নয়— স্তম্ভশ্রেণীতে মহীরুহগম্ভীর অরণ্যের আর শিখরে শিখরে উন্নতশীর্ষ হিমাদ্রির অনুরূপতা এত সুদূর, এত মূলতত্ত্ব-ঘেঁষা আর এমন আঙ্কিক যে তাকে অনুরূপ বলাই বৃথা। গড়নপ্রধান কারু-কর্মে (তেমনি স্থাপত্যে) স্বাভাবিক রূপের (১) অনুকৃতি, (২) প্রতিরূপ-রচনা আর (৩) রূপান্তর-সাধন[৩] সেখানেই আসতে পারে যেখানে তার মণ্ডন, তার অলংকরণ। এই মণ্ডনের ব্যাপারে চীনা ও ভারতীয় দৃষ্টিতে ও সৃষ্টিতে বিশেষ পার্থক্য আছে; সেটি আলোচনার যোগ্য।

পাঠক লক্ষ্য করবেন, উপস্থিত ক্ষেত্রে কারিগর বা শিল্পী -কর্তৃক রূপ-নিরূপণ সম্পর্কে প্রতিভার ত্রিবিধ উদ্যম উল্লিখিত হয়েছে। প্রথমতঃ, স্বভাবে যেমন রূপ আছে কারিগর বা শিল্পী শিল্পের ক্ষেত্রে তারই যথাযথ অনুকরণের চেষ্টা করতে পারেন। রেনেসাঁ-পরবর্তী ধারাবাহী পাশ্চাত্য শিল্পে এবংবিধ প্রয়াসের নিরবচ্ছিন্ন

[৩] হয়তো বলা নিষ্প্রয়োজন যে, শব্দগুলি এই প্রবন্ধে বিশেষ বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু এ কথা বলা উচিত, শিল্পরূপের বিচারে, স্বভাবের— যথাকৃতি (imitation), অনুকৃতি (representation), প্রতিকৃতি (impression) এবং রূপান্তর (creation অথবা re-creation) এরূপ ভাগ করাও চলত। উল্লিখিত আলোচনায় যথাকৃতি বা imitation (ফোটোগ্রাফের মতো) আলাদাভাবে ধরা হয় নি ব'লে তার তত্ত্ব অনুকৃতি-তত্ত্বেরই অন্তর্নিহিত হয়ে আছে এরূপ মনে করতে হবে।

নিদর্শন আছে। উত্তম কোথায় কতটা সার্থক হয়েছে সে বিচার না ক'রেও কোন্ লক্ষ্যে কোন্ পথে চলেছে সেটি নির্ধারণ করা কঠিন নয়। দ্বিতীয়তঃ, ধ্বনির যেমন প্রতিধ্বনি, রূপের তেমনি প্রতিরূপ রচনা করা সম্ভব। এ ক্ষেত্রে যথাযথ অনুকরণ হয় নি, আর সে চেষ্টাও নেই। এখানে মনের বা প্রতিভার সক্রিয়তা সমধিক। (কায়িক বা মানসিক পরিশ্রমের কথা বলছি না। সময়-বিশেষে অনুকৃতিতে অপরিসীম পরিশ্রম লাগতে পারে আর প্রতিকৃতি-রচনা অনায়াসে সিদ্ধ হওয়া অসম্ভব নয়। কুমোরে পোকার মতো মাটি জড়ো ক'রে ঘর গড়া নয়, মাকড়ষার মতো নিজের লালা দিয়ে নিজের জাল-রচনা, একেই মনের বা প্রতিভার নিজস্ব সক্রিয়তা বলা যেতে পারে।) স্বভাবে যেমনটি আছে ঠিক তেমনিটি কাগজে, কাপড়ে, ভিত্তিগাত্রে, পাথরে, কাঠে, পোড়ামাটিতে উপস্থিত ক'রে বিশেষ সুখ নেই। যে কাটা তর্মুজের ছবি দেখে গো-মহিষ পাঁচন-বাড়ি উপেক্ষা ক'রে ছুটে আসে, মনুশাবকের তার প্রতি তেমন কোনো উগ্র লোভ থাকা অসংগত। লতা পাতা ফুলের বাহার -সমেত কোনো চিত্রকরের তুলি হয়তো ফুটিয়ে তুলবে ওর আকৃতি-প্রকৃতির নিছক বিশেষত্বটুকু, ওর রঙ, ওর রূপ, ওর ভঙ্গী; হয়তো বা রক্ত পীত সবুজ সাদার কোনো প্রয়োজনই হবে না— মন্ত্রপূত কালো কাজলটুকু বুলিয়ে দেবে একই কালে কাগজে আর রসিকজনের দু চোখের কোলে কোলে। এইপ্রকার প্রতিরূপ-রচনাতেই স্বচ্ছন্দচারী চীনা তুলির বিশেষ নৈপুণ্য। এ কাজে চীনা শিল্পীর মতি ও প্রবৃত্তি স্বাভাবিক রূপ সম্পর্কে কিছু দূর পর্যন্ত স্বেচ্ছাচারী হলেও আসলে সংযত, এবং বিশেষ বস্তুরূপের বিশেষ চরিত্র ঠিকই রাখে— শিল্পী কী পর্যন্ত স্বতন্ত্র স্বাধীন ভাসা-ভাসা দেখলে সে হয়তো ধরা পড়ে না, শিল্পীর মনের মিশাল প্রচ্ছন্ন থাকে। কিন্তু ভারতীয় শিল্পপ্রতিভা এখানেও ক্ষান্ত হতে চায় না, বহুশত যুগের শতমুখী শিল্পধারায় তার সাক্ষ্য আছে। ভাবোন্মত্ত বিশ্বামিত্রের মতো সৃষ্টিক্ষুধা তার অপরিসীম; অভিনব ভুবনে নূতন নূতন পশু-পাখি ফুল-ফল দানব-মানব-দেবতার দর্শন না পেলে তার তৃপ্তি নেই— আর, বিশ্বের লোককে ডেকে এনে তা দেখাতেও হবে। এ ক্ষেত্রে স্বভাবের রূপকে অবলম্বন ক'রে, কখনো বা উপলক্ষ্য ক'রে, অন্য রূপ ফুটিয়ে তুলে অন্য রস বিতরণ করা হয়েছে। শিল্পের এই চরম ও পরম প্রয়াসে যেন মনেরই রূপ ফুটে উঠেছে; মনআলয়ে বিশ্বের রূপ লুট ক'রে আনা হয় নি— মনই বেরিয়ে গিয়ে বিশ্বের রূপে রূপে প্রবেশ করেছে; রূপের খোলষটি স্বেচ্ছামত পরিধান ক'রে, ব্যবহার ক'রে, বিশ্বরূপের নাট্যলীলায় একাই এক-শো হয়েছে। মনের সক্রিয়তা যেন তার সার্থকতার শেষ সীমা ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেছে; রূপের রূপান্তর হয়েছে। রূপস্ফুট রূপকলার উদ্দেশে ব্যর্থ ও বিভ্রান্তমতি দুশ্চেষ্টা ভারতবর্ষে হয় নি। সে হচ্ছে

আজ ইউরোপে ও আমেরিকায়, এবং দেখাদেখি প্রাচ্যেরও নানা দেশে, তথা আমাদের দেশে— কারণ কী, পরিণাম কী, সফলতা বা বিফলতা কী আছে তার সামনে, বর্তমান প্রসঙ্গে সে আলোচনা অনাবশ্যক।

সীমাবদ্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সম্বল ক'রে শিল্পচিন্তায় সাহস করা গেছে; পদে পদেই সাবধান হওয়া দরকার। রূপের রূপান্তর চীনা শিল্পে কোথাও যে হয় নি এ কথা বলতে পারব না। ভারতীয় তথা বৌদ্ধ প্রভাবের বাইরে চীনা রূপান্তরের বিশেষ ও বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত চীনা ড্র্যাগনের কল্পনায়। শিল্পশাস্ত্রীদের কাছে খোঁজ নিলে হয়তো জানা যাবে, তার মূলে আছে চীনা মহর্ষি লাওৎসের অদ্বৈতবাদ। ভারতীয় প্রভাব কিছুমাত্র আছে কিনা তাঁরাই বলতে পারবেন। কারণার্ণবশায়ী বিষ্ণুর বাহন সহস্রফণ অনন্ত নাগের এ কি চীনা অবতার? কে বলতে পারে? এই কল্পনাটি যে অতি অপরূপ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এটি ঘিরে কত যুগের কত শিল্পীর কত কৃতি, কত ভাবুকের কত ধ্যান-ধারণা, কত বিচিত্র কাহিনী! সূক্ষ্ম ও অবচ্ছিন্ন তত্ত্ব, যা চীনা ধাতে বড়ো একটা সহ্য হয় না, বিমূর্ত ভাবনা— এ ক্ষেত্রে মহাচীনবাসীর বিশাল গভীর অখণ্ড প্রকৃতিপ্রীতিতে অঙ্গীকৃত হয়েছে; অর্থাৎ, প্রকৃতিপ্রীতি ও প্রকৃতি-অতীত (প্রকৃতিব্যতীত নয়) তত্ত্বদৃষ্টি একপ্রকার ঐক্য লাভ করেছে। ভারতীয় শিল্পক্ষেত্রে রূপের যে রূপান্তর, যে রূপান্তর প্রায় সর্বত্র, যার চরম সীমা বুদ্ধমূর্তিতে বা নটরাজে, রীতিপ্রকৃতির দিক দিয়ে উল্লিখিত খাঁটি চীনা রূপান্তর থেকে তার কী বৈশিষ্ট্য সে আলোচনা সহজসাধ্য নয়। হয়তো এইটুকুই বলা চলে, প্রকৃতিকে আংশিক ঠিক রেখেও অতিপ্রকৃতির অঙ্গীকরণ ভারতীয় প্রতিভার লক্ষ্য ছিল না— অর্থাৎ, রূপের রূপান্তর ভারতীয় শিল্পে যতটা সর্বাঙ্গীণ, চীনা শিল্পে ততটা নয়। এ কথা বললে ভুল হবে কি?— প্রকৃতি ও অতিপ্রকৃতি সে ক্ষেত্রে তিলতণ্ডুলের ন্যায় মিশে থাকতে পারে, ক্ষীর-নীরবৎ নয়। ক্ষীরনীরের মিশ্রণ ধরা কঠিন। তিলতণ্ডুলের মিশ্রণ ঘটা ক'রে আপনাকে জানায়।

চৈনিক প্রতিভা, ভারতীয় প্রতিভা, যে বিভিন্ন রূপালংকারে আপন আপন কারুকর্মকে মণ্ডিত করেছে সেটির বিশেষ আলোচনাই আমাদের বিশেষ লক্ষ্য। কারুকর্মমাত্রের গড়নটুকু মন-গড়া, অবচ্ছিন্ন, অ্যাব্‌স্ট্রাক্ট, এ কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। এই গড়নের কল্পনায় জীবনযাত্রার বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনকে ডিঙিয়ে বা প্রয়োজনপূরণে কোনোরূপ ব্যাঘাত সৃষ্টি ক'রে, স্বভাবসুলভ রূপের অনুকৃতি অনাবশ্যক ও অবাঞ্ছিত। কিন্তু, মণ্ডন সম্পর্কে সে কথা বলা যায় না। চীনা ঘটে পটে পর্দায় কাপড়ে কার্পেটে যে রূপালংকার প্রযুক্ত হয়েছে তা স্বভাবের রূপের প্রতিরূপ, অর্থাৎ স্বভাব-ঘেঁষা, বস্তু-ঘেঁষা। বাঁশের কাজে, আঁশের কাজে, বুনোনের

বৈচিত্র্য ছাড়া অন্য কোনো মণ্ডনের সুবিধা যেখানে নেই, সেখানে অবশ্যই আঁকাবাঁকা জ্যামিতিক নক্সা দিয়ে অলংকরণ হয়েছে। আর, এ ভাবের জ্যামিতিক নক্সা বা অলংকার ঘটে পটেও অনেক সময় আছে। মনের দিক্‌সূচী এ ধারে বাস্তব রূপে আকৃষ্ট হলে অন্য ধারে বস্তুবর্জিত 'জ্যামিতি'র সম্মুখীন হওয়া মোটেই আশ্চর্য নয়; সে হল রূপের বিপরীত কোটি, সেখানে রূপান্তর-সাধনের কোনো কথাই ওঠে না। চীনা রূপালংকার-প্রয়োগের ক্ষেত্রে তরু-লতা, ফুল-পাখি, শৈল-সরিৎ, কুটীরে প্রাসাদে মন্দিরে নরনারীর জীবনযাত্রা, এমন কতকিছু ছবি ফুটে উঠেছে। লতাটি যেন লতিয়ে উঠেছে ঘটের গায়ে, প্রসারিত অঞ্চলে ফুল ফেলে গেছে মানসমরাল, পাখি উড়ে এসে বসেছে পিরিচে পেয়ালায়। শিল্পবস্তুকে মণ্ডিত ক'রে, মনোহর ক'রে, স্বভাবের বস্তু শোভা পেয়েছে— অথচ সে বস্তুর কোনো ভার নেই। ভার নেই, এ বিস্ময় কী ক'রে সম্ভব হল? এ রহস্যের নিরাকরণ হয় একবার শিল্পীর মনের গহনে আর একবার শিল্পীর হাতের কাজের দিকে ভালো করে চেয়ে দেখলে। চীনা শিল্পীর সৃষ্টির উৎস হল বস্তুপ্রীতি, বস্তুর স্মৃতি, চোখের-সমুখে-হাজির-হওয়া বস্তু নয়। স্মৃতি তো স্বভাবের মুকুর নয়; বস্তুর ছাপ সে রাখে, বস্তু রাখে না— সে অনুচিত আগ্রহ তার নেই। এই হল চীনা শিল্পীর মানসপ্রক্রিয়া। এরই দ্বারা নিরূপিত নিয়ন্ত্রিত যে ক্রিয়াটি তার পানে চেয়ে দেখতে পাই, দুই আয়তনের ক্ষেত্রে দুই আয়তনের রূপই রচনা করা হয়েছে; সেখানে দৈর্ঘ্য প্রস্থ আছে, কিন্তু বেধ বা উচ্চতা-গভীরতা নেই। এ ক্ষেত্রে চীনা ভূদৃশ্যের কথা টেনে আনলে বলা যেত, সে ছবিতেও উক্ত গভীরতা নেই; তবু দূরত্ব আছে, দূরত্বের কোনো সীমা-পরিসীমা নেই— কারণ, প্রান্তর-কান্তার নদীগিরি পশুমানুষকে ক্রমগভীর তৃতীয় আয়তনে না সাজিয়েও ক্রমোর্ধ্ব এক সারের উপর আর-এক সার সাজিয়ে এক বিঘত কাগজে, কাপড়ে, এক শত ক্রোশের বিস্তার দেখাবার অপূর্ব কৌশল চীনা শিল্পীর তূলিকাগ্রে বর্তমান— পটের সমতলতার কোনো অমর্যাদা কোথাও নেই— আর, এও তো বলতে হয়, ক্রমগভীর বিন্যাসে বিশ্বের কতটুকুই বা দেখানো যায়? দেখতে দেখতে সমুখের জিনিস পিছনের জিনিসকে আড়াল ক'রে দাঁড়ায় এবং স্থূল দৃষ্টিশক্তির অনতিদূর সীমায় দিগন্তের পর্দাও নেমে পড়ে। দিগ্‌যবনিকা যেন ইচ্ছামাত্রেই গুটিয়ে তুলে রাখে শিল্পী, চীন এবং চীনের শিল্পশিষ্য জাপানের এই এক বিস্ময়কর কৃতিত্ব। বিশাল দিক্-দেশ জরিপ করার প্রয়োজনে মানচিত্র অন্য দেশে আর অন্য যুগেও রচিত হয়েছে; কিন্তু তার এমন বিচিত্র পরিণাম, যা চীনা ভূচিত্রে হয়েছে, তা অন্য কোনো দেশে কোনো কালে হয় নি। কারণ, শিল্পীর রূপরসমগ্ন মনের সজাগ রূপস্মৃতি এভাবে শিল্পীর হাতের তূলি কেড়ে নিয়ে ছবিও আঁকে নি আর-কোনো দেশে।

চীনা শিল্পীর রচিত দুই আয়তনের প্রতিরূপকে রূপের 'ছায়া' বলা চলে। বস্তুতঃ বেণুপল্লবের ছায়া পড়েছে প্রসারিত যবনিকায়, সেটি পর্যবেক্ষণ ক'রে, অনুকরণ ক'রে, বেণুবনের শাখা ও পাতার ভাবভঙ্গী আয়ত্ত করার প্রথা চীনে-জাপানে ছিল বা আছে শুনতে পাই। ছায়ার ভার থাকে না, ছায়ায় মূলবস্তুর উচ্চতা গভীরতা থাকে না— চীনা রূপালংকারেও নেই। ভারী গ্রন্থের পাতার ফাঁকে ফাঁকে পত্র পুষ্প রেখে দেওয়ার রীতি দেখা যায়; তারই ফলে, ফুল বা পাতা যথাসম্ভব চেপ্টে গিয়ে একটি সহজ-সরল পরিচ্ছিন্ন রূপচ্ছবি প্রকাশ করে; ফুল-পাতার ছায়া থেকে তার এইটুকুই বিশেষ যে, এই রূপ পুরোপুরি মসীলেখা নয়— ফুলের, পাতার স্বাভাবিক বর্ণের কিছু কিছু অবশেষও থাকে। চীনা প্রতিরূপ এই চাপ দিয়ে চ্যাপ্টা করা রূপের সদৃশ বললেও ভুল বলা হবে না। রঙ বা কালী -ভরা তূলির ছাপ-ছোপ দিয়ে এই অভিনব রূপের সৃষ্টি। স্বভাবে রূপের ধারে ধারে কোনোরূপ রেখাঙ্কন দেখা যায় না; একটি রূপকে ঘিরে থাকে অন্য এক বা একাধিক রূপ, একটি রঙ অন্য রঙের আনুকূল্যে বা প্রতিকূলতায় আপনাকে নয়নগোচর করে। আর, রূপের গড়ন বা গড়নের বলন আলোয়-ছায়ায় উজ্জ্বলতায়-অনুজ্জ্বলতায় বারে বারে 'মুখ' ফিরিয়ে আপনার সবটুকু নতোন্নত ভাব ব্যক্ত করে। মোট কথা, বস্তুর রূপ বা গড়ন বা রঙ বোঝাতে কোনো রেখার ঘের থাকে না স্বভাবে। চীনা রূপকল্পনাতেও প্রায়শঃই রেখার ঘের নেই; অথবা ছাড়া-ছাড়া ছেঁড়া-ছেঁড়া ভাবে তার প্রয়োগ থাকলেও সে যেন তূলিচালনার বিচিত্র বাহার দেখানো মাত্র— রূপ রেখানির্ভর নয়।

সাম্প্রতিক শিল্পপ্রদর্শনী দেখার যে সমুজ্জ্বল স্মৃতি রয়েছে মনের মধ্যে তারই প্রেরণায় উপরের শেষ মন্তব্যটুকু লেখা। লিখেই খেয়াল হল, এপ্রকার উক্তিতে চীনের ধারাবাহী চিত্রকলা সম্পর্কে অনেকটা ভ্রান্ত ধারণা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কোনো জাতির শিল্পসৃষ্টিতে একটিমাত্র ধারা বয়ে চলে এমন নয়; জাতিতে জাতিতে আদান-প্রদান, এক সংস্কৃতির উপর অন্য সংস্কৃতির প্রভাব-বিস্তার, এক শিল্পরীতির দ্বারা অন্য শিল্পরীতির আত্মীকরণ —এগুলিও বিশেষ বিরল ঘটনা নয়। চীনের প্রতিরূপ-সৃজন-তৎপর যে-একটি প্রবল ও প্রধান চিত্ররীতি ভূচিত্রে, মনুষ্যেতর-রূপ-কল্পনায়, পর্দায় পাখায়, বিচিত্র কারুদ্রব্যে আবহমান কাল ধ'রে আপন পরিচয় বহন ক'রে এনেছে, তাতে স্বাভাবিক রূপকে একান্তভাবে অতিক্রম করার চেষ্টা, রূপকে রেখায় পর্যবসিত করার আগ্রহ, স্বভাবের গদ্যছন্দের পরিবর্তে রূপকলার নিজস্ব একটি পদ্যছন্দ প্রবর্তনের সার্থকতা বিশেষ দেখা যায় না। কিন্তু সুদূর অতীতে, খৃস্টপূর্ব সময়ে, যখনই বৌদ্ধধর্ম চীনে গিয়েছে সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিয়েছে একটি অ-পূর্ব রূপরীতি। তখনই চীনা শিল্পে

মানুষের রূপ মুখ্য বিষয় হয়ে উঠেছে; সে রূপে অতি-মানুষ মহিমার প্রকাশ মৈত্রীতে করুণায়, প্রেমে পূজায়, মারবিধ্বংসী বীর্যে, সমতায় —তাও দেখা গেছে। দেখা দিয়েছে সাবলীল রেখার ছন্দ, রেখার সৌন্দর্য— লেখাঙ্কনের সদৃশ হলেও, ছাড়া-ছাড়া ছেঁড়া-ছেঁড়া নয়। ফলতঃ সেই সুদূর কাল থেকে পাশাপাশি দুই রীতি নির্বিবাদে বয়ে চলেছে; এক রীতির আংশিক প্রতিফলন অন্য রীতিতে তাও অবিরল। কিন্তু, চীনের বিশিষ্ট শিল্প-অবদান, চীনের ভূচিত্র, সেখানে বিষয় হিসাবে মানুষের কোনো প্রাধান্য নেই, অঙ্কনকৌশল হিসাবে রেখার তেমন কোনো প্রয়োজন হয় নি, স্বভাবের রূপস্মৃতি অম্লান সজীব ও সতেজ। আর, অধিকাংশ কারুদ্রব্যের মণ্ডনে চীনা কারিগর চীনা শিল্পীর ঐ দৃষ্টিতেই রূপ দেখেছেন, ঐভাবেই প্রতিরূপ সৃষ্টি করেছেন; জ্যামিতিক অলংকরণ অবশ্যক না হয়ে থাকলে রেখার ব্যবহার ও সর্বাঙ্গীণ ছন্দের প্রয়োগ বিরল ঘটনা বলা চলে।

বিশেষভাবে যা চীনা, বিশেষভাবে যা ভারতীয়, এরূপ দুটি কারুদ্রব্য পাশাপাশি রেখে বলতে হয়, চীনা আর ভারতীয় দুই বিপরীত মেরুতে বাস করছেন, বিভিন্ন দৃষ্টিতে রূপকে দেখছেন, তাঁদের রূপকল্পনায় মিল যতটা আছে অমিল তার চেয়ে বেশি বৈ কম নয়। শিল্পসৃষ্টির আশ্রয় ও আধার সম্পর্কে উভয় শিল্পীরই যার-পর-নেই শ্রদ্ধা আছে; তাই চীনা হোক, ভারতীয় হোক, ঘটে বা পটে, দুই আয়তনের সমতল ক্ষেত্রে তিন আয়তনের বিভ্রম-উৎপাদনের চেষ্টা করা হয় নি। কিন্তু, চীনা শিল্পীর থেকে ভারতীয় শিল্পীর প্রভেদ এই যে, আবছায়া স্মৃতির নেপথ্য থেকে তিনি কায়ার ছায়া ডেকে এনেই সন্তুষ্ট হন না। ফলতঃ, ভারতীয় শিল্পী যে স্মৃতির সাহায্যে রূপসৃষ্টি করেন সে হয়তো দূরতর স্মৃতি এবং তার সঙ্গে হয়তো ব্যক্তির ও জাতির ধ্যান মিশ্রিত। অনেক সময় প্রত্যক্ষ দর্শন থেকে নয়, ভাবনা কল্পনা ধ্যান মিশ্রিত ক'রেও নয়— নিছক চিন্তা থেকে, কল্পনা থেকে, ধ্যান থেকে, ভারতীয় শিল্পরূপ, অর্থাৎ স্বাভাবিক রূপের রূপান্তর, উৎসৃষ্ট হয় এমনও বলা যায় না কি?

বহু প্রাগৈতিহাসিক গুহাচিত্রে অভ্রান্ত এবং অব্যবহিত রূপস্মৃতির সাক্ষ্য আছে বলা যায়— হয়তো যে বন্য বাইশনের রূপ আঁকছিল চিত্রকর তারই রোষগর্জন অন্তঃশ্রুতিপথে তখনো ধ্বনিত; হাতে ছিল যথালব্ধ বর্ণবর্তী, শরীরে ছিল ভয়রোমাঞ্চ তখনো। অপর পক্ষে প্রাচীন মিশরীয় চিত্রকরের ছিল ধীর স্থির রূপচিন্তা। স্মৃতি ছিল না এ কথা তো কোনো ক্ষেত্রেই ওঠে না; তবে, চিন্তারই ছিল নেতৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ।[৪] রূপস্মৃতির আশ্রয়ে বা পটভূমিকায় তেমনি রূপচিন্তা,

[৪] রোজার ফ্রাই'এর রচনায় এ বিষয়ের নিপুণ আলোচনা দেখেছি।

রূপকল্পনা, রূপের নিবিড় গভীর ধ্যান ও স্বরূপের সন্ধান ভারতীয় প্রতিভার পরম বৈশিষ্ট্য। এই রূপসাধনার সিদ্ধিও বড়ো অপূর্ব। কারণ, স্মৃতি-উজ্জীবিত রূপ, কায়া নয়, ছায়া ; পিণ্ড নয়, ছবি ; তার ভার নেই। ভাবনা-কল্পনা-সম্ভূত রূপরাজি এক অপার্থিব ভাবে মুক্ত, স্বাধীন, পরস্পর-মিলিত-মিশ্রিত, গতিমান্। আর, ধ্যানের রূপ সর্বৈব ছন্দে নিয়ন্ত্রিত, ছন্দোময়। ভারতীয় কারুকার্যে ও কলায় মানবমনের স্মৃতি থেকে ধ্যান পর্যন্ত সকল শক্তিরই ক্রিয়া দেখা যায়, কখনো কম কখনো বেশি, এবং মোটের উপর এই সৃষ্টিকে মনোময় ছন্দোময় বলা চলে— এ ক্ষেত্রে নানাভাবে কেবলই রূপের রূপান্তর হতে দেখা যায় রেখার আশ্রয়ে।

ছন্দ না হলে কোনোপ্রকার রূপসৃষ্টি, শিল্প বা কারু -সৃষ্টি হয় না, এ কথা ঠিক। তবু, ছন্দের তর-তম আছে। যেমন মানুষের মুখের ভাষাতেও ছন্দ আছে। সেই ভাষা থেকেই যখন সাহিত্য অভিধানের উপযুক্ত গদ্য রচিত হয় তখন শব্দ ও শব্দগোষ্ঠি -বিন্যাসের বিশেষত্বে স্ফুটতর ছন্দ শ্রুতিগোচর হয়ে থাকে। গদ্যবিশেষে, বেদে বা বাইবেলে, কাদম্বরীকাব্যে, হুইট্‌ম্যানের রচনায় বা ইংরেজি গীতাঞ্জলিতে, লিপিকায় ও পুনশ্চে, সেই ফল্গু ছন্দঃস্পন্দকে আরও পরিস্ফুট, আরও স্পষ্টভাবে কলধ্বনিত করে তোলা হয়েছে —এ কথা আজ সর্বস্বীকৃত। কিন্তু, পদ্য বা কবিতা যাকে বলা হয় সেই-জাতীয় রচনাতেই ছন্দের সর্বাঙ্গীণ অধিকার ও স্ফূর্তি। এই স্তরে উন্নীত হয়েই মানুষের মুখের ভাষা দেবভোগ্য, দেবতার যোগ্য হয়ে উঠেছে। চলায় আর নৃত্যে যে যোগ, যে প্রভেদ। এই কবিতার এক-এক প্রকার ছন্দে প্রতি পদে কতগুলি মাত্রা জোট বাঁধবে, কোথায় কী প্রকার তাল পড়বে, পদক্ষেপের ভঙ্গী কিভাবে পুনঃ পুনঃ আবর্তিত হবে অথচ এগিয়ে যাবে— তার স্থূল সূক্ষ্ম অতি-সূক্ষ্ম বহুবিধ হিসাব আছে। 'হিসাব' আছে কবি ও রসিকের রাগরোমাঞ্চিত শ্রবণে, মনে, উপলব্ধিতে— যে হিসাবের যৎকিঞ্চিৎ ধরা পড়তে পারে সুদক্ষ ছন্দঃশাস্ত্রীর বিচারবিশ্লেষণে, সবটা কখনোই নয়। তা হোক, খানিকটা বুদ্ধি দিয়ে বুঝলে বাকিটা বোধ দিয়ে বোঝবার সূচনা বা সুরাহা হতে পারে। মুখের কথার সঙ্গে কবিতার এই কথনকৌশল তুলনা করলে দুটির একই জাতি, একই প্রকৃতি, এ কখনোই বলা চলে না।—

শারদ চন্দ, পবন মন্দ,
বিপিনে ভরল কুসুমগন্ধ

এই উক্তিতে বাতাসটি মিষ্টি, চন্দ্রমা মেঘমুক্ত, ফুলগন্ধে উদ্যানবাটিকা ভরপুর, এ খবরের অতিরিক্ত, সকলপ্রকার ব্যাখ্যার অতীত, অন্য কী যেন খবর আছে যাতে ভাববিহ্বল হয়ে পড়ে রসিক ; জেগে ওঠে আর-এক জগতে এবং জানতে পারে

এ জগৎ, এ জীবন, ঐ যার ভাঙাচোরা প্রতিফলন, অস্পষ্ট আব্ছায়া ছবি, তাকে ভালো ক'রে দেখবার উপায় কেবল এই কবিতা— এর ভাষায়, বিশেষতঃ এর ছন্দে আছে অচিন্ত্য মন্ত্রশক্তি ; সে যেন মানুষের হয়েও মানুষের নয়, দেবতারই। মানুষের সাধ্যের শেষ সীমায় ছন্দের এই আশ্চর্য অনন্যতা ও সৃষ্টিশক্তি, অঘটনঘটনপটু মায়া, কেবল যে কবিতাতেই আছে তা নয় ; আছে অন্য সকল-প্রকার কলাকৃতিতে। ছন্দের ক্রমপ্রকাশ, ক্রমপরিণতি আছে রূপকলায়। ছন্দের কোন্ রূপটি আগে কোন্‌টি পরে সে আলোচনায় আমরা প্রবেশ করব না। কিন্তু, কোন্‌টি কোন্ স্তরে, কোন্‌টিতে কিভাবে রূপ ধরা পড়ে, স্বরূপ ফুটে ওঠে, রূপাতীতকেও ধারণা করতে পারে মন এবং তাকেই দেখতে পায় চক্ষুর অন্তরালে থেকে আর-এক চক্ষু —এ আলোচনাই যথেষ্ট। এ আলোচনাও সহজসাধ্য নয়।

বিশিষ্ট ভারতীয় পদ্ধতির কলায় কারুশিল্পে মণ্ডনে রূপক্ষেপের যে ছন্দ সেটি গদ্যের আত্মবিস্মৃত ছন্দ তো নয়ই, বৃত্তগন্ধি গদ্যের অর্ধজাগ্রত ঈষন্মূর্ছিত ছন্দও নয়— কবিতার ছন্দের মতোই সজাগ, সচেতন, প্রায় সর্বগ্রাসী ও স্বপ্রকাশ। অর্থাৎ, বিশেষভাবে যা ভারতীয় সেরূপ মূর্তিতে চিত্রে মণ্ডনে ছন্দ ফুটিয়ে তুলতে, সম্পূর্ণতঃ ছন্দের শরণ নিতে, ছন্দে আত্মবিসর্জন করতে, ভারতীয় কলাকারের বিন্দুমাত্র লজ্জা ভয় সংকোচ দেখা যায় না। ফলে রূপকলার ঐরূপ সর্বাঙ্গীণ সর্বশক্তিমান ছন্দ প্রাকৃতিক রূপকে নিয়ে আপনার মনোমত লীলায় যথেচ্ছ প্রয়োগ করেছে— সাদৃশ্য থেকে কতদূরে কী চলে গেছে কে তার হিসাব রাখে। এমন-কি, 'সাদৃশ্য' কথারই মৌল অর্থ বদলে গিয়েছে। তাই, ভারতীয় শিল্পে 'সাদৃশ্য' বলতে বুঝি পদ্মপলাশের মতো লোচন, গোমুখের মতো শরীর, বাঁধুলিপুষ্পের মতো অধর, কদলীকাণ্ডের মতো ঊরু, চম্পককলির সদৃশ অঙ্গুলি। ভারত-বহির্ভূত কোনো জাতি একে সাদৃশ্য ব'লেই মানবে না। (অন্য কোনো কোনো দেশের প্রাচীন শিল্পে এই সাদৃশ্যের কথঞ্চিৎ প্রয়োগ থাকলেও, আজ বিস্মৃত।) অর্থাৎ, ভাব ও কল্পনার বৈচিত্র্য-অনুসারে ভারতীয় শিল্পী বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অন্তর-বাহির থেকে তিল তিল রূপ ও লাবণ্য আহরণ ক'রে শিল্পের তিলোত্তমা রচনা করতে চেয়েছে। তবে, জুড়ে জুড়ে নয়, তা হলে একেবারেই নিষ্ফল ও হাস্যকর হ'ত এই প্রয়াস। নিরাকার ও গতিশীল ছন্দের আকর্ষণে, ছন্দের প্রবাহে, বিশ্বের কোথা থেকে কী আকার অনায়াসে এসে পড়েছে এবং অখণ্ড ঐক্য পেয়েছে। ছন্দ তো গতিও বটে— নিয়ত গতি, অব্যর্থ গতি। যেমন, যা চলে ফিরে বেড়াচ্ছে তার ধারাবাহিক আলোকচিত্র নিলে পাই অজস্র স্থিরচ্ছবি। সেই স্থির প্রতিমাগুলি পাশাপাশি রেখে বা মনে মনে জুড়ে গতিশীল জীবনের ঠিক-ঠিক অভিজ্ঞতা বা তজ্জনিত আনন্দশিহরণ কখনোই হতে পারে না। কিন্তু, ঐ প্রতিমারাজিকেই দ্রুতগতির দ্বারা

জন্মাষ্টমী

প্রাচীন চিত্র

শ্রীক্ষেত্রের পট : অংশ

শ্রীক্ষেত্রের পট

জগন্নাথ বলরাম ও সুভদ্রা
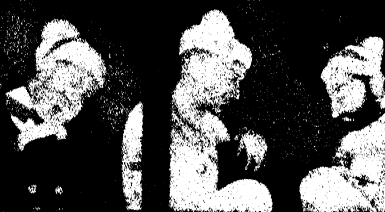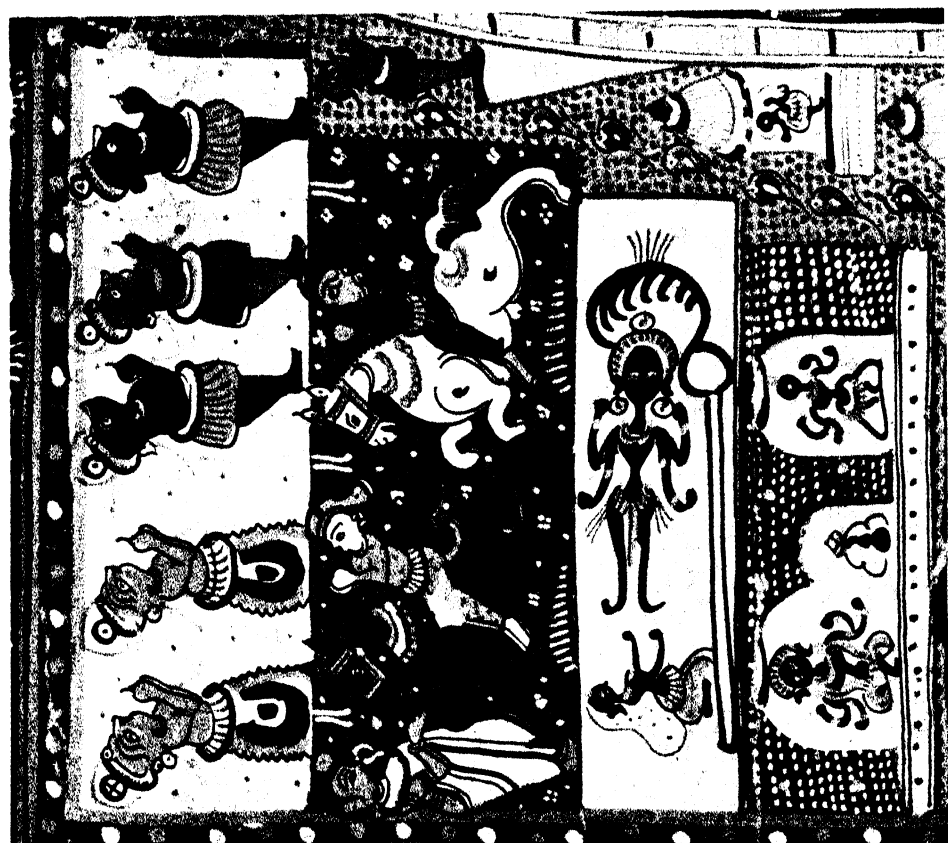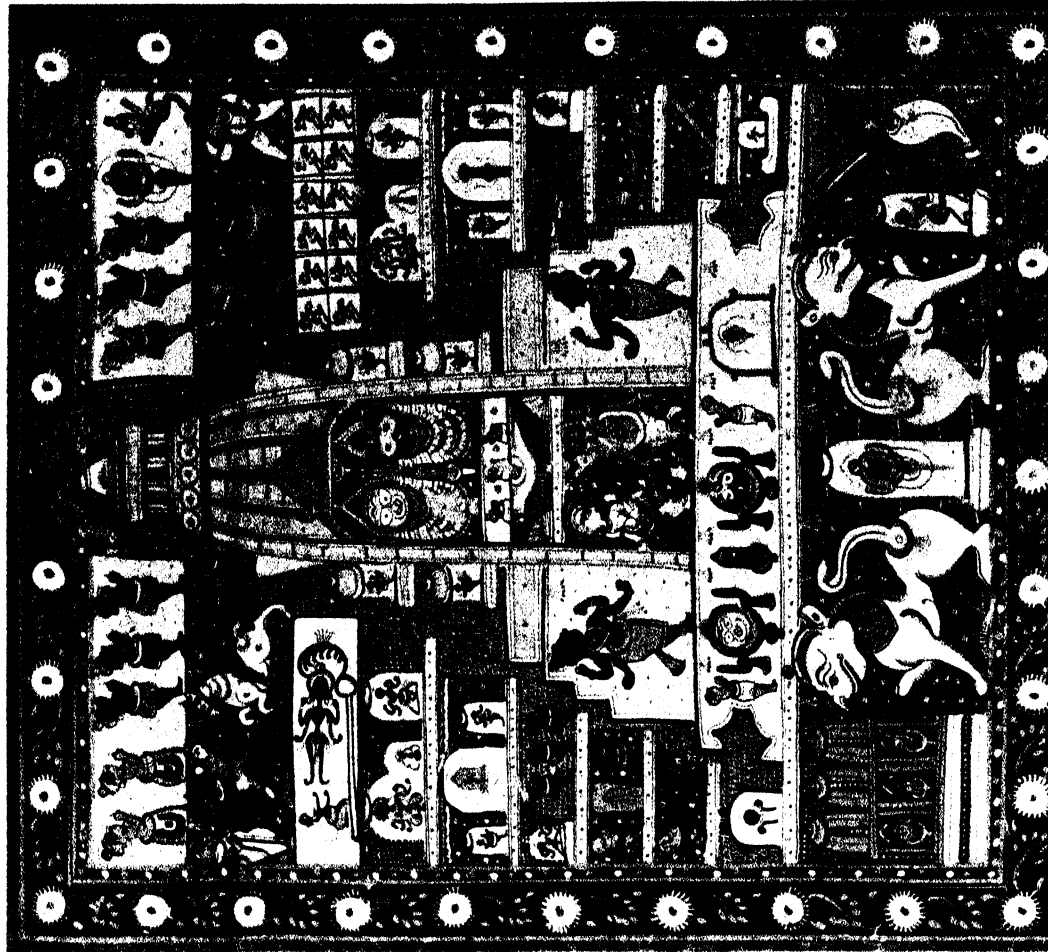
আবার যখন মিলিয়ে মিশিয়ে নিয়ে যান্ত্রিক কৌশলে উদ্ভাসিত পটের উপর প্রক্ষেপ করা হয়, আবার তো চলিষ্ণু সজীব জীবনের প্রত্যক্ষতা পাই। ভারতীয় রূপকলার প্রবল ও প্রাণবান্ ছন্দ অনুরূপ একটি গতি, সেই গতির বেগে বিশ্বসংসারের দশ দিক থেকে অভীষ্ট রূপ রেখা ভঙ্গী আকৃষ্ট হয়ে, মিলিত হয়ে, নূতন রূপ— নূতন জীবন— জীবনের নূতন তাৎপর্য ও শিহরণ আমাদের প্রতীতিতে সৃষ্টি করে। তিলোত্তমা প্রাণহীন কখনোই হয় না; গতিময়ী, নৃত্যময়ী হয়ে ওঠে। এই 'সাদৃশ্য' বা 'উপমা'র দরুন একটি রূপ অন্য অসংখ্য রূপের আত্মীয় হয়ে ওঠে, বাস্তব জগৎ থেকে মুক্ত হয়ে উর্ধ্বগতি পায় অন্য কোনো জগতে, এবং চেনা রূপ নানা ভাবে অচেনা হয়ে ওঠে, তাকে চেনা যায় শুধু মনোময়ী প্রতিমার সঙ্গে মিলিয়ে— অর্থাৎ, রূপকে ভাবের সঙ্গে মিলিয়ে, প্রকৃতিকে লগ্ন বা লীন ক'রে অতিপ্রকৃতিতে। পুনরায় বলি, অব্যর্থগতিশীল ছন্দ না হলে, ছন্দের প্রভুত্ব ও স্বাধীনতা না থাকলে, এ অঘটন ঘটতে পারত না।

জুড়ে দেওয়া আর মিলিয়ে দেওয়ায় কী প্রভেদ তার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত আছে। পাশ্চাত্য, এমন-কি, পারসিক চিত্রকলাতেও দেখি দেবদূতের কল্পনা মনুষ্যশরীরের দুই কাঁধে ছোটো বা বড়ো দুখানি ডানা যোগ ক'রে। প্রায়শঃই জোড়ের দাগ যেন ধরা পড়ে। পাখির যে ভাবে পাখা উদ্‌গত হয়, এই পরী বা দেবদূতদের তেমন যে হয়েছে মনে করা কঠিন— মাধ্যাকর্ষণবশীভূত মনুষ্যদেহ আর বিহঙ্গের ডানা, বেমিল বস্তুদুটি নিয়ে বড়ো মুশকিলই বেধেছে, ভিতরে বাহিরে ছন্দ মেলে নি। কখনও দেখা যায়, ডানা তো আছেই, পরিধেয় বসনের পরিস্ফীত পাল-ভরেও গুরুভার দেহ আকাশে টিকে আছে। অথচ অজন্তার ছবিতে, এ দেশের অজস্র উৎকীর্ণ অর্ধমূর্তিতে, অন্তরীক্ষচারী বহু দেবদেবী অথবা অপ্সরোদম্পতি দেখা যায়; সেখানে মানুষ আর পাখির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জোড়া দেওয়ার কোনো প্রয়োজন হয় নি; পাখির ডানা চুরি করে নি তারা, তার গতিসুষমা নিয়েছে— অথবা পাখির নয়, পাখি যার আশ্রয়ে উর্ধ্বে ভাসে সেই বাতাসেরই গতি-প্রকৃতি নিয়েছে আত্মসাৎ ক'রে— তাই পার্থিব ভারাকর্ষণের স্থূল নিয়ম একটা আছে এ কথা মনে পড়ে না। একে কি অভিনব সৃষ্টি বলব না? আর, এ সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে স্বপ্রকাশ ছন্দের প্রভুতায়, প্রবলতায়; নইলে মানুষ, পাখি, বাতাস, এদের বিভিন্ন গতি ও প্রকৃতিকে এক দেহে মিলিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা আর কার ছিল? কিন্তু এই মিল সম্পূর্ণ ব'লেই, আর এই রূপান্তর সর্বাঙ্গীণ ব'লেই, এর বাহ্যিক আড়ম্বর কিছুই নেই, এই অ-পূর্বের অপূর্বতাটি চোখের দেখাকে সহজেই এড়িয়ে যায়— এর চেয়ে বিজ্‌দাদ বা বতিচেল্লির দেবদূত বহু গুণে অভিনব মনে হতে পারে। বস্তুতঃ তা নয়। ঠিক এমনি অনায়াসে বহুনেত্র, বহুমুখ, বহুবাহু দেবদেবীর সৃষ্টি হয়েছে

হিন্দুর শিল্পরূপলোকে। সংস্কারবিরুদ্ধ ব'লে বিদেশীর চোখে প্রথমেই তা অদ্ভুত ও অবিশ্বাস্য লাগতে পারে, কিন্তু ভারতীয় মন তাকে যে এত সহজেই গ্রহণ করে সে কি শুধু আবাল্য দেখা-শোনার অভ্যাসে ও সংস্কারে? তা নয়। এ-সকল ক্ষেত্রেও যা মেলবার নয় তা মিলেছে প্রবল ছন্দের অন্তর্গত হয়ে। গণেশের কল্পনায় কী অনায়াসে মিলে গেছে (কাহিনী যেমনই থাক্, জোড়া লেগেছে বলা চলবে না) মনুষ্যদেহ আর গজতুণ্ড। রূপদৃষ্টি আছে এমন কেউ বলতে পারবে না, সৃষ্টিছাড়া এই রূপ আমাদের ষোলো-আনা প্রত্যয়ের সীমায় আসে নি। এ জগতে না হোক, জগদতীত কৈলাসে হরগৌরীর কোল ঘেঁষে ইনি বিরাজ করেন না, এ ধারে ও ধারে শুঁড় দোলাতে দোলাতে কৌতুকচ্ছুরিত ছোটো ছোটো ছুটি চোখে প্রসাদও বিতরণ করেন না—এ তো কিছুতেই বলতে পারব না। বস্তুতঃ, এই গণেশই হিন্দুজীবনের সকল ক্ষেত্রে যেমন, রূপসৃষ্টির ক্ষেত্রেও তেমনি সর্বতোভাবে আমাদের সিদ্ধিদাতা। ভারতীয় কলাকৈবল্যের, রূপ থেকে রূপান্তরের, স্বয়ম্ভূ মূর্তিরূপেই ইনি আমাদের নয়ন মনের অগ্রে নিয়ত বিরাজ করুন।

ছন্দের নির্বিচল* রূপ যদি পাই সুখাসীন, আত্মমগ্ন, মৈত্রী-করুণা-পূর্ণ বুদ্ধ-মূর্তিতে, ছন্দের বিশ্বতোমুখ প্রকাশ দেখতে পাই নটরাজের কল্পনায়— সে যেন বিশ্বপ্রাণ সূর্য-কর্তৃক বিশ্বের দশ দিকে কিরণ-বিকিরণ! এই নটরাজ মূর্তির অপরূপ গঠনছন্দের স্তুতিতে ফরাসী মূর্তিকার রোদ্যাঁও যখন উচ্ছ্বসিত, এবং অকৃত্রিম উপলব্ধি ও উচ্ছ্বাস সত্ত্বেও ভাষায় কতটা ব্যাখ্যা করতে পেরেছেন জানি নে, আমাদের তখন বাক্‌সংযমই শোভন ও সংগত। ভারতশিল্পে ছন্দসৃষ্টির বিভিন্ন উৎকর্ষসীমা হিসাবে উল্লিখিত রূপরাজি আমাদের মননের ও ধ্যানের বিষয়, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের বিষয় অল্পই। এ-সকল ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক রূপের রূপান্তর হয়েছে বা অতিপ্রাকৃত রূপের অপ্রত্যাশিত আবির্ভাব হয়েছে ছন্দে— প্রবল প্রচুর ও সর্বাঙ্গীণ ছন্দে— এটুকুই কেবল বলা যায়। এও বলতে হবে, ভারতীয় রূপকল্পনার বা ধ্যানের এই মূলপ্রকৃতি ভারতীয় কলায় কারুকর্মে, সর্বত্র ও সকল যুগে, ভারুত-সাঁচি অজন্তা-ইলোরা থেকে অবনীন্দ্রনাথ-নন্দলাল পর্যন্ত, অল্প বা অধিক পরিমাণে সততই বর্তমান।

* অনেক ভাবই ভাষার অনায়ত্ত; ইঙ্গিতে বা হেঁয়ালির ছলে বলতে হয়। যে ছন্দ গতিস্বরূপ তার নির্বিচলতা কেমন? 'স্থির' সুদর্শনচক্র, ঘূর্ণগতিশীল কি না বলা যায় না। ধ্যানী বুদ্ধের যে ছাঁদ তাতে এইপ্রকার স্থিরত্বই আছে ছন্দের বা গতির। অথবা স্পন্দমান ধাবমান নিখিল আবর্তনের শান্ত সমাহিত কেন্দ্রবিন্দুও বলা যেতে পারে। আচার্য নন্দলাল বলেন: বুদ্ধমূর্তিতে সমস্ত গতিটি নিয়ত শান্তিতেই বিধৃত।

ছন্দের প্রবাহেই গা ঢেলে দেওয়াতে, জ্ঞানে বা অজ্ঞানে, শিল্পরূপের কতকগুলি গুণও ফুটে উঠেছে এই শিল্পরীতিতে। চারুশিল্পের সুবিশাল ক্ষেত্রে দিশেহারা হতে না যদি চাই, কারুশিল্পের অপেক্ষাকৃত সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে ফিরে এসে সে আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাক। ইতিমধ্যে স্বর্গে মর্তে, দূরে দূরান্তরে, ঢুঁড়ে আসাতেও হয়তো কিছু লোকশান হল না।— সুপরিস্ফুট ছন্দ থাকার দরুন কারু-দ্রব্যের গড়নের উপর মণ্ডনটি লগ্ন হয়ে থাকে না শুধু, গড়নে লীন হয়ে যায়। বস্তুর যে উপরিতলে মণ্ডনটি প্রযুক্ত, প্রায়শঃ সবটাই তার অধিকার করে। এক প্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্ত পর্যন্ত। সেই তার স্বাভাবিক প্রবণতা। কোথাও সে থামতে চায় না। তা ছাড়া, অলংকরণ ও অলংকরণের অবকাশ একটি অন্যটিকে ধরে রাখে, আলিঙ্গন করে থাকে— একটি থেকে অন্যটির মূল্য কম হয় না, একটিকে বাদ দিয়ে আর-একটি দেখা যায় না। এই-সকল কারণে গড়নে আর মণ্ডনে একটি অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ গড়ে ওঠে।

চীনা কারুদ্রব্যের মণ্ডনে এ ভাব বিরল। চীনারা বস্তুবিলাসী যেমন, তেমনি আকাশবিলাসী, গড়নের উপরিতলটিকে তাঁরা সাধারণতঃ আকাশ হিসাবে দেখেন ও দেখিয়ে থাকেন। ফুল পাতা পাখি ড্র্যাগন বা অন্য রূপকল্পনা সেই আকাশেই জেগে থাকে— সবটা অধিকার করে না বা বাহ্যতঃ অধিকার করলেও নক্সা ও তার ফাঁক সমান মূল্য পায় না, পরস্পরকে আলিঙ্গন করে থাকে না, 'আকাশে বস্তুটি আছে' বলা হলেও 'বস্তুতে আকাশ আছে' এ আর বলা চলে না। 'আকাশ' ও 'বস্তু' আলাদা ব'লেই গড়ন ও মণ্ডন আলাদা ব'লে বোঝা যায় এবং প্রযুক্ত রূপালংকার যতই সুন্দর হোক, সেটা যে উপর থেকে চাপানো হয়েছে, অবশ্যম্ভাবী নয়, গড়নের ক্ষেত্রে অঙ্কুরিত উদ্‌গত নয়, এ বোধ দূর হতে চায় না। অর্থাৎ, এ কল্পনার বিশেষত্ব যেমন স্মৃতিনির্ভর প্রতিরূপ-রচনায়, ছাপ ছোপ দিয়ে 'ছায়া'-রচনায়, এ প্রয়োগের বিশেষত্ব তেমনি আরোপে বা উপস্থাপনে। গড়নের অলৌকিক ছন্দ দু হাত বাড়িয়ে দিলেও অলংকরণের অসম্পূর্ণ ছন্দটি অর্ধপথে থেমে রইল, সংকোচে সংশয়ে, অথবা আত্মজ্ঞান ও আত্মপ্রত্যয়ের অভাবে।

রূপ'কে, রূপের অলংকারকে ছন্দ দিয়ে থাকে অনিবার্য ঐক্য, অখণ্ডতা। আচার্য নন্দলাল আমাদের বুঝিয়েছিলেন, বাজারের ঝুড়ি উপুড় ক'রে ফেলাতে, কতক চাল ডাল কুল বাইরে ছড়িয়ে পড়লেও, তা থেকে বলা যায় না ঝুড়ি-ঢাকা কী জিনিস কী ভাবে আছে। কিন্তু, আতপ চাল আর মসুরের ডাল আর নারকুলে কুল সাজানো হয় যদি নক্সার আকারে, আল্পনার ধরণে, তা হলে খানিকটা চোখে দেখলেই বাকিটা অনুমান করা যেতে পারে— বিশেষ ভুল হয় না। এই হল ছন্দে আর না-ছন্দে আশ্চর্য প্রভেদ। কাজেই, ছন্দ যেখানে প্রধান

ও পরিস্ফুট, প্রত্যেক অংশের মধ্যেই সমগ্রের একটা সম্ভাবনা, একটা আভাস, একটা বীজরূপ অবশ্যই নিহিত থাকে। প্রাণবান্ বৃক্ষকে কেটে দিলেও সে আবার কোথা থেকে কোন্ দিকে ডাল বার করবে, তার পাতা ফুল ফল কী রূপ, কী সংহতি নেবে, সহজেই বলা যায়। কারণ, প্রাণের একটা অন্তর্নিহিত ছন্দ আছে যে। মাটির ঢিপিকে ভূমিসাৎ ক'রে দিলে সে আপনা থেকে পূর্ব-আকার ফিরে পায় না, অন্যে কোন্ প্রয়োজনে পুনরায় কেমন আকার দেবে তাই বা কে বলে। অংশের মধ্যে সমগ্রের আভাস ও সম্ভাবনা প্রত্যয়গম্যভাবে থাকে ব'লেই আমাদের দেশের শত শত ভগ্ন মূর্তি, কত প্রায়-মুছে-যাওয়া ছবি, আজও দেশ-বিদেশের রসিকজনের সানন্দ বিস্ময়ের হেতু হয়ে রয়েছে। ছন্দে ন্যূন হলে, শুধু কৌতূহলের ও গবেষণার বস্তু হ'ত। তা হয় নি। গবেষকরা গবেষণা করছেন সন্দেহ নেই —তা ছাড়াও ঐগুলির অপরিসীম সার্থকতা অটুট, অক্ষুণ্ণ রয়েছে ; স্থূল ক্ষয়ক্ষতিতে কিছু এসে যায় নি। ছন্দে বদ্ধ আর ছন্দেই মুক্ত রূপের যে গতি, যে 'সর্বাঙ্গ দিয়ে চলা'[৬], সেটি রূপদর্শকের মনে সঙ্গে সঙ্গে সঞ্চারিত হয়ে যায়। কাজেই, শিল্পী খানিকটা দেখালেও বাকিটা অনুমান ক'রে নিতে পারি আর সবটা দেখবার সুযোগ সৌভাগ্য হলে ঐ 'সব'টুকু অতিক্রম ক'রেও তো দেখতে পাই— বিশেষের ছন্দকে বিশ্বে প্রসারিত করে দেখি— এভাবে দেখার যেন শেষই হয় না, আর এপ্রকার সক্রিয় সম্ভোগের সম্ভাবনায় দ্রষ্টাও স্রষ্টা হয়ে ওঠে মনের ভুবনে এবং ধন্য হয়।

শিল্পের ক্ষেত্রে স্বভাবরূপের অনুকরণের দ্বারা এ পরিণামের আশা করা যায় না। সে অনুকৃতিতে এ ছন্দ থাকে না। প্রতিকৃতিতেও কম থাকে। এগুলির ভোগ, অন্য রসসম্ভোগের অভিজ্ঞতা থাকলে জানতে পারি— অনেকটাই নিষ্ক্রিয়। এই ভোগ্যবস্তু যদি ভেঙে গেল, ছিঁড়ে গেল, তো গেলই— তথ্যকুড়োনো উঞ্ছ-বৃত্তি যার সে লোক ছাড়া অন্যের কোনো কাজে লাগবে না কখনো।

ছন্দের প্রাচুর্যে ও প্রাবল্যে নানা অসম্ভবকে সম্ভব, নানা বিষম ও বিরুদ্ধকে সম্মিলিত করে থাকে— নানা স্তরে, নানা প্রকারে। এই ছন্দের গুণে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব বা গণপতি কিভাবে আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ ও প্রতীতিগম্য হয়ে রয়েছেন, পূর্বে সে আলোচনা করেছি। অন্তরীক্ষচারীরা বিহঙ্গের ভাব (স্থূল ডানা নয়), বায়ুর গতি আত্মসাৎ করেছেন, সে কথাও বলা হয়েছে। মণ্ডনের প্রসঙ্গে এ কথাও উল্লেখ করতে পারি, অজন্তার আলংকারিক চিত্রে, স্তম্ভ বা ছাদের মণ্ডনে, রঙ ও রেখার লহরীলীলায় সমৃণাল পদ্ম আর পদ্মপাতা শুধু নয়, পশু, পক্ষী, মানুষ, অর্ধেক-

৬ রবীন্দ্রনাথের উপমা : নদী যেমন সর্বাঙ্গ দিয়ে চলে।

পাখি ও অর্ধেক-মানুষ, এসবও কেমন অনায়াসে ফুটে উঠেছে। আর, প্রাচীন অলংকরণের এই সর্ববাধামুক্ত অনায়াস গতি, চিত্রে না হোক, বসনে ভূষণে, থালায় ঘটিতে, ধূপুচি-ধূনুচিতে পঞ্চপ্রদীপে, সেঁকেলে পুতুলে খেলনায় আজ পর্যন্ত অব্যাহতই আছে। সেলুলয়েডের পুতুল, মিলের কাপড়ে এরোপ্লেন-বাংলো-মোটর্‌কার-মার্কা পাড়, এসবে যদি বা আজ এ দেশের পল্লী শহর ছেয়ে যায়, হতভাগ্য দেশী কারিগরের কোনো ত্রুটি নেই— মরতে মরতে আজও অনেকে, বিশাল এই দেশের অনেক আনাচে কানাচে, শিবরাত্রির সল্‌তেটুকু জাগিয়ে রেখেছে।[৭] উল্লিখিত মিলের কাপড়ের পাড়-প্রসঙ্গে মনে পড়ল, ছন্দ কী অঘটন ঘটিয়েছে একদিন বাংলার ইষ্টক-স্থাপত্যের অলংকৃত টালিতে, বাংলার বালুচরের শাড়িতে, কখনো বা কাঁথায়। রাম-রাবণের যুদ্ধ যেমন তার বিষয় তেমনি মোগল পাঠানের লড়াইও, কামান-বন্দুকের আমদানি হয়েছে বিনা আড়ম্বরে। পাল্কিবাহন আমীর-ওম্‌রাহ, আল্‌বোলা-রসিক আয়েষী, এমন-কি হ্যাট-কোট-ধারী ফিরিঙ্গি সাহেব— বিষয় হিসাবে কিছুই বাদ দেওয়া হয় নি। কিন্তু, যেখানে যার ব্যবহার, চারি দিকের সঙ্গে মিল রেখে তাকে রূপ দেওয়া হয়েছে একই ছন্দোবন্ধনে বেঁধে, একই শোভাযাত্রার প্রবাহে পড়ে সব চ'লে গেছে— কোথাও তাল কাটে নি। ছন্দে এসব অসাধ্য সিদ্ধ হয়— জড়ে-জীবে মানবে-দেবতায় গায়ে গায়ে চলে আসে, আর বিলাতি বা চীনা হিসাবে 'আকাশ' বলতে যা বুঝি সেও প্রায় খুঁজে পাওয়া যায় না। অথচ সেই 'আকাশ' 'শান্তি'রূপে, 'সমতা'রূপে, রূপের অণুতে অণুতে অনুপ্রবিষ্ট হয়েই থাকে ; শুম্ভ-নিশুম্ভের যুদ্ধে বা বিবাহবাসরের উল্লাসতরঙ্গে তার কোনো ব্যত্যয় হয় না— বুঝতে পারি, রূপস্রষ্টার অন্তরে জেগে উঠে এবং কাঠ কাপড় ধাতু বা ভিত্তিগাত্র একবার চরণচিহ্নিত ক'রে অতঃপর এই শোভাযাত্রা নিরুদ্দেশ হয়ে চলেছে রূপরসিকের মনের আকাশে। সে রসিকজন নেই এক দেহে, এক কালে, এক দেশে, সুতরাং এই যাত্রারও কোনো শেষ নেই।

রূপকল্পনায় ছন্দের প্রভুত্ব থেকে এরূপ একটি পরিণামও আশা করা যায় যে, শেষ পর্যন্ত কেউ বলতে পারবে না, ছন্দ বা রূপ উপস্থিত বিষয় কোন্‌টি, কোন্‌টি রসিকের লক্ষ্য ও সম্ভোগের বস্তু। রূপকে আরতি করতে গেলে সে বলে 'ছন্দের পূজা দাও', ছন্দের কাছে প্রণত হতে গেলে সে বলে 'আমায় দেখলে কোন্‌খানে'।

[৭] কে বা তাদের খোঁজ খবর করে! অথবা হঠাৎ খবর হলেও, এবং ফলে দিল্লি-কোলকাতার বিদ্যুদ্দামস্ফুরিত 'কৃষ্টি' আসরে বৎসরে দু-একবার তাদের ডাক পড়লেও, সে জীবনদর্শন নেই, সে বোধ নেই, সে রুচি নেই, সে সমাজশৃঙ্খলাও লোপ পেতে বসেছে— কৃপাপরবশ প্রচারের কৌশলে ঐ রূপকলা বা কারুকলাকে নবজীবন দেওয়া যাবে না।

এমন উল্টোপাল্টা কথায় একেবারে দিশেহারা না হলে বলব, রূপ ও ছন্দ পরস্পরকে ধ'রে আছে; রূপকে 'নেই' ক'রে[৮] ছন্দ ফুটে ওঠে নি, রূপকে আত্মসাৎ করে সে নিজের পরিচয় দিতে চেয়েছে। যেমন, জোয়ারের জল নেমে গেলে যোজনবিস্তার বালুতে থাকে তরঙ্গের রূপ। অথবা, যে বেলাভূমিতে জল উছলে উঠেছিল কবে তা জানাই যায় না, সেখানেও বালুকার স্থিরতরঙ্গরাজিতে স্পষ্ট স্বাক্ষর রয়েছে অদৃশ্য এবং সদাগতি বায়ুতরঙ্গের। অর্থাৎ, দৃশ্য হল অদৃশ্যেরই রূপ। ছন্দ ও রূপের সম্পর্ক ঠিক এই ভাবের। 'রূপ নেই' বললে ভুল বলা হয়, আর 'রূপ আছে' বললেও কিছুই বলা হল না। এই অপরূপ রূপের শরীরে ছন্দের প্রাণ আছে, আত্মা আছে। ছন্দই আছে। এই ভাবেই প্রতি পদে মূর্তিও বিমূর্ত হয়ে উঠেছে শিল্পের জগতে, রসিকের নিদ্রাবেশমুক্ত জাগ্রত দৃষ্টিতে।

ভারতীয় শিল্পপ্রতিভার এই যেন মূলতত্ত্ব। চীনা শিল্পপ্রতিভার ব্যাপারে এতটা অনুভব করি নি। বৌদ্ধ বা ভারতীয় প্রভাবে প'ড়ে অন্যরূপ; নইলে মানুষের রূপই যখন তার শিল্পের রূপ নয়, পুরাণ ইতিহাস বা সপ্ত স্বর্গের কাহিনী তার বিষয় নয়, চীনা শিল্প তখন স্বভাবের অনুকারী না হলেও অনুগত— ছন্দেই তার বিশেষ রুচি বা বিলাস বা জাগৃতি বা আনন্দ নয়। সকল বস্তুতে তার অনুরাগ, বস্তুস্মৃতি তার বিষয়, আকাশে তার আশ্রয়। চীনা ছবিতে অপরিসীম মর্যাদা পেয়েছে আকাশ। এই আকাশ[৯]। দূরে যেমন আছে, নিকটেও আছে। উৎকৃষ্ট চীনা সৃষ্টিতে দেখা যায়, সকল বস্তু আকাশে ডুবে আছে। চিত্রপটের একান্ত সম্মুখভূমিতে যা আছে সেও আছে অমেয় অসীম আকাশকে অগ্রবর্তী ক'রে। যেখানে গ্রাম শেষ হয়েছে, বন শেষ হয়েছে, পথরেখা নিঃশেষে মিলিয়ে গেছে, গিরিচূড়া স্তব্ধ, সেখানে অনেকটা পট নিয়ে সে তো আছেই, আর বাকি পটেও তার অধিকার অটুট অব্যাহত —এটা অনুভব করা যায়। ছন্দ যদি হয় গতির তত্ত্ব, এটিকে স্থিতির তত্ত্ব বলব কি? কী জানি। চীনা নিসর্গচিত্রে এই রীতিপদ্ধতির যে অশেষ সার্থকতা চীনা অলংকরণের কাজে, মণ্ডনের বেলায় তেমন নয় —এ কথা নিশ্চিত বলা চলে। কারণ, পিরিচে পেয়ালায় তৈজসপত্রে কৌটোয় বা কাপড়ে মণ্ডনের জমিটি নিতান্তই জমি, ধাতু বা কাঠ বা কাপাস-রেশম-পশমের

[৮] 'নেই' করা যায় না, তবু সেই দুশ্চেষ্টাই আজকের পাশ্চাত্য 'রূপচর্চায়'। বিমূর্ত তত্ত্ব বা গূঢ়গতি ছন্দ এভাবে আয়ত্ত হবার নয়।

[৯] শান্তিনিকেতনের মন্দিরে উপাসনাকালে রবীন্দ্রনাথ বহুবার বলেছেন, 'এই আকাশে, এই আলোকে, এই প্রভাতে আমরা জাগলেম না!' সঙ্গে সঙ্গেই বলেছেন, 'আমি এই আকাশ, এই আলোর কথা বলছি— রূপক ব্যবহার করছি নে।'

বুনুনি, আকাশ নয়, আকাশের ভাবে ভাবিত নয়— চীনা কারিগরের রূপসৃষ্টির প্রয়াস সে সীমা পর্যন্ত যায় নি বা যেতে পারে নি।

এ প্রবন্ধে কিন্তু সাধ্যের সীমায় আমরা পৌঁছে গিয়েছি। নানা যুগের নানা দেশের বহুবিধ শিল্পনিদর্শন চোখের সামনে হাজির না রেখে (এমন-কি রেখেও) তত্ত্বচিন্তা আর বেশিদূর যেতে পারে না। তার প্রয়োজনও নেই। পূর্বগামী আলোচনার সার সংকলন ক'রে সংক্ষিপ্তসূত্রে এইটুকু বললেই হবে, চীনা চারুকলা, বিশেষতঃ তার কারুকলার মণ্ডন প্রতিরূপপ্রধান— অন্য দিকে ভারতীয় শিল্প, বিশেষতঃ তার অলংকরণশিল্প ছন্দসর্বস্ব। রেনেসাঁ-অনুগামী পাশ্চাত্যপ্রতিভার সৃজন, চিত্রকলা, মূর্তিকলা, বিভিন্ন চারু ও কারু-কলার দেহলগ্ন অলংকরণ— রূপসর্বস্ব, স্বভাবের রূপের অনুরূপ বা অনুকৃতি। অবশ্য, যে স্তরের রূপকলাই হোক, মানুষের যে-কোনো হাতের কাজে বিশ্বসংসার থেকে রূপ খুঁজে নেওয়া, বুঝে নেওয়া, 'সংশোধন' ক'রে নেওয়া, সাজিয়ে নেওয়া, এসবই স্বতঃসিদ্ধ বলা চলে। না হলে কোনো দেশের কোনো মানুষই কোনো শিল্পকর্মে হাত দিত না। এ কথাও সত্য, কখনো রূপের গঠনে, কখনো তার বিশেষ কোনো দৃশ্য বা স্পৃশ্য গুণে, কখনো রূপের উপর আপতিত ছায়াতপের তথা আঁধার-আলোর কারিকুরিতে, আবহাওয়ার ব্যঞ্জনায়, কখনো বা বর্ণছত্রবিশ্লিষ্ট আলোর ব্যবহারে শিল্পীর মন গিয়েছে। কিন্তু, এরূপ সব ক্ষেত্রেই মন ঘুরে বেড়িয়েছে বাস্তব রূপের বাইরে বাইরে— জীবশরীরের হাড় মাস মজ্জা তন্ন তন্ন ক'রে সন্ধান করেও রূপের অন্তরে প্রবেশ করবার কোনো রাস্তা পায় নি। তবু যা মনের মাধুরী মিশেছে শিল্পরূপে, তা মন বাদ দিয়ে মানুষের কোনো কাজ হবার নয় ব'লেই। মনের মাধুরী প্রচুর মিশেছে, কিন্তু ভেঙে গড়বার কর্তৃত্ব দেওয়া হয় নি মনকে; রূপাধার 'শূন্য ক'রে ভ'রে দেবার' ভরসা জাগানো হয় নি।

বাস্তব রূপের প্রতি বিভিন্ন মাত্রার ঝোঁক থাকার দরুন চীনাপ্রতিভার সঙ্গে পাশ্চাত্যপ্রতিভার মিলের কথা জানি। অমিলের কথাও জানি নে তা নয়। ভারতীয় প্রতিভার সঙ্গেও তুলনায় আলোচনার যোগ্য। অজন্তা বা বাগের ভিত্তিচিত্রের সঙ্গে মাইকেল এঞ্জেলোর অতুলনীয় কীর্তির তুলনা ক'রে দেখা যাক। রেনেসাঁ-ধারাবাহী পাশ্চাত্যশিল্পে সর্বত্র যেমন, সিস্‌টিন চ্যাপেলের ভিত্তিগাত্রেও তেমনি, চিত্র নির্মিত হয়েছে, রূপ গঠিত হয়েছে। কন্‌স্ট্রাক্‌শন এবং কম্পোজিশন'ই প্রধান কথা, রীদ্‌ম্ নয়। (মাপ কোরো ভাই পাঠক, হয়তো তিন পৃষ্ঠা জুড়ে কথার ফুলঝুরি ঝরিয়ে যা বোঝানো অসম্ভব, নিজের বুদ্ধিশুদ্ধি ঘুলিয়ে যাবারও যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে, ঐ তিনটি ইংরেজি শব্দের প্রয়োগে তা শরত্তুষার ন্যায় স্বচ্ছ।

অন্তত সেইটেই এখন ধ'রে নেওয়া ভালো।) অর্থাৎ, একটা 'ছন্দ'কে ছন্দই যদি বলি সে হল পদে পদেই স্থিতিশীল, স্থাণু, যত কেননা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিক্ষেপ ঘটুক আর পেশী ও শিরা মথিত হয়ে উঠুক মাইকেল এঞ্জেলোর বিস্ময়জনক রূপকৃতিতে; এ দিকে বাগে বা অজন্তায় কে বা কারা তুলি ধরেছিল জানি নে, ধ্যানপ্রবুদ্ধ তদ্গত রসোচ্ছল মন নিয়ে রূপ সৃষ্টি ক'রে গেছে—বাহ্যতঃ কোনো মূর্তি বা চিত্র গতিশীল হতে পারে না জানি, তবু স্বপ্রকাশ ছন্দের গুণে বিশাল ভিত্তিতল জুড়ে সেই-সব রূপ উত্থিত, পতিত, তরঙ্গিত ও গতিশীল। কোথায় কম্পোজিশন, কোথায় কন্‌স্ট্রাক্‌শন, কোথায় কোন্ কাহিনীর ফ্রেমে-বাঁধা পরিচ্ছিন্ন গোচরতা! এক হল গড়বন্দী শহর; আর-এক হল খোলা রাস্তার দেশ, 'রাজা' নাটকে রবীন্দ্রনাথ যার কথা বলেছেন— এর যদি কোনো কম্পোজিশন থাকে সেও খোলা, অর্থাৎ তার রূপ আলাদা, নামও আলাদা হলেই ভালো হয়। অজন্তা-বাগের দেয়ালে, প্রত্যেক রূপ অন্য সমস্ত রূপের সঙ্গে মিলে মিশে গিয়েছে, রূপের একটি ভঙ্গী অন্য ভঙ্গীটিকে জাগিয়ে দিয়েছে, এবং রূপ রেখা ভঙ্গীর এই-যে অজস্রতা— যথার্থ ভাবে ধারণা করতে গেলে, কোথাও যেন তার সূচনা হয় নি, শেষও নেই। গজ ফিতে হাতে নিয়ে এ কথা অবশ্য সহজেই অপ্রমাণ করা যায়। ছবির কম্পোজিশন খুঁজে বার করার চেষ্টাও অবশ্যম্ভাবী। বাঁধা কম্পোজিশনের পাল্টা হিসেবে 'খোলা কম্পোজিশন' বললেও সব কথা চুকে যায় না মনে হয়— বাইরের জগৎ থেকে একটি 'সাদৃশ্য' সংগ্রহ করে দেখা যাক। সাদৃশ্য আছে নিত্যতরঙ্গিত সমুদ্রে। নিস্তব্ধ শান্তিকে প্রকাশ করবার একি কৌশল! গতির মধ্যেই শান্তি। সব বিশেষকে আত্মসাৎ ক'রেই এক অবিশেষ। তাই তো জীবে জীবে শিবের উল্লাস আর তথাগতের আগতি, আবির্ভাব। সমুদয় ভিত্তিচিত্রটি যদি দেখি (চোখ দিয়ে একই কালে সবটা দেখা যায় না, মন দিয়ে দেখতে হবে। কানে আদ্যন্ত গানটি একই কালে শোনা যায় না, সেও মন দিয়ে শুনতে হবে) দেখতে পাই জড় প্রণালীতে একটির সঙ্গে অন্যটি গেঁথে গেঁথে বাইরের থেকে নির্মাণ করা এ নয়— একটি জীবকোষের অন্তর্নিহিত প্রাণ থেকে, প্রৈতি থেকে, ইচ্ছাবেগ থেকে, একটি পূর্ণাঙ্গ জীবের ও তার জীবনের যেন নিরন্তর প্রকাশ। বলা ভালো, যতটা বুঝেছি মূল তত্ত্বেরই আমরা আলোচনা করলেম; বাহ্য প্রকাশে কিছু বিরুদ্ধাচরণ, কিছু 'অন্যথা বৃত্তি', কিছু অসম্পূর্ণতা ও ত্রুটি থাকা অসম্ভব নয়। পাশ্চাত্য চিত্রে মূর্তিতেও কি প্রাণ নেই? না থেকে যাবে কোথা? তবে 'শরীর'স্তূপে কেবলই চাপা পড়েছে। আজ পর্যন্ত শিল্পী কেবলই তাকে ভুল পথে আর ভুল মতে সন্ধান করছে। মোটের উপর এই কথাই বলা চলে, ধারাবাহী পাশ্চাত্য শিল্পে রূপের, তন্মাত্রের, ইন্দ্রিয়নির্ভর তত্ত্বপলব্ধির চরম ও পরম প্রকাশ। আঙ্গিকের

দিক দিয়ে বলা যায়, এ শিল্পরীতিতে রেখার বিশেষ এলেকা নেই, উজ্জ্বলে-অনুজ্জ্বলে-ব্যক্ত নতোন্নতভাবের ব্যঞ্জনায় বস্তুরূপের তিনটি আয়তনকেই দুই আয়তনের ক্ষেত্রে ধরা হয়েছে (বস্তুর উপরে 'সাময়িক'-আলোক-পাতে বস্তুকর্তৃক অস্থায়ী গাঢ়ছায়াসম্পাত তাও বহু ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে)— দুই আয়তনের ক্ষেত্রে তিন আয়তনের বিভ্রম-উৎপাদনই যখন সাধনা ও সিদ্ধি, কাগজ, ক্যান্‌ভাস, ভিত্তিতল, এদের নিজস্ব মূল্য বা মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়ে গেছে— মনে হয়, যে দেয়ালে ছবিটি আঁকা, যেখানে টাঙানো, সেখানে জান্‌লা কাটা হল যেন বাইরের সংসারে বা স্বভাবে বিশেষ একটি দৃশ্য দেখবার কামনায়— ভিত্তিচিত্রের পাড় বা টাঙানো ছবির ফ্রেম সেই বাতায়নেরই চারি ধারের বাজু।

আলেখ্যছলে জান্‌লা ফোটানোর প্রসঙ্গে প্রশ্ন উঠল, এটা কি পাশ্চাত্য জাতিদেরই বৈশিষ্ট্য ? সেই তো আমাদের ধারণা। টেক্‌নিক ও কম্পোজিশনের বৈশিষ্ট্য নিয়ে কথা হচ্ছিল, তার বদলে শিল্পপরিণত রূপের বিষয়েই যদি আলোচনা করি এবং রূপ মাত্রকেই যদি জান্‌লা বলে মনে করি, তা হলে কঠোপনিষদের একটি শ্লোক স্মরণ করা যেতে পারে— স্বয়ম্ভু দেহের দ্বারগুলি বহির্‌মুখ করেছেন ব'লে বাহিরের দিকেই তাকায় জীব ; ক্বচিৎ কোনো ধীর অমৃতত্ব-ইচ্ছায় দৃষ্টি ফিরিয়ে অন্তরে দেখে অমৃতময় পুরুষকে। পূর্বের উল্লেখ ও উপমাটিকে কথঞ্চিৎ অতিক্রম ক'রে এখন আমরা এও বলতে পারি, প্রত্যেক রূপই দ্বার বাতায়ন ; তবে ভারতীয় আর পাশ্চাত্য দৃষ্টিতে তফাত এই যে, সেই দ্বার-জান্‌লার ভিতর দিয়ে তাঁরা যখন বাইরের জগৎই দেখছেন, জীবনে আর শিল্পে বাইরের অভিজ্ঞতাই ভূয়ঃ ভূয়ঃ সঞ্চয় করছেন, এ দেশের গুণী জ্ঞানী শিল্পী অনুরূপ দ্বার-জান্‌লা দিয়ে, বাইরে নয়, ভিতরের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করতে চাইছেন, গভীরের এবং ঊর্ধ্বের সত্যকে স্বরূপকে প্রত্যক্ষ করতে যত্ন করছেন। এও সেই রূপান্তরেরই কথা।

যেমন ক'রে হোক আমাদের ভাবনার বৃত্ত সম্পূর্ণ হয়েছে ; অতএব সূচনায় ফিরে গিয়ে শেষ করা যাক। কারুপ্রদর্শনীর কল্যাণে স্বচক্ষে দেখলেম, মর্তজীবনের সর্ব বিষয় নিয়ে চীন জাতির, চীনা কারিগরের, চীনা শিল্পীর একাগ্রধীর অনুশীলন, সজীব সরল অনুভূতি, গভীর সন্তোষ, নিবিড় প্রীতি, দরদ এবং স্নেহ। তারই ফলে পার্থিব সকল বিষয়ে তার সহজ অধিকার ও নৈপুণ্য। এমন আত্মতৃপ্ত, স্বয়ংসম্পূর্ণ, সুখদুঃখের অশেষ দ্বন্দ্ব -সহিষ্ণু জাতি বা জাতীয় প্রতিভা আর তো দেখা যায় না। অথচ এর মধ্যে কোনো উগ্রতা বা ঔদ্ধত্য নেই। স্থূল পঙ্কিল লালসা নেই। অর্থাৎ, জাতীয় চরিত্রে স্বভাবতঃই নেই। কোনো দিকে বাড়াবাড়ি না ক'রে, সব রকমে ভারসাম্য বজায় রেখে, ব্যষ্টি ও সমষ্টির বিভিন্ন দাবিদাওয়ায় সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য-

বিধান ক'রে, শান্তিপূর্ণ আর আয়ুষ্কর পরম্পরা অক্ষুণ্ণ রেখে, খেয়ে প'রে বেঁচে-বর্তে থাকা— দীর্ঘকাল এই পৃথিবীতে থাকা— নির্বাণ বা পরব্রহ্মের চিন্তা নিয়ে নয়, মেরু-আবিষ্কারের বা আগ্নেয়গিরি-প্রবেশের দুশ্চেষ্টা নিয়েও নয়— শারীরিক স্বাস্থ্য ও সোয়াস্তি, মানসিক স্বপ্ন ও কৌতুক,' দু-চারটি স্বজন-প্রতিবেশী সম্পর্কে সহজ সখ্য প্রীতি ও শুভেচ্ছা, এইমাত্র সম্বল ক'রে— এই যেন মহাচীনবাসীর সর্বসাধারণ জীবনাদর্শ। অন্তত, এই তার শত-শত-যুগ-প্রবাহিত জাতীয় চরিত্রের সর্বপ্রধান ধারা ও ধরণ। আগন্তুক সাম্যবাদের সংক্রামেও এর আমূল পরিবর্তন হতে পারে, এমন কল্পনা করবার কারণ নেই। এবং চীনের এই বিশেষ আদর্শ, বিশেষ চরিত্র, বিশেষ ধর্ম, আপন আপন আদর্শে চরিত্রে ও ধর্মে প্রতিষ্ঠিত থেকেও অন্যান্য জাতির শিক্ষার বিষয়। সে শিক্ষায়, ভারতীয় চরিত্রের অতিশয়িত সাত্ত্বিক ভাব এবং তারই প্রতিক্রিয়ায় অতিব্যাপ্ত তামসিকতা এইমাত্র বাধা। য়ুরোপীয় জাতিসমূহের বাধা— তাদের অতিরিক্ত রাজসিকতা, অহংকার, ঔদ্ধত্য, অশান্ত তৎপরতা ও অর্থহীন ত্বরা। বেগ আর মুনাফা আর শক্তি[১০] এই তিন 'নির্‌গুণ ব্রহ্মের' আরাধনায় সমস্ত য়ুরোপ আমেরিকা উন্মত্ত। চীনের কাছে আবশ্যকীয় শিক্ষাটি নিতে পারবে কি? অথবা বাহ্যতঃ বহু বৈসাদৃশ্য থাকলেও এবং আজও ভারতের অবশ্যম্ভাবী মহিমা সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ না পেলেও, আসতে হবে কি এই ভারত-ভারতীরই পাঠশালায়? কারণ, আপন সত্তাতেই অশেষ গুরুত্ব-স্থাপন, আপনাকে বিশ্বসংসারের কেন্দ্রস্থ দেখা ও বিশ্বসংসারের চেয়ে বড়ো ক'রে দেখা, বিশ্বকে সন্তুষ্টচিত্তে ভোগ করা নয়, তাকে সর্বতোভাবে জয় করা[১১]— মনুষ্যসত্তার এরকম গোড়া-ঘেঁষা কতকগুলি প্রবণতায় ভারতীয় হিন্দু আর পাশ্চাত্য শ্বেতকায় মানুষ মনে প্রাণে একই।

'প্রবীণ প্রাচীন চীন নিশিদিনমান
কর্ম-অনুরত।'

কালধর্মে আমরাও কুঁড়েমি আর দিবানিদ্রা নাহয় ছাড়ব। কিন্তু, যন্ত্র-উপাসনা আর ব্যস্ততাও কতখানি অনাহূত আর অবাঞ্ছিত, কলায় অথবা কারুকর্মে, সে

১০ শক্তির উপাসনাকে অহমের উপাসনাও বলা চলে। শক্তি— 'আ মার' শক্তি। তিনটি আরাধ্য দেবতা হল : speed, profit and power (ego).

১১ পাশ্চাত্যজাতি যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন বহির্‌বিশ্বে, প্রাচ্যদেশীয় হিন্দু চেয়েছিল ভিতরেই জয়শীল হতে। সাঁড়াশির দুটি মুখের মতো এই দ্বিমুখী অভিযানে, মর্তজীবনে, তথা মানবজীবনে, নিঃসপত্ন অধিকার -লাভই হল প্রাচীন আর্যজাতির সুচির এষণা।

সম্পর্কে একটি গল্প মনে পড়ছে। (বক্তা ডেভিড-থোরো। এই আমেরিকান সাধু কোথা থেকে গল্পটি সংগ্রহ করেছেন তা জানি নে।)— এক ছিল খেয়ালী মানুষ, তার ছিল না বুঝি সংসারের কোনো দায়, অথবা থাকলেও সে বিষয়ে কোনো খেয়াল ছিল না। আপন-মনে আপনার খুশিতে বানাতো যখন-তখন ঘুড়ি-লাট্টু খেলনা-দোলনা ছাতা-ছড়ি। এক সময় অপূর্ব একটা ছড়ির স্বপ্ন এমন তাকে পেয়ে বসল যে, ভালো গাছের ভালো ডাল খুঁজে খুঁজে চলে গেল সে কামরূপ থেকে কান্দাহার। মনের মত গাছ ও ডাল যত দিনে পাওয়া গেল তার মধ্যে শক হূন যবনের অভিযান ও অধিরাজত্ব শেষ হয়ে নূতন কোনো জাতির নূতন সাম্রাজ্যের পত্তন হয়েছে। গাছের ডালটির বাঁকচুর দূর করতে আর তাকে জলে ডুবিয়ে, রোদে সেঁকে, আগুনে পুড়িয়ে পাকা ক'রে নিতে— বাদশাহি-সমেত বাদশারা শেষ হল সব আর কাবুল-হিরাট শূন্য হয়ে গেল। হাতলের কাছটিতে মনোমত বঙ্কিমা, সমস্ত ছড়িটায় যথোচিত রঙ আর পালিশ, এখানে-সেখানে একটু-আধটু কারুকার্য, এ-সব সমাধা হতে হতে অতলান্তিক থেকে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত মনুষ্য নামেরই আর কেউ রইল না— ছড়ি তৈরি হয়ে গেল, লোকটি যার-পর-নেই খুশি হল, একবার কালো কুচ্‌কুচে গুম্ফরেখার দুটি ধার চুম্‌রিয়ে নিল, তার পর সবেমাত্র সওয়া তিন হাতের সেই ছড়িটা বাড়িয়ে মধ্য-আকাশের কালপুরুষকে স্পর্শ করল।

এও কি বিশ্বাস করতে হবে? তথ্যে ও বাস্তব সত্যে একান্তই যদি বাধে, 'আরো-সত্য' হিসাবে এ গল্পটিও গ্রহণ করা যাক্। কবি এই গল্পটিতে বোঝাতে চেয়েছেন— শিল্পের সাধনায় কাল ব'লে কিছু নেই আর সব দেশই নিকট ও নাগালের মধ্যে। খেয়াল আর খুশি এর গূঢ় মর্মমধু, সৌন্দর্য এর হাসির ছটা; রুজি-রোজগার সুখ-সুবিধা এর ঠিক লক্ষ্য নয়।

এ জিনিস কি কারখানা-ঘরের 'উৎপাদন' হতে পারে? টাকা-পয়সায় এর কোনোরূপ কেনা-বেচা হয় না।

১৯৫৫

ভারততীর্থদর্শন : ভারতীয় চিত্রকলা

আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তুটির আদিও নেই, অন্তও নেই। অতীতে ও অনাগতে বিস্তৃত। বর্তমানের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে থেকে তার সম্যক্ বর্ণনা করতে পারি এমন বেদব্যাস আমরা নই, আর দ্বাপরের শেষে যে ঘটনা ঘটেছিল আজও তা ঘটবে বলে মনে হয় না— পুণ্যকৈলাসশিখর থেকে নেমে এসে ভক্তবৎসল গণপতি আর একবার লেখনী ধারণ করবেন না। এইখানে বলে রাখি, ভাগ্যবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়নের জন্য গণেশ যে কলম ধরেছিলেন এটা বানানো কথা নয়; কারণ, ভারতের চিরগৌরবস্থল মহাভারত কোনো একটি মহতী প্রতিভার শক্তিতেই সাকার ও সংহত হলেও, ভারতমহাদেশের অগণ্য জনগণের মন বুদ্ধি কামনা কল্পনা তার পিছনে ছিল আর সামনেও ছিল, সহযোগী সহকারী -রূপে। অনুরূপ শুভদিন ও শুভক্ষণ জাতির জীবনে আর কখনো ফিরে আসবে কি? সুতরাং, যে ভারত দেশে ও কালে সুদূরবিস্তৃত, অন্তর্লোকেও সীমাহীন, অরণ্যপর্বত সরিৎসিন্ধু নগরপল্লীর সমাহার শুধু নয়— সচেতন সত্তা— সাকার কল্পনা— জাগ্রত জীবন্ত আইডিয়া— তার কিয়দংশমাত্র আমাদের নয়ন ও মনের গোচর হলেই খুশী হব, এমন-কি, চতুর্ধামভ্রমণ সমাধা না করেও বলতে পারব সমুদয় ভারতকে তীর্থ বলে দেখেছি আর জেনেছি, ধন্য হয়েছি। 'সাড়ে তিন হাত' মাপের মানুষ হিন্দুকুশ থেকে কামরূপ পর্যন্ত ধাবিত সহস্রশীর্ষ হিমগিরির কতটুকু দেখে বলে 'হিমালয় দেখেছি'! তবু সে মিথ্যা বলে না। গঙ্গার কতটুকু সলিলের সোহাগস্পর্শ অঙ্গে নিয়ে বলে 'গঙ্গায় স্নান করেছি'! তবু সে নিখিল পতিতপাবনী ধারার সহগামী হয় ভগীরথের মতোই, মনে মনে।

ফলতঃ, প্রত্যেকেই আমরা ভারততীর্থযাত্রী, জন্মকাল থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত। সচেতন ভাবে সবটা দেখি নি, সবটা ছুঁই নি কোনো ভাগ্যবান্। যে যতটুকু দেখেছি বা দেখছি, পান্থশালাশ্রিত ক্বচিৎ অবসরসময়ে গল্পচ্ছলে কোনো সতীর্থের কাছে বলি। একে অন্যের অভিজ্ঞতাধনে ধনী হয়ে উঠি। খণ্ডকাব্যের আদর আছে যখন, খণ্ডদর্শনও একান্তভাবে খণ্ডিত বা নিরর্থক অবশ্যই নয়।

অথচ নিন্দার যোগ্য খণ্ডজ্ঞান বা অজ্ঞান কিছু যে নেই এমনও নয়। ভারতের উত্তর যদি ভারতের দক্ষিণকে না চেনে, না জানে, সেটিকে নিঃসন্দেহই অনিষ্টকর ও অনুচিত ব্যাপার বলব। নানা ঘাতপ্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে উত্তরদক্ষিণের এই মিলন ঘটিয়েছিলেন রামচন্দ্র ত্রেতা যুগে, তাই তিনি অবতার, মহামানব। তাঁর

চরিতকথাই মহাকাব্য। রামচন্দ্রের জন্ম ও কর্মের বহুপূর্বে গিয়েছেন অগস্ত্য ; ভারতকে সম্পূর্ণ দ্বিখণ্ডিত করে আকাশ স্পর্শ করেছিল যে বিন্ধ্য, এই মহামুনির কাছে সে মাথা নত করেছে, উত্তরদক্ষিণের যোগাযোগের রাস্তা খুলে গিয়েছে সর্বপ্রথম। অগস্ত্য আর ফেরেন নি ; আর্যাবর্তের ধ্যান জ্ঞানকে নিয়ে গিয়েছেন ভারত-মহাসমুদ্র অবধি, হয়তো তার পারেও। তার পরে কালে কালে আরও অনেকে (সকলেই অবশ্য মুনিঋষি হবেন না) গহন দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করে প্রথমে দিশেহারা হয়েছেন হয়তো, পরে বসতি স্থাপন করেছেন, সমিধ্-আহরণ আর যজ্ঞাগ্নি-প্রজ্বালন করে উদাত্ত অনুদাত্ত স্বরে বেদমন্ত্র পাঠ করেছেন, এবং, পুরাণবর্ণিত আখ্যায়িকা সত্য হলে, রাক্ষসেরা এসে তাঁদের ধরে ধরে খেয়েছে বা নিয়ে গেছে, শোণিতবর্ষণে হোমাগ্নি নিবিয়েছে, তাঁরা পলায়ন করেছেন, শাপ দিয়েছেন, আর্যদেবতাদের ও শূরবীরদের সহায় করে পুনর্বার প্রবেশ করেছেন গহনারণ্যে, এবং নিরন্তর দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়েই এগিয়ে চলেছেন আর্য-অনার্যের দ্বন্দ্বসমাসের দিকে। না, তারও বেশি। কারণ, আর্য অনার্যের শোণিত ও সংস্কৃতি মিলেই, ধ্যান জ্ঞান জীবন ও কর্ম একীভূত হয়ে, ঐতিহাসিক হিন্দুজাতির বা হিন্দুসভ্যতার অভ্যুত্থান। এমনি মিলে মিশে এক হয়েছে যে, ছত্রিশ জাত ও ছয় শত মত-পথ সত্ত্বেও, আজ আর্য আর অনার্যের পরিচ্ছিন্ন স্বরূপ বা সংজ্ঞার্থ -নির্ণয় আমাদের তো সাধ্যাতীত বটেই, পণ্ডিতগণও বিমূঢ়, বিভ্রান্ত। পণ্ডিত ব্যক্তির একটা সুবিধা এই যে, 'জানি না' এ কথাটাও তিনি এমন ঘটা করে বলতে পারেন যে তাঁকে সর্বজ্ঞ ব'লেই মনে হয়। যা হোক, ভারতের ঐতিহাসিক কালে পাই— এই আর্য অনার্য দ্রাবিড় মোঙ্গল শক হূনদল -মিলিত-মিশ্রিত এক 'হিন্দু' জাতি যার স্বরূপ স্থির হয়ে গেছে অথচ সৃজন শেষ হয় নি, নব নব কলেবর -ধারণের বিধিনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া চলেছে যুগে যুগে। না, আজও ভারতজাতির দিব্যদেহধারণ সম্পূর্ণ হয় নি এই কথাই বলছেন শ্রীরবীন্দ্রনাথ বা শ্রীঅরবিন্দ।

কথা হল এই যে, হিন্দুজাতি বা ভারতজাতির অংশ বা উপাদান -ভূত আর্য ও অনার্যের স্বরূপ বা সংজ্ঞার্থ যদিবা ভাষা দিয়ে নিঃশেষে বলা চলে না, ভাবে ও অনুভবে অনেকটাই বোঝা যায়, কোনো কোনো লক্ষণ ধরে নির্দেশ করাও অসম্ভব নয়। (অনার্য শব্দটি অনেক ব্যাপক অর্থেই গ্রহণ করা যেতে পারে— আর্য নয়, ভারতভূমির এমন সকল প্রাচীন জাতিই অনার্য।) চিরচলিষ্ণু আর্যদের জীবনে উদ্ভূত হয়েছিল অপৌরুষেয় বাণী, বেদ, উপনিষৎ, শব্দব্রহ্ম। মধ্যএশিয়ার পথহীন প্রান্তরে পশুচারণসময়ে তাঁদের দৃষ্টি ছুটেছিল আকাশে আকাশে, দিকে দিগন্তরে ; সেখানে তাঁরা আকাশের দেবতাদেরই দেখেছিলেন এবং আহ্বান ও উপাসনা করেছিলেন অগ্নি সাক্ষী ক'রে— মন্দির বা মূর্তির প্রয়োজন হয় নি। তাঁরা যে

বহুদেবোপাসক ছিলেন তাও বলা যায় না ; কারণ, আকাশে যাকিছু দেখা যায়, সূর্য চন্দ্র নক্ষত্র, এমন-কি বজ্র ও বিদ্যুৎ-গর্ভ মেঘ, জ্যোতির্ময় স্বভাবে সকলেই যে এক— একং সদ্‌বিপ্রা বহুধা বদন্তি— এ কথা আর্যজাতির অবিদিত ছিল না ; তাঁরা ছিলেন **এক ব্রহ্মেরই** উপাসক, বেদের উপনিষৎ অংশে তো এ কথা অতিশয় স্পষ্ট। আর্যরা ভারতে প্রবেশ করেছিলেন বেদ নিয়ে, বাণী নিয়ে, বহুর মধ্যে অনুস্যূত একেরই উপাসনা ও উপলব্ধি নিয়ে, স্মরণবিস্মরণের বহির্‌ভূত এক সুদূর অতীতে। স্বভাবতঃই তাঁরা ছিলেন যাযাবর, যোদ্ধা, দ্রষ্টা, কবি ও উদ্‌গাতা। এ দিকে পূর্বতন অধিবাসী ছিলেন যাঁরা ভারতভূমির— বেলুচিস্থানে, পঞ্জাবে, সিন্ধুপ্রদেশে, সুবিশাল দাক্ষিণাত্যের অরণ্যে পর্বতে বা লোকালয়ে, তাঁদের ছিল অন্য পরিচয় ও অন্যরূপ সভ্যতা। যতটা তার ভূপঞ্জরের স্তরে স্তরে লুক্কায়িত ছিল এবং আজ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে তাতে মনে হয়, বিচিত্র ছিল তাঁদের সৃজনপ্রতিভা— বিবিধ কৃষিকর্মে, পশু-পালনে, নগর পল্লী ও দুর্গ-নির্মাণে, আয়ুধ ও অলংকার-উদ্‌ভাবনে, বস্ত্রবয়নে, মুদ্রাঙ্কনে, মূর্তিগঠনে, বহুবিধ শিল্পে ও কারুকলায়। হয়তো তাঁরা বহু দেবদেবীর, এমন-কি ভূত-প্রেতেরও উপাসনা করতেন ভয়ে ভক্তিতে আবেগে আবেশে, শেষ-পর্যন্ত কিছুই যার পরিত্যক্ত হয় নি হিন্দুধর্ম থেকে, হিন্দুর জীবন থেকে, সমাজ থেকে, এবং আজও হয়তো নামান্তরে বা রূপান্তরে আমাদের ভয় ভক্তি সম্ভ্রম ভোগ করছে ; অসংখ্য পুরাণে উপপুরাণে তন্ত্রে পাঁচালিতে ছড়ায় বা প্রবাদবাক্যে, জনসাধারণের আচারে বিচারে বিশ্বাসে, সর্বত্র প্রচারিত রয়েছে। অনার্যরা ভারতভূমির বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন জাতি হতেও পারেন, কিন্তু তাঁদের বহুলাংশ ছিলেন পল্লীবাসী বা নাগরিক, কৃষিজীবী, কারিগর, গৃহস্থ, ভোগৈশ্বর্যসম্পন্ন ও বহুদেবোপাসক। হরাপ্পা মহেঞ্জদারোর উৎখাত সাক্ষ্যই চোখে দেখি আর রামায়ণ মহাভারতের ছন্দোবদ্ধ গাথাই কানে শুনি, যাঁরা আর্য নয় তাঁরাই যে অসভ্য ছিলেন এমন তো মনে হয় না ; বরং তার বিপরীত। ময়দানবের স্থাপত্য ছিল মর্তে অনুকরণাতীত, আর কনকলঙ্কার ঐশ্বর্যদ্যুতিও অযোধ্যাকে ম্লান করেছিল। বিমানবাহন রাবণ ইন্দ্রচন্দ্র বায়ুবরুণকে দাসত্বে নিয়োজিত রেখেছিলেন, এ কাহিনীরও তাৎপর্য কিছু আছেই।

তবু, আর্যরা অনার্যদের জয় করেছিলেন[১] — এক দিনে বা এক শতাব্দীতে নয়

[১] ভরসা আছে, বর্তমান আলোচনা দাক্ষিণাত্যবাসী ভ্রাতৃগণের গোচরে আসবে না। প্রাণের দায়ে আর প্রেমের দায়ে আর্য অনার্যের যে লড়াই, বহুদিন হল চুকে গেছে। তাবৎ ভারতভূমিতে, উত্তরে দক্ষিণে, বিশুদ্ধ আর্য বা অনার্য বিশুদ্ধ ঘৃতের চেয়েও দুর্লভ। মিথ্যা অভিমানে নিজেকে কোনো-এক-পক্ষ-ভুক্ত ক'রে কল্পিত অন্য পক্ষের বিরুদ্ধে পাঁয়তারা কষার আজ কোনো অর্থ নেই।

— আর জয় ক'রেও বশীভূত হয়েছিলেন ; উভয়ে মিলে মিশে এক অধ্যাত্মচেতনা, এক সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়ে তুলেছেন পৃথিবীতে যার কোনো তুলনা নেই।

যাযাবরও ঘর বাঁধে। যে একতারায় এক সুরই সেধে এসেছে পথে পথে— দিগন্তলক্ষ্য আকাশ-উৎসুক পথে পথে— হঠাৎ সে দীপোদ্ভাসিত রঙ্গমঞ্চে নৃত্য গীত বাদ্য -সহযোগে অভিনয় করতে মেতে ওঠে ; কত ভাবে কত রূপে কত রসের প্রবাহই না বয়ে যায়।

দর্শনশাস্ত্রে বলে, পুরুষ ও প্রকৃতির যোগে সৃষ্টি হয়। পুরুষকে দ্রষ্টা, অনুমন্তা, জ্ঞাতা ও ভোক্তা বলা যায় ; প্রেরণ না করলেও দিক অবশ্যই দেখিয়ে দেন, কেননা তিনিই চক্ষুষ্মান্। পুরুষের ইচ্ছাবীজ আকর্ষণ করে সৃষ্টি করেন প্রকৃতি ; সৃষ্টিকে রক্ষণ ও পোষণ করেন ; তাঁর শক্তির ও নৈপুণ্যের কোনো অবধি নেই, ধৈর্যও অপরিসীম, উৎসাহ উদ্দীপনা ও আহ্লাদ অক্ষয় ; অপরাস্বরূপে যদিবা অন্ধ হন তিনি, তাতেও কিছু এসে যায় না, কারণ, অব্যাহত ও অস্খলিত তাঁর গতি যতক্ষণ পুরুষের সঙ্গে আছেন মিলিতা।

সীমাহীন ইতিহাসের পটে, ঈষদুদ্ভাসিত ক্ষুদ্র পরিসরে, আর্য আর অনার্যের সংঘাতে ঐ বিশ্বব্যাপারেরই একটা প্রতিরূপ কি ফুটে ওঠে নি? হিন্দুসংস্কৃতির গঠনে অনার্য দিয়েছেন প্রাণময় শরীর, আর্য দিয়েছেন অন্তশ্চেতনা। কোনো দানই সামান্য নয় এবং আজ বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে আলোচনা করা চলে এমনও নয়।

এক'কে আলিঙ্গন করে রয়েছে বহু। অন্তহীন সেই জীবননাট্যেরই প্রতিরূপ রচিত হয়েছে মন্দিরে মন্দিরে। শ্রীক্ষেত্রে, কোণারকে, তাঞ্জোরে ও খাজুরাহে। প্রায়ান্ধকার গর্ভগৃহে হস্তপদহীন জগন্নাথ বা নিঃসঙ্গ সূর্য বা নিরাকারকল্প লিঙ্গমূর্তি[২], আর সতত তাঁকেই প্রদক্ষিণ করছে নিখিল সংসার— সজীব আকারে সত্য, তা ছাড়া শিল্পাকারে, মূর্তি এবং চিত্র -আকারেও বটে— ছোটো-বড়ো ভালো-মন্দ পশু-মানব শ্লীল-অশ্লীলের বাছ-বিচার কিছু নেই— চোখ থাকলেই এবং সংকীর্ণ 'সেমিটিক' দৃষ্টিতে না দেখলেই, তার গভীর গম্ভীর মহিমায় এবং অপরূপ সৌন্দর্যে ও তাৎপর্যে অভিভূত না হয়ে উপায় নেই।

কবির অব্যর্থ বাক্যে এমনও বলতে পারি, আর্য অনার্য মিলে—

তপস্যাবলে একের অনলে বহুরে আহুতি দিয়া
বিভেদ ভুলিল, জাগায়ে তুলিল একটি বিরাট হিয়া

[২] আপামর হিন্দুর উপাস্য এই দেবমূর্তিকে শিশ্নপ্রতীক বলে সকলে স্বীকার করেন না ; নিবাতনিষ্কম্প অগ্নিশিখারও প্রতিরূপ মনে করেন। জ্যোতির্লিঙ্গ শিবের উপাসনাও আছে। লিঙ্গ, অর্থাৎ চিহ্ন। জ্যোতি যাঁর প্রতীক সেই সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অদ্বয় শিব বা ব্রহ্ম।

মহাভারতক্ষেত্রে ভারতীয় সংস্কৃতির বিশাল এক শরীরে।

যেমন তেমন ক'রে এতক্ষণ যা বলা গেল, জানি না, বক্তব্যের ভূমিকা কিম্বা সেইটেই আমার আসল বক্তব্য।

পরিচ্ছিন্ন তত্ত্বকে প্রচুর তথ্যের সঙ্গে হুবহু মেলানো যায় না। কাজেই এত অধিক তত্ত্বকথার প্রয়োজনটা কোথায়, এ সন্দেহও দেখা দেয়। (হয়তো বয়োধর্ম-বশতঃই কবিতা না লিখে প্রবন্ধ লেখা, বর্ণনা স্থগিত রেখে ব্যাখ্যানে প্রবৃত্তি।) তবু, তত্ত্বেরও প্রয়োজন আছে। কথঞ্চিৎ অপ্রমত্ততা যদি থাকে আর একেবারেই কপোলকল্পনাও না হয়, জীবনের গতি-প্রকৃতির কতকগুলি সাধারণ সূত্র সে দিতে পারে। সেই সূত্রের উপরেই জীবন যে সার্কাসের কসরত দেখায় এমন নয়, জীবনে জীবনে ঐ সূত্র তবু অনুস্যূত থাকে, একেবারে সূত্রছাড়া হয় না। আর্য অনার্য -প্রতিভার অবিশ্লেষণীয় মিলনে ভারতীয় অধ্যাত্মসাধনার, ভারতসংস্কৃতির ও ভারত-শিল্পের উদ্ভব উৎকর্ষ ও প্রবৃদ্ধি, এ কথা হয়তো বলা হয়েছে। কোন্ প্রতিভার বিশেষ কী দান তারও ইঙ্গিত ইশারা পাই নানা দিকে। মাতা পিতার ভিন্ন ভিন্ন সত্তা সন্তানের অভিনব সত্তায় —চেহারায় ও চরিত্রে— একান্তভাবে পৃথক্ ক'রে দেখানো যায় না সত্য, তবু তো নির্দেশ করা যায়। রহস্যময় এই-যে জৈবিক মিলন, বিভিন্ন পুত্রকন্যায় এ আবার বহু বিচিত্র রূপও ধরে।

ভারতের নানা যুগে ও নানা প্রদেশে নানাভাবে বিকশিত স্থাপত্য মূর্তি ও চিত্রকলার বহু নিদর্শন চোখে পড়েছে বহুদিন ধ'রে। ক্রমশ প্রতিচ্ছবিগ্রাহী মনোমুকুরে স্থায়ী ছাপ ফেলতেও ত্রুটি করে নি। সব বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়ে প্রবহমাণ এক অবিচিত্র ভারতীয় প্রেরণা, অনুভব অবশ্যই করা যায়, খুলে বলা যায় কি? অবলুপ্ত যে সিন্ধুসভ্যতার নানা নিদর্শন পাওয়া গেছে হরাপ্পায় ও মহেঞ্জদারোতে তাকেও তো নিঃশেষিত বলা যায় না ঠিক; উৎখাত মুদ্রা ও মূর্তি -রাজির প্রমাণেই নিঃসন্দেহ হতে পারি যে, সহস্রবর্ষকাল অন্তঃপ্রবাহে বহমান থাকলেও পরিণামে হিন্দুসভ্যতার দুকূলগ্রাসী প্লাবনে প্রবল বেগে মিলে মিশে গেছে ঐ প্রাগ্‌বৈদিক ধারা— সেই দিগম্বর শিব, সেই জগন্মাতা, সেই বৃষভরূপী নন্দী। পার্থিব স্তরে আর্য অনার্যের সংঘর্ষ চলেছে বহু যুগ; অপার্থিব লোকে আর্য ও অনার্য দেবতার দ্বন্দ্বের সমাধান হয় নি আরও বহুশত বৎসরে— কিন্তু পরিণামে ইন্দ্র ও উপেন্দ্র, ব্রহ্মা ও শিব, মিত্রবরুণ ও বিষ্ণু, সকলেই স্বীকৃত হয়েছেন এক পরমদেবতারই নানা নামরূপ ব'লে। লৌকিক বুদ্ধ অলৌকিক মুক্তিদাতা ও পরিত্রাতায় পরিণত হয়েছেন, আর ভারতভূমিতে হিন্দুধর্মেই লীন হয়ে গেছে যেদিন বৌদ্ধ মত ও পথ— বিষ্ণু বা শিব বলেও কি পূজিত হন নি তীর্থে তীর্থে, নগরে পল্লীতে, শত সহস্র অজ্ঞাত অখ্যাত স্থানে? দ্বিসহস্রাধিক-বর্ষ-ব্যাপী হিন্দু

বৌদ্ধ জৈন রূপকলায় তারই ইতিহাস সাকার, প্রত্যক্ষ। সেই রূপকলার অনন্ত বৈচিত্র্যের ভিতরে ভিতরে একটি ঐক্য অনুস্যূত আছে। এমন-কি, অনবদ্য পুরুষ মূর্তির যে ধড়টা পাওয়া গেছে হরাপ্পায়, লাল বেলে পাথরের, যতই তা বাস্তবানুগ মনে হোক, আসলে তবু অনুকৃতি নয়, বাস্তবের কল্পরূপ মাত্র, এবং শরীরের মধ্যে যে সংযমিত ছন্দে প্রাণাপান নিশ্বসিত তারও একটি অদ্ভুত ব্যঞ্জনা রয়েছে ঐ রূপ-কল্পনায় —বিদেশী পণ্ডিতেরাই তা স্বীকার করেন। গ্রীক বা রোমক শিল্পাদর্শের সঙ্গে এর মিল নেই, যেমন মিল নেই পরবর্তী[৩] শিল্পেরও, এ দেশে যা চক্রবর্তী সম্রাট্ অশোকের সময় থেকে শুরু হল। অথচ সিন্ধুশিল্পে ও মৌর্যশিল্পে অত্যন্ত মিল আছে যে, খৃস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে স্থাপিত লৌড়িয়া-নন্দনগড় রামপূর্বা অথবা সারনাথ স্তম্ভের শীর্ষে বা গাত্রে ক্ষোদিত বা উৎকীর্ণ হস্তী হয় সিংহ বৃষভ মূর্তিগুলি দেখলেই অনায়াসে বলা যায়। এশিয়ার প্রাক্কালীন বা সমকালীন অন্য মূর্তিকলার সঙ্গে যদিবা কোনো সাদৃশ্য থাকে, পাশ্চাত্য শিল্পের সঙ্গে তার সাজাত্য-কল্পনা অনাবশ্যক ও অনুচিত। গান্ধার শিল্পকেও 'প্রক্ষিপ্ত' বলা যায় না কি? 'ভারতীয়রা যবনশিল্পে হাত মক্স করেছিল' না ভেবে, আগন্তুক ও উপান্তবাসী যবনেরা ভারতশিল্প— যে শিল্পের ভাবনা ভঙ্গী ও আঙ্গিক সিন্ধুসভ্যতার কাল থেকেই চলে আসছে কখনো প্রস্তরে কখনো মৃত্তিকায় ও কাষ্ঠে— যবনেরাই ভারত-শিল্প আয়ত্ত করতে চেষ্টা করছে, পারছে না, ফলে ঐ অপরিণত কলার উদ্ভব, এমন ভাবতেই বা দোষ কী?[৪] ভারতের নিজস্ব প্রতিভা আপনার স্বাভাবিক জীবন-ধর্মে ই কালে ওটিকে সম্পূর্ণ জীর্ণ করে নিয়েছে, তক্ষশিলায় আফগানিস্থানে তারও প্রচুর প্রমাণ আবিষ্কৃত হয়েছে।

৩ অন্তরবর্তী ন্যূনাধিক সহস্রবর্ষের শিল্পসৃষ্টির সাক্ষ্য প্রমাণ বিশেষ কিছু আজও পাওয়া যায় না। পরে পাওয়া যাবে না তার নিশ্চয়তা কী আছে? আর, না পাওয়াতে ঠিক কী প্রমাণিত হয় বলতে পারি নে। যা হোক, পণ্ডিতেরা এই সময়টিকে বৈদিক ব'লে গণনা করেন, ভারতভূমিতে, বিশেষতঃ আর্যাবর্তে আর্য- প্রভূত্বের ও প্রভাবের কাল।

৪ একই শিল্পশরীরে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দুটি সভ্যতার দুরকম আদর্শ মেলাতে না পারাতেই গান্ধারশিল্পের উদ্ভব, তার অত্যাধুনিক প্রমাণ পেলাম মদুরাই জেলার কাম্বাম ব'লে ছোটো একটি শহরে। ১৯১৮ খৃস্টাব্দে সেখানকার এক অখ্যাত মন্দিরের অত্যুচ্চ গোপুরম্ গান্ধার-দেবদেবীতে ভূষিত করেছেন যে গ্রাম্য কারিগর, গান্ধারশিল্পে তাঁর অভিরুচি বা শিক্ষা দূরে থাক্, ঐ শব্দটিও হয়তো তিনি শোনেন নি। তবে অনায়াসেই অনুমান করা যায়, পরম্পরাগত শিল্পে যখন দেশের লোকের সম্পূর্ণ অনাদর আর কারিগরেরও অনভ্যাস, যখন বিলাতি শিল্প আর ফোটোগ্রাফ মনোহরণ করেছে সকলেরই, তখন দেশী শরীরে বিদেশী 'প্রাণ'দানের চেষ্টা হবে না কেন— তারই ফলে এই নব 'অবদান', কাম্বামে শুধু নয়, অনেক জায়গাতেই, অনেক নামে ও রূপে।

২

সমগ্র ভারতসংস্কৃতি দূরে থাক্, তাবৎ ভারতীয় রূপকলারও জন্ম ও কর্মের আনুপূর্বিক বিবরণ দিতে বসি নি। সে সুযোগ ও সাধ্য নেই। তবে সূচনাতেই বলেছি, বিশাল এই ভারতবর্ষের যে-কোনো জায়গার মাটি জল ছুঁয়েই বলব, বার বার বলব, নিখিল ভারততীর্থের স্পর্শ আমি পেলাম। আরও বলতে হয়েছে, ভারতভূমিকে পূর্বে পশ্চিমে, বিশেষতঃ উত্তরে দক্ষিণে, এক ও অখণ্ড ব'লে জানাই প্রকৃত জানা। ভারতভারতীর অকলঙ্ক অতুলনীয় প্রতিমা ভারতের রূপকলায়; অপলক দৃষ্টিতে তার একটি অংশের ভিতরেও তার সমগ্র সত্তাকে অনুভব করা যায়। স্থাপত্য ও মূর্তিকলার সুবিস্তার ক্ষেত্র থেকে চোখ ফিরিয়ে, একমাত্র চিত্রকলা সম্পর্কেও যদি অবহিত হই তবে দেখতে পাই একটি বিস্ময়কর উৎকর্ষের ক্রমোচ্ছিন্ন প্রকাশ অজন্তা-বাগের গিরিগুহাবলীতে। খৃস্টপূর্ব প্রথম থেকে খৃস্টোত্তর সপ্তম শতক পর্যন্ত প্রায় আট শত বৎসরের এই চিত্রধারা। অজন্তার দশ-সংখ্যক গুহায়[৫] ছদন্তজাতক চিত্রে তার যা আদিম রূপ তাকেও অসংস্কৃত বা অনিপুণ বলা যায় না। ফলতঃ, বৈদিক ঋষি যেমন বলেছেন উষাকে লক্ষ্য ক'রে— পারে গিয়েছেন অসংখ্য উষা, তাঁদেরই ইনি অনুসারিণী— পরে যাঁরা আসবেন শাশ্বত কাল ধ'রে তাঁদের ইনি প্রথমা— এই উষা। মানুষী সৃষ্টি, অবশ্য, প্রাকৃতিক ব্যাপারের মতো সহজ-সম্পূর্ণ নয়; উর্বশীর মতো জন্মমুহূর্তেই পূর্ণযৌবনে প্রকটিত নয়। অজন্তা-পূর্ব 'সহস্র' বর্ষের সাধনা সম্পর্কে সন্দেহের কোনো কারণ নেই, নিদর্শনও নেই। মাত্র আট শত বৎসরের আবিষ্কৃত পরম্পরা, তার সাধনা যেমন সিদ্ধিও তদুপযোগী। তার সৌন্দর্যাবদান, আরও তো সহস্র বৎসর অতীত হয়েছে, আজও অম্লান, অনিঃশেষ।[৬] ভারতীয় চিত্রকলার ক্লাসিক বা ধ্রুবপদী রীতির সাক্ষাৎ পাই অজন্তা-বাগের এই উন্নত অভিজাত রূপকল্পনায়। 'বৌদ্ধ' বিশেষণে ভূষিত করে তার সম্যক্ পরিচয় বা বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। শাক্যকুলোদ্ভব বুদ্ধদেবের যে ধর্মমতে ও সাধনপন্থায় সর্বৈব নির্বাণই ছিল ঋজুলক্ষ্য বিষয়, সদসদ্‌বিচার ও শীলধর্ম-আচরণই ছিল মুখ্য উপায়, জাগতিক জীবনের একান্ত অস্বীকারেই তার সূচনা ও শেষ। সমস্ত-এশিয়া-ব্যাপী এবং বহুশতাব্দব্যাপী অপরিসীম উদ্যম, অশেষ কর্মপ্রবাহ, চৈত্য বিহার কাব্য কলা— স্থাপত্য মূর্তি চিত্র— মানব-ইতিহাসে যার তুলনা মেলে না— এ-সবের সৃজন ও পোষণ সম্ভবপর হয় কেমন

৫ অজন্তাতীর্থযাত্রী যে ক্রমে একটির পর আর-একটি গুহায় উত্তীর্ণ হন সেই ক্রমেই গুহাগুলির সংখ্যা কল্পিত। সংখ্যাদ্বারা গুহা-খোদাইয়ের কালক্রম সূচিত হচ্ছে না। গুহা-খোদাইয়ের ও চিত্রাঙ্কনের কাল নিয়ে পণ্ডিতে পণ্ডিতে সামান্য মতভেদ থাকতেও পারে।

৬ অজন্তা চিত্র-সম্পর্কে অপ্রত্যাশিত নূতন তথ্য অথবা তত্ত্ব আমাদের জ্ঞানগোচর হয়েছে

সম্প্রতি প্রকাশিত একখানি পুস্তকে—

'অজন্তার গুহাচিত্রে চীনে এবং পারসীক চিত্ররীতির প্রভাব যে খুব বেশী ছিল তার কথা আগে লিখেছি। এটা খুবই সম্ভব যে ১৬, ১৭, ১ ও ২ নং গুহার চিত্র যখন আঁকা হয় তখন চীন থেকে বৌদ্ধ শিল্পীরা এসে এই সব চিত্রনির্মাণে অংশগ্রহণ করেন। কারণ, মেঘ, বোধিসত্ত্বদের গ্রুপ, **অপ্সর, কিন্নরদের** ছবির রীতি, **পুরুষদের** দেহ আঁকার রীতি, রঙের বিন্যাসরীতি প্রায় চীনে, মুখের ও শরীরের আদলে চীনে এবং পারসীক ছাপ সুস্পষ্ট। **কিন্তু অজন্তার সব ছবিই নিশ্চয়ই চীনে শিল্পীরা আঁকেন নি বা করেন নি।** … … … 'একটি ধারা অজন্তার চিত্ররীতি, বিষয়-বিন্যাস, স্পেস্ বা জায়গা ছাড়া ও রাখার সমন্বয় সাধন, এবং গ্রুপ কম্পোজিশনের মধ্যে সুস্পষ্ট, এই ধারায় চীনে মেজাজ খুবই প্রকট। পরিষ্কার বোঝা যায় চীনে বা পারসীক চিত্রকলায় শিক্ষিত দীক্ষিত শিল্পী নিশ্চয় কাজ করেছেন।'

অজ্ঞতাবশতঃ নিজের চোখকেও বিশ্বাস হয় না, তাই আমরাই স্থূলাক্ষর ব্যবহার করেছি। নইলে পুস্তক যিনি লিখেছেন তাঁর বিষয়জ্ঞান এবং ভাষাজ্ঞান উভয়ই সূক্ষ্ম। প্রথমে বলেছেন চীনের শিল্পীরা এসে 'অংশগ্রহণ' করেছেন, পরে বুঝি বললেন 'ভারতীয়েরা অংশগ্রহণ করেন নি এমন নয়'। আমরা বলি, অন্তত রঙটা ঘ'ষে দেওয়া, তুলিটা এগিয়ে দেওয়া, তাও তো করেছেন? হায়, চাণক্য কেন ব'লে যান নি 'তাবচ্চ শোভতে বিদ্বান্ যাবৎ কিঞ্চিন্ন ভাষতে'? তা হলে আমাদের তো বাধা থাকত না যা খুশি বলবার এবং লেখবার (এখনো বলি এবং লিখি, তবে তার বিশেষ ন্যায্যতা নেই)— যখন বলেন নি, তখন উদ্ধৃত মন্তব্যে বা সিদ্ধান্তে যথার্থ ভারতশিল্পবিদ্ পণ্ডিতগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করব, তাঁরা যেন অখণ্ড মৌনব্রত পালন না ক'রে বিষয়টি আমাদের ভালো ক'রে বুঝিয়ে দেন। কারণ, ক্যাবলা বলেছিল বটে, 'আমি গাঁজা খাই নে, আমার হাতে কেউ খেয়ে গেছে।' সেটা আত্মদোষখণ্ডনে, সুতরাং দোষের নয়। আমরা যেন তারই অনুকরণ না ক'রে বসি উল্টো মৎলবে, কি না, জাতীয় বিদ্যা ও প্রতিভার তিরস্করণে। উপযুক্ত তথ্য ও বিচারপদ্ধতি যদি না থাকে, সে অপরাধের ক্ষালন হবে কি কোনো কালে? অজন্তা-গুহাচিত্র সম্পর্কে একজন বিদেশী পণ্ডিত যা বলেছেন আপাতত তাই তুলে দিলাম—

Nowhere else in India but at Ajanta do we find such a complete statement of indivisible union of what in the West is referred to as sacred and secular art....... The paintings [Ajanta cave paintings] and sculptures of Gupta India are more than prototypes for the religious art of Asia ; they occupy a position corresponding to that of Greek and Roman art in the West. The perfection and balance achieved in India of the fourth and fifth centuries recommended themselves as the final solution of problems of form and content in religious art that could not be improved on.

—*Benjamin Rowland : The Art & Architecture of India*

করে ? ফলতঃ, জীবন-প্রত্যাখ্যান থেকেই জীবনের এ অনন্ত ঐশ্বর্য উদ্‌ভূত হয় নি। জীবনে অনাসক্ত অনুরাগ, পরিশুদ্ধ প্রীতি, অহংশূন্য ভাব— অন্য নাম তার মৈত্রী। বৌদ্ধধর্মের পরবর্তী বিকাশে, মহাযানে, বজ্রযানে, মানুষের বুদ্ধিকে শুধু নয়, মানুষের হৃদয়কেও জাগ্রত করেছে, সক্রিয় সচল দিব্যচক্ষু করেছে। শাক্যমুনির আসল মত ও পথ আচ্ছন্ন হয়েছে বা প্রকাশ পেয়েছে সে হল স্বতন্ত্র কথা। নূতন ধ্যান ধারণা সাধনপদ্ধতি সমস্ত কোথা থেকে গজিয়ে উঠল সে আলোচনাও অপ্রাসঙ্গিক। স্পষ্টই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে, যে মহাযানমতে লোক লোকান্তর পূর্ণ করে দেবদেবীর কোনো সংখ্যা নেই, পরমকারুণিক বুদ্ধও যুগে যুগে অবতার, জগতে জগতে অচিন্ত্য-বিভূতি-মণ্ডিত, তারই প্রেরণায়, তারই জ্ঞানাঞ্জন-প্রয়োগে, বৌদ্ধ-শিল্পকলারও পরম উৎকর্ষসীমা। জীবনকে সম্পূর্ণ অস্বীকার ক'রে, সন্ন্যাসকেই মনো-বুদ্ধির একাগ্রলক্ষ্য ক'রে, আর্ট্ হয় নি আর হতেও পারে না। শিবকে সংসারে ফিরে আসতে হয়েছে, আর বুদ্ধকেও। সেখানে সত্য হয়ে উঠেছে সেই বৈদিক ঋষির দিব্যদর্শন যিনি বলছেন : সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।- তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ। — স্পষ্টই বলেছেন : কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ। কাজ ক'রে ইহলোকে শতবর্ষ বেঁচে থাকতে ইচ্ছা করবে। এ'কে কি বুদ্ধের, তেমনি শঙ্করেরও, যিনি কর্ম বলতেই শাস্ত্রপাঠ পুজা হোম বোঝাবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন, এঁদের পরাভব বলব না ? নারায়ণ বা নরোত্তমের লীলা অচিন্তনীয়। এই পর্যন্ত জানি, লৌকিক আর অলৌকিক, বাস্তবিক ও আধ্যাত্মিক, উভয়ের অপূর্ব সমন্বয়-সাধনেই অজন্তা-বাগের ধ্রুব চিত্ররীতি। জীবনকে অস্বীকার করা নয়, জীবনকে পরিশুদ্ধ মনোবুদ্ধিতে গ্রহণ, জাগতিক জীবনের অতীত অধ্যাত্মের সঙ্গে তাকে মিলিত করে দেখা— ভারতের হিন্দু বৌদ্ধ জৈন যেখানে যা-কিছু উৎকৃষ্ট শিল্পসৃষ্টি হয়েছে, সকলেরই ঐ একই সাধনা এবং সিদ্ধিও অল্প নয়। যেখানে সমন্বয় হয়েছে, সেখানেই সাধনার সিদ্ধি, সেখানে ঐ রূপকলাকে ভারতীয় বলাই সত্য ও সার্থক। জীবনের সুখদুঃখ-ভূয়িষ্ঠ আনন্দ ও আবেগ একটি আন্তরিক শান্তিতে ও কল্যাণে বিধৃত, এই হল অজন্তার আসল বক্তব্য। পরম প্রেম ও করুণা অনন্ত জন্মে জন্মে জীবের 'স্বাভাবিক' অজ্ঞানে ও জড়ত্বে প্রহত হয়ে কেবলই তাকে ক্ষয় করতে চাইছে, এই হল জাতককাহিনীর মর্ম। ক্ষীণালোক গুহায় গুহায়, প্রাচীরে প্রাচীরে, অনিবন্ধ বিন্যাসকৌশলে, এক ও অবিচ্ছেদ্য ভাবেই তা আমাদের গোচর হয় যখন চোখ বুজে দেখি তার রূপ— নিত্য-আন্দোলিত এক চেতনাসিন্ধু, ঢেউয়ের পর ঢেউ কেবলই উঠছে পড়ছে। চোখ চেয়ে দেখে দেখে এও বুঝতে পারি, বিশেষভাবে ভাস্কর্যের দেশ এই ভারতবর্ষ। স্বভাবের অনুকরণ না ক'রেও রূপে রূপে তাই এমন গড়ন। ছায়াসুষমার প্রয়োগ যেখানে বিরল, এমন-কি অনুপস্থিত, সেখানেও

ছদ্দন্ত জাতক · দশম গুহা · অজন্তা · খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দ ; পুরাতন প্রতিচিত্র -অনুযায়ী

শ্রীনন্দলাল বসু -অঙ্কিত : নটীর পূজা ॥ চীনাভবন । শান্তিনিকেতন ॥ আয়তন : ২৮′ × ৪′ ফুট

শোভাযাত্রা ॥ বাগ গুহা ॥ খৃষ্টোত্তর সপ্তম শতাব্দ

পঞ্চপাণ্ডবের মহাপ্রস্থান । আয়তন : ১৭´ × ৩´ ফুট

ভগবান্ বুদ্ধ

রেখার প্রাণস্পন্দনে ও সার্থক ভঙ্গীতে সেই একই গড়নের ব্যঞ্জনা। বুঝতে পারি কেন বলেছেন শাস্ত্রকার, সার্থক রূপকল্পনা করতে হলে জানা চাই নৃত্য।[৭] কারণ, নৃত্য যে কেবলই ছন্দ; আকারের নিজস্ব ভাষা, শরীরের গতিচ্ছন্দ দিয়েই অশরীরী দুঃখসুখ ভাবনা-অনুভব রাগদ্বেষ কামনাকল্পনার অপরূপ প্রকাশ। মূর্তি বা চিত্রও সব কথা, কথার অতীত কথা, নিঃশেষে বলতে পারে সুষম ছন্দে। যে ছন্দে ন্যূনতা নেই, আতিশয্য নেই, এতটুকু পদস্খলন নেই, আর গতি ও স্থিতির আশ্চর্য সামঞ্জস্য আছে প্রতি পদে। শিল্পী এই ছন্দ চেতনা দিয়ে জানবেন আর দেহ দিয়েও। তাই বুঝি নৃত্যের অনুশীলন বিহিত হয়েছে। অজন্তা-চিত্রশৈলীতে রূপসমস্ত অপূর্ব ছন্দোগুণেই নিয়ত স্থির অথচ গতিশীল। প্রসঙ্গান্তরে ব'লে থাকব, এই ছন্দই অকৃত্রিম। কেননা, ছন্দ'কে শিল্পী শরীর দিয়েই জানছেন, শরীরে শরীরে ভাবনাকল্পনাযোগে ও ধ্যানযোগে প্রবিষ্ট হয়েই জানছেন— মানসিক কসরতে তিনি কোনো আজগুবি জগৎ বানিয়ে তুলছেন না। ইন্দ্রিয়গোচরকে মনোগোচর আর মনোগোচরকে চেতনাগোচর করতে হলে যেটুকু রূপান্তর অবশ্যম্ভাবী, এক সৃষ্টির আর-এক সৃষ্টিতে উত্তরণের স্বতঃসিদ্ধ প্রক্রিয়ায়, তার বেশি কিছুই এখানে নেই। শিল্পী স্বভাবের এবং সংসারের অতি নিকটেই আছেন, জড়িত হয়ে নেই, অন্তরঙ্গ হয়ে আছেন, দূরত্ব নেই ব'লেই মডেল খাড়া ক'রে মাপজোখ করতে হয় নি অথবা ইজেল ঘাড়ে ক'রেও মাঠে ঘাটে আনাগোনা একান্ত অনাবশ্যক হয়েছে। মানুষ বা প্রকৃতি অজন্তা-ভিত্তিচিত্রকারের চোখের সামনে রয়েছে সর্বদা, প্রাণের ভিতরে— তাই তাঁর রূপকল্পনায় যেমন সত্যতা তেমনি সাহস, আর তেমনি সাচ্ছন্দ্য। পাঁচ-হাত-ফের্তা রূপের কারবারী হলে এমনটা কখনোই হ'ত না। সে রূপের হয় দেহ থাকত না, নয়তো প্রাণ। অসত্য বা ছন্দোহীন হ'ত। প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও ধ্যানঘন উপলব্ধি, অজন্তা-চিত্রকারের কাজের এও একটি সামান্য লক্ষণ বা অন্তর্নিহিত গুণ বলা যেতে পারে।

কালধর্মে বা অন্য কোনোরকমে অজন্তা-বাগের চিত্রকৃতির কিছুই যদি আজ অবশিষ্ট না থাকত, তা হলে এতই বিশেষ্য বিশেষণে রচিত এবং ভূষিত করে যা নির্দেশ করছি, কোনোক্রমে তা হৃদয়ঙ্গম হ'ত না। সুখের বিষয়, নির্জন গিরিপ্রস্থে বগোড়া আজও কলশব্দে বহমানা, অর্ধচন্দ্রাকারে ব্যূহিত পাহাড়গুলি আজও ঋতুতে ঋতুতে রক্ত পীত মরকত শ্যাম নানাবর্ণ পরিচ্ছদে নানাভাবে শোভিত, পাখি ডাকছে, ফুল ফুটছে, ভিড় দেখে ভিড় বাড়াতে আসছে বহুজন, চটুল পায়ে ঘুরে ফিরে যাচ্ছে চড়াই উৎরাই সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে, ফোটো তুলছে, শিল্পীও আসছে, শিল্পভাবক

[৭] পূর্ববর্তী 'চিত্র' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। পৃ ১২

স্বপ্নদৃষ্টি কিশোর বা যুবা, নেপাল তিব্বত চীন থেকে কদাচিৎ কোনো ভক্ত উপাসক বা উপাসিকা, দেখেছি ভোরবেলা তাদের চৈত্যগুহাকুট্টিমের ধুলা ঝাঁট দিতে, ধূপদীপ জ্বেলে জ্বেলে গুহা থেকে গুহায় ফিরতে, সম্ভব হলে অবুঝ কৌতূহলী জনতাকে এড়িয়ে পরমকারুণিকের সামনে নতজানু হয়ে মন্ত্রপাঠ করছে, এবং এও শুনেছি সন্ধ্যায় শেষ যাত্রীবাহী যান চলে গেছে যখন ক্যামেরা কাঁধে শেষ টুরিস্ট, আর চায়ের দোকানদার, শুক্লা চতুর্থীর চাঁদটি সবে দেখা দিয়েছে পাহাড়ের মাথায় আর তারাও ফুটে উঠছে একে একে, রাত্রিচর নেকড়ে বা ভাল্লুক বেরোল ঝোপ জঙ্গল থেকে, শিউলির মৃদুগন্ধ জেগেছে, জোনাকির জৌলুষ খোলে নি সবুজ অন্ধকারে, আশ্রয়হীনা বিদেশী ভিক্ষুণীকে তখন বাধ্য হয়েই থাকতে হয়েছে রাত্রির পাহারাদার পাহাড়ের উপরে কোনো গুহায়— স্থিরবিদ্যুতের দ্যুতি না হলে দিনেই দেখি নে, রাত্রে আর দেখবে কী— সহস্রাধিক বৎসর পার হয়ে ঐ ভক্তিমতী নারীর মন চলে গিয়েছে কোন্ দূর অতীতে, সেখানে ধুপুচিতে ধূপ আর পঞ্চপ্রদীপে আলো জ্বলছে, মন্ত্রপাঠ আর স্বাধ্যায়ের বিরতি নেই, পুষ্পে চন্দনে ও উচ্ছ্রিত চামরবীজনে পূজা হচ্ছে, ধ্বজা উড়ছে, শঙ্খঘণ্টা বাজছে, বিদ্যার্থী শ্রমণ অর্হৎ মিলে বহু শত লোক বিহারে বিহারে বাস করছে, নদীতে ওঠা-নামার পৈঁঠেগুলি মসৃণ ও জলসিক্ত, পাহাড়ে ওঠা-নামার নানা সরণী বেয়ে নিত্যনৈমিত্তিক ব্রতে পার্বণে আসে যায় নগরপল্লীর নরনারী শিল্পী শ্রেষ্ঠী রাজা ও রাজচক্রবর্তী, এবং সকলেরই জীবনযাত্রার সব দৈন্য ঐশ্বর্যশালী ক'রে, সব ফাঁক পূর্ণ ক'রে রাত্রিদিন রয়েছে তথাগতের অলৌকিক সত্তা, চৈত্যে বিহারে বিভিন্ন অভিজ্ঞান ও মূর্তি সেই কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় অবিরত— ত্রিশরণমন্ত্র জপ ক'রে যে আজ রাত জাগছে শূন্য গিরিগুহায়, জন্মে জন্মান্তরে এইখানেই আসে নি সে দীক্ষা বা শিক্ষা নিতে?— হয়তো শোকতাপিত তার নারীহৃদয়, সেও কি জুড়িয়ে গেল না ভগবানের অমৃতময় করস্পর্শে? কী জানি! রৌদ্রালোকিত দিনে দুপুরে এ-সব কল্পনা টেকে না। মনে উদয় হলেও বেশিক্ষণ স্থান পায় না এই চিন্তা, যে, পণ্ডিত বা মূর্খ, অবোধ বা বিলাসী, গড্ডলিকা-স্রোতে আসবে নরনারী, দেখে যাবে পাহারা-বসানো জাদুঘরগুলি, বড়ো বেশি হয় তো ক্ষণিক বিস্ময়— তা ছাড়া অন্য কোনো স্থায়ী ছাপ পড়বে না অধিকাংশেরই মনে— এই উদ্দেশ্যেই খোদাই করে নি অজন্তা, আর কেটে বার করে নি কৈলাস সহস্রাধিক বৎসরের পুরাতন এক যুগ। না, কখনোই না। অক্ষুণ্ণ ধারাবাহিকতা কৈ যুগ থেকে যুগান্তরে? মনে মনে সেইটেই খুঁজে ফিরি সারা ভারতবর্ষে। কখনো বা বাক্স বিছানা বেঁধে উত্তরে দক্ষিণে পাড়ি দিই, ভ্রমণবিলাসী হিসাবে নাম রেখে যাব এ আকাঙ্ক্ষা থাকে না।

জাতির জীবনযাত্রার ধারাবাহিকতা খুঁজে বার করা তবু কঠিন। যদিবা নিজের

চোখে দেখেছি, অজন্তার তূলির লেখায় বা উৎকীর্ণ 'ছবি'তে যে অশ্বশকট সে'ই রয়েছে আজও অজন্তার অদূরে ফর্দাপুর গাঁয়ের গলির ভিতরে। পুঁথিতেও পড়ি, সিন্ধুসভ্যতার পাঁচ হাজার বছরের পুরোনো পোড়ানো মৃৎপাত্রের যে নমুনা পাওয়া গেছে, বিশ্বজনকে অপ্রস্তুত করবে ব'লেই তার মিল নেই ইরান মেসোপোটেমিয়ার সুপ্রাচীন পাত্রাদির সঙ্গে, অথচ পশ্চিম ভারতের কোনো কোনো পল্লীতে অনুরূপ পোড়ামাটির কাজ আজও দেখা যায়— দেখা যায় হরাপ্পা মহেঞ্জদারো আবিষ্কারের আগে থেকেই। কিন্তু, বিন্দুতে সিন্ধুদর্শনের ক্ষমতা না থাকলে, এমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিদর্শনে বহু সহস্র বর্ষের পরম্পরাকে মনে ধারণা করা যায় কি? বর্তমান লেখকের সাধ্যে কুলায় না সে কথা সত্য। তবু, মনীষী-মহাজন-প্রদর্শিত পথে ভারতীয় চিত্ররীতির ত্রিলোকপ্লাবিনী গঙ্গাধারার আরো কিছুদূর যদি অনুগমন করতে পারি সে বিষয়ে যত্ন করা চাই।

ত্রিপথগা সুরধুনীর সঙ্গে তুলনা অহেতু নয়। স্বর্গ-মর্ত-রসাতল-গামিনী সঞ্জীবনী ধারার মতো এই রূপরীতি, প্রধান তিনটি ধারায় ভারতভূমির উত্তরে মধ্যে ও দক্ষিণে বহমানা। অজন্তা-বাগ-বাদামীর তটে তটে গুহায় গুহায় অশব্দ কল-সংগীতের ধ্বনি প্রতিধ্বনি জাগিয়ে খৃস্টপূর্ব সময় থেকে খৃস্টীয় সপ্তম শতাব্দ পর্যন্ত যে ধারা প্রবাহিত সেইটিই মুখ্যাতিমুখ্যা ও পরমপাবনী। এই গঙ্গাবারি স্বর্ণ বা রজত -ঘটে বাহিত হয়ে, অথবা না জানি কোন্ ফল্গুপ্রবাহে, দূর থেকে আরো দূরে পৌঁছেচে সিংহলে, বর্মায়, বাংলায়, নেপালে, তিব্বতে, এমন-কি ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমা পার হয়ে আফগানিস্থানে ও মহাচীনে। উত্তরাপথে প্রবাহিত আর একটি ধারাকে বলা চলে লোকচিত্তের ও লোকচিত্রের ধারা। শ্রেষ্ঠী-সামন্ত রাজা-মহারাজা আমীর-ওমরাহের মনোরঞ্জন ক'রে গোলকুণ্ডায়[৮], বীজাপুরে[৮], বাংলায়[৯], উড়িষ্যায়[৮], গুজরাটে, রাজপুতনায়, পঞ্জাবে, কাশ্মীর ও কাংড়া উপত্যকায়, নানা বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়ে, রূপ রেখা রঞ্জনের নানা উৎকর্ষের বিকাশ ক'রে খৃস্টীয়

[৮] উত্তরাপথের অংশ নয় সন্দেহ নেই। উত্তরাপথেই যার প্রধান প্রবাহ তারই শাখাবিশেষ, ইতিহাসের অমোঘ নির্দেশে, বিন্ধ্যের অপর পারে কখনো কোনো দিকে প্রসারিত হয় নি এমন তো নয়।

[৯] বাংলায় পালরাজাদের সময়ের পুঁথিচিত্রে বা এই সেদিনের কালীঘাট পটে অজন্তা-রীতির সাজাত্য আছে। কিন্তু, প্রাচীন ঐ পুঁথিচিত্র বা কালীঘাট-পট ছাড়াও অনুরূপ ছবি আঁকবার রীতি পদ্ধতি এ অঞ্চলে কোথাও কোথাও ছিল। ভারতের মুখ্য চিত্ররীতিগুলির পরিচয় নিতে গিয়ে, বহু স্থলেই আমরা নানা রীতির মিশ্রণও লক্ষ্য করি। বিচিত্র ঐতিহাসিক কার্যকারণে এরূপ না হবেই বা কেন? তবে, সে সমস্তেরই বর্ণন বা বিশ্লেষণ আমাদের প্রসঙ্গ -বহির্ভূত আর সাধ্যেরও অতিরিক্ত।

ঊনবিংশ শতাব্দ পর্যন্ত পরিণাম থেকে পরিণামান্তরে পৌঁছেও, কখনো এটি লোকচিত্তের তপ্তস্পর্শসঞ্জাত সহজ সজীবতা হারায় নি— আবার, মঠে মন্দিরে মহিমময় স্থাপত্যের ভূমিকায় প্রশান্ত প্রশস্ত ভিত্তিতলে নিজের জন্ত একটি প্রীতি ও পূজা -মিশ্রিত সম্ভ্রমের স্থানও করে নিতে পারে নি। পুঁথিতে, পাটায়, পটে, টাঙানো বা গুটোনো ছবিতে নানাভাবে তার বিকাশ। রাজস্থানে ঘুরে ঘুরে দেখি নি ; ভরতপুর রাজাদের স্থাপত্যকীর্তি আছে মথুরামণ্ডলে ছোটো গোবর্ধন শহরে ও তার আশে-পাশে— সেখানে গুম্বজের ভিতর-ছাদে কিম্বা দেয়ালের উপর-দিকে যে-সব রাম বা কৃষ্ণ -লীলার ছবি দেখা যায়, হাল্কা ও ফিকে তার রূপরসের আবেদন। দুই আয়তনের রেখাগতপ্রাণ বর্ণবাহারী রূপকল্পনা পুঁথিচিত্রণের পক্ষে যতটা উপযোগী ভিত্তিচিত্রণের পক্ষে তেমন নয়, প্রয়োজনমত অতিকৃত হলেও। তবে যদি সেগুলির উপর নূতন করে তেল-রঙের তূলি বুলোনো চলে (আমাদের দেশে এমন মূঢ়তার আজও কোনো অসম্ভাব নেই) আর্ট স্কুল-উত্তীর্ণ কৃতী চিত্রকর ধ'রে, অনেক বেশি করে চোখে তো পড়বেই, কিন্তু শ্যাম আর কুল উভয়ই তার যাবে।

দিল্লি-আগ্রায় মোগল রাজশক্তির অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে মোগল চিত্ররীতিরও উদয় হল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ একটি গৌরবের ভূমিকায়। ভারতচিত্ররীতিতে এসে মিশল পারসীক চিত্ররীতির ভাব ও ভঙ্গী, প্রধানতঃ আকবর বাদ্‌শার ঔদার্যে আনুকূল্যে ও উন্নত রুচির প্রেরণে। ভারত আকবরের পক্ষে প্রবাস ছিল না। ভারতভারতীর প্রসাদ পেয়েছিলেন তিনি অন্তরে। নিজের জীবনে তিনি ইস্‌লামকে মেলাতে চেয়েছিলেন হিন্দুত্বের সঙ্গে, যে হিন্দুত্বের অপরিহার্য অঙ্গ নয় হিন্দু দেবদেবী। সেজন্য কাফের ব'লেও তাঁকে গোপনে নিন্দিত হতে হয়েছিল সন্দেহ নেই। আসলে তিনি হতে চেয়েছিলেন 'মুসলমান হিন্দু'।[১০] যা হোক, পারস্য চিত্রকলার ধারা-ধরণ চিরাগত ভারতীয় চিত্ররীতিতে অঙ্গীকৃত বা অঙ্গীভূত। ভাস্কর্যসহোদর, রেখাছন্দোময়, প্রাণময়, সাহসিক ও সাবলীল যে চিত্ররীতি ছিল অজন্তায় বাগে তারই নবজন্মের নূতন প্রকাশ দেখা গেল যেন সীমাবদ্ধ পুঁথিচিত্রণের ক্ষেত্রে আর আগন্তুক নানা উপায় উপকরণ ও বিষয়বস্তুর সহযোগে। আকবরের কালের এবং তাবৎ মোগল চিত্ররীতির উৎকৃষ্ট সৃষ্টি যেগুলিকে বলা যায়, যা আমাদের মনে হয় ভারতের ধ্রুব রীতির সঙ্গে সংগত, সেখানে বিষয়বস্তুতে আছে পৌরুষ, রূপের আছে প্রাচুর্য, বিন্যাসের মুক্ত ছন্দ, গড়নের যথোচিত ওজন, রেখার বাঁধন আর মুক্তি। সংগ্রামের, শীকারের, বা উৎসব-অভিযানের দৃশ্য। আকবর-পরবর্তী

[১০] সার্থক ভাবেই, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় নিজেকে বলতেন 'খৃস্টান হিন্দু'।

চীনাভবন ভিত্তিচিত্রের অংশ । [illegible]

শ্রীনন্দলাল বসু

ওরা কাজ করে । চলচ্চিত্র । শ্রীনন্দলাল বসু

বন্যবারণসংগম

আকবর শাহী চিত্রকলা। ষোড়শ শতাব্দ। শিল্পী মহেশ ও কিশু

চিত্রকলার ক্রমিক ক্ষীণতা, দুর্বলতা, মন-ভুলানো ছবি-ছবি ভাব, উদ্দেশ্যহীন নৈপুণ্য আর ক্রমিক আড়ষ্টতা, তুলনায় আলোচনার যোগ্য। যে হৃদয়বান্ বীর্যবান্ পুরুষ নূতন সাম্রাজ্য একটা গড়ে তুলছিলেন ভারত মহাদেশে, তাঁর চাওয়া ছিল বড়ো। যেন আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপ ঘষে দিতেই, তাই এমন আশ্চর্য ব্যাপার ঘটেছিল। আসলে সে মায়াপ্রদীপ ছিল বৌদ্ধ এবং হিন্দু ভারতের মনের মণিকোঠায়। সে রূপরুচি বয়ে আসছে বহু সহস্র বৎসর পার হয়ে, দিল্লি-আগ্রার অজ্ঞাত অপরিচিত অজন্তার শৈলতটে একবার উচ্ছলিত হয়ে, পরমশান্ত তথাগতের পদাম্বুজে পুষ্পাঞ্জলি উৎক্ষেপ ক'রে।

উত্তরাপথের লোকচিত্তবাহিনী লোকচিত্রধারাতে বৈদেশিক প্রভাব কোথায় কী ভাবে মিশেছে, দেশে ও কালে মোগল চিত্রকলার সামীপ্যবশতঃ অথবা অন্য কী কারণে, সে হয়তো জানেন ভারতশিল্পতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা।

৩

ভারতচিত্রকলার অন্য এক বিশিষ্ট ধারার সাক্ষাৎ পেয়েছি কেরলে। ভারতের স্বাধীনতালাভের পর, প্রধানতঃ ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিন এই দেশীয় রাজ্য দুটির সমবায়ে নূতন অঙ্গরাজ্য হিসাবে সেদিন মাত্র গঠিত হয়েছে; ফলে সম্রাট্ অশোকের সময়ের নাম ও পরিচয় আবার ফিরে এসেছে। যতদূর জানি কেরলের একই ভাষা, একরূপ আচার বিচার ও সংস্কৃতি, অর্থাৎ, মহাভারতের অঙ্গীভূত হয়ে একই অতীত আর একই ভবিষ্যৎ। আচরিত ধর্মের হিসাব যদি নেওয়া যায়, শুনেছি শতকরা ৪০ জন খৃস্টান, ৪০ জন হিন্দু আর বাদ-বাকি মুসলমান। শ্রুতি-নির্ভর তথ্যে কিছু ভুলও থাকতে পারে, প্রয়োজনীয় পুঁথিপত্র দেখা হয় নি। গিরিবাহুবেষ্টিত নারিকেলগুবাকবীজিত নতোন্নত সজল শ্যামল এই দেশ— নীল সমুদ্রের মুখোমুখি। রৌদ্র বৃষ্টি বায়ুর লুকোচুরি খেলার শেষ নেই, ফুলফলের বৈচিত্র্য বুঝি অনন্ত, আর সমুদ্রের অনুত্তরঙ্গ একটি দীঘল অংশ কেরলের মাটির বাঁধনে বন্দী হয়ে হৃদয়ে ধারণ করেছে— কূলে কূলে আনত নারিকেলবনের এবং ফাঁকে ফাঁকে লাল-টালি-ছাওয়া বিবিধ গড়নের বাড়িগুলির শিহরিত প্রতিবিম্ব। লবণহ্রদে কাঁপতে-কাঁপতেও কী জানি কতক্ষণ স্থায়ী হয় প্রতিবিম্ব। কারণ, অকূল সমুদ্র না হলেও সুবিস্তৃত জলরাশি তো বটেই, মাঝদরিয়ায় তরঙ্গ ওঠেই, কূলে কূলে প্রতিহত হয়, এক ঘাট ছেড়ে অন্য ঘাট লক্ষ্য ক'রে জলে বিলি কেটে ঝুক্ ঝুক্ শব্দে চলে যাত্রীবাহী স্টীমার, এ কূলের গাছগুলি গোণা যায়, ও কূলে সবুজ একাকার, সামনেও এক-ফালি ছোটো দ্বীপ আর তারই ডাইনে বাঁয়ে দূরবিসর্পিত জলরাশি নীল আকাশে মিশেছে, কখনো মেঘ কালো হয়ে আসে, জল-বুলোনো

চওড়া তুলির অবলেপে যেন তখনি আবার ফিকে হয়ে যায়, অতিদূর বৃষ্টির খবর নিয়ে একটি ঠাণ্ডা বাতাস বয়, ছুটতে ছুটতে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ে উনপঞ্চাশ পবন, পিছন পিছন বৃষ্টিও এসে পড়ে, ইতস্তত: মুক্তাবৃষ্টি, তার পরেই অজস্র ধারা-পাত, দূরের দৃশ্যের উপর চিক ফেলা হয়ে গেছে, কাছের জলতলে জলবিন্দু প'ড়ে কেবলই খই ফুটছে, ছাট-সামলানো বেসামাল পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখি বরুণকন্যাদের পুঞ্জ পুঞ্জ চিকুর প্রতিক্ষণে ঢেউ খেলিয়ে ছুটেছে যতদূর দৃষ্টি যায় (উপমা কি আছে ছাই ! আসলে, বর্ণনা হয় না)— ক্রমে স্টীমারের গতি ক'মে এল, হয়তো থেমেই যাবে। অদূর লোকালয়ে যে ছুটি কেরলকন্যা বহুক্ষণ বৃষ্টিতে ভিজে ভিজেও সরু নারিকেল-দড়ির টানা দিচ্ছিল আর পাকিয়ে নিচ্ছিল বার বার আনাগোনা ক'রে তারা তো পালিয়েছেই, আকাশমুখী বড়ো বড়ো বাঁশের আগায় ঝুলানো হাঙর-ধরা জাল কি ঐগুলি, জেলেদেরও দেখা নেই। ক্রমে অলক্ষ্য কদম ফুলের রেণু-রেণু পরাগ হাওয়ায় উড়িয়ে ছড়িয়ে দেবতা ক্ষান্ত হন, ঘাটের পর ঘাট ছেড়ে যায় বাষ্পপোত, বেলা গড়িয়ে যায়, মেঘের ফাঁক দিয়ে গ'লে প'ড়ে রক্তরবি না জানি কোথায় কূল পায়, দূরে দেখা যায় ভাইকমের ঘাট। প্রায় জলের ধারেই প্রশস্ত হাতায় সরকারী পান্থশালা। পিছনে নারিকেল-সুপারির বাগানে অন্ধকার ঘন হয়ে উঠেছে, গাছপালার মাথা ছাড়িয়ে একটি ক্রশ আঁকা রয়েছে আকাশে। সত্যই আঁকা নয়। আর, সামনে একটু গেলে, বাঁ দিকের স্টীমার-ঘাট থেকে উঠে, সোজা রাস্তা শেষ হয়েছে গিয়ে ভাইকম মন্দিরে।

না, এই ভাবেই আমাদের এট্টুমানুর, ওয়ার্‌কালা, ত্রিবান্দ্রম, শুচীন্দ্রম ও কন্যাকুমারী -ভ্রমণের কাহিনী লিপিবদ্ধ করব না। যেহেতু পারব না। আমার পাঠক-পাঠিকাগণ আশ্বস্ত হোন।··· তবুও লোভ হয়। ওয়ার্‌কালার সমুদ্রতটে পূর্ণচন্দ্রোদয় হয়েছিল সে কথা তো মিথ্যা নয়। জনার্দনমন্দিরে আরতির দেরি ছিল। নহবতের বাজনা কৈ কানে আসে নি। সমুদ্রের মন্দ্রধ্বনি কানে নিয়ে অনুচ্চ পাহাড়ে উঠছি ভাঙাচোরা রাস্তায়। দু'চারটে কাঁঠাল গাছ ছিল উঁচুনিচু ভূমিতে— ডালপালার আঁকুবাঁকু আর চিক্কণ পল্লবের উদ্‌ধৃত অঞ্জলি। ঢ্যাঙা ঢ্যাঙা নারকেল গাছগুলি স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে সবুজ ঝালর ঝুলিয়ে। ফাঁকে ফাঁকে দেখা যেতে লাগল গোল চাঁদটি, রুপালি থালায় কলঙ্কের দাগ তখনো স্পষ্ট। পাহাড়ের মাথায় অনেক ক্ষণ বসে থাকতে থাকতে চাঁদ উপরে উঠে গেল, রাত হল, ধাবমান ঢেউয়ের রেখাবলি হয়ে এল অস্পষ্ট। অনেকটা নীচে দেখছি পাথরে পাথরে আছাড় খাচ্ছে ঢেউ, থেকে থেকে ফেনায় ফেনায় সব সাদা হয়ে যাচ্ছে, বাঁ দিকের দিগন্তে মুছে-আসা কাজল-তুলির একটু টান, ডান দিকের দূর দিগন্তটিতে আকাশ আর সমুদ্র একই কৌমুদীমায়ায় মোহিত হয়ে মিলে মিশে একাকার

হয়ে গিয়েছে।—

যখন এসেছিলে অন্ধকারে
চাঁদ ওঠে নি সিন্ধুপারে।

এ হল তার বিপরীত। পূর্ণিমা আর প্রিয়জন দুটি একত্র পাওয়া যাবে না।

প্রসঙ্গ থেকে কিছু দূরে চলে এসেছি।

কেরল-চিত্রশৈলীর এমন অনন্যতা কেন, তারই আলোচনাকালে মনে রাখতে হবে, অশোক বা সমুদ্রগুপ্ত বা আকবর এপর্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তার করতে পারেন নি। প্রাচীন হিন্দুসভ্যতার বহু দোষগুণ নিয়ে, অতীত সংস্কৃতির অনেক অপূর্ব ঐশ্বর্য একান্তে লালন ক'রে, এ ছিল পৃথক্। উচ্চ বর্ণের অন্ধতায় ও অবিচারে যারা ধর্মান্তর গ্রহণ করেছিল তাদের বাদ দিয়ে, বাকি হিন্দুজনসমাজ প্রাচীন আচার-আচরণ, মত-বিশ্বাস, দেবদেবী, শিল্পকলা, কাব্যসঙ্গীত, নৃত্য-অভিনয়, সবই কতকটা অবিকৃত আকারে রাখতে পেরেছিল। পরিবর্তন হয় নি এমন তো হতেই পারে না, তবে আকস্মিক বা আত্যন্তিক হয়তো হয় নি। খৃস্টীয় প্রথম সহস্র বৎসরে আর তার পরেও, নানা সময়ে নানা রাজবংশের বিচিত্র উত্থানপতন সত্ত্বেও মনে হয়, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় রাজা ও রাজন্য -শাসিত কেরলের এই জীবনযাত্রা আপন স্বতন্ত্র লয়ে বহমান ছিল। অথচ ভারত থেকে বিচ্ছিন্নও ছিল না। বরং কালক্রমে বৌদ্ধধর্ম যখন দুর্বল ও নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ল, আচারবহুল বা কদাচারবহুল হয়ে পড়ল, নানা দিকের নানা বিরোধে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হতে বসল, তখন কেরলেরই এক অখ্যাত পল্লী কালাডি থেকে বেরিয়ে তরুণ ব্রাহ্মণ শঙ্করাচার্য খৃস্টীয় নবম শতাব্দের প্রথম পাদে সারা ভারত পরিভ্রমণ করলেন, বিচারে ও ব্যক্তিত্ববলে সমগ্র ভারতে বৌদ্ধ মত ও পথের অবজ্ঞেয়তা-প্রমাণ-পূর্বক হিন্দুর বেদ-বেদান্ত উদ্ধার করলেন, ভারতের চার কোণে চারটি মঠ স্থাপন করলেন, এবং যদিও তাঁকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলা অকারণ নয়— শিবও তো প্রচ্ছন্ন বুদ্ধ— সে যুগে ভারতভূমির ঐক্য তিনি প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করলেন। আমাদের কালে, অর্থাৎ ইংরাজ রাজশক্তির উদয়াস্তসময়ে, কোন্ শাস্ত্র কোন্ বিদ্যা কেরল ভারতকে প্রত্যর্পণ করেছে বিস্তারিত ভাবে আমাদের জানা নেই, আর আমাদের আলোচনার বিষয়ও নয়। তবে, কথাকলি নৃত্য যে কেরলের দান সে কথা জানি, যদিও সুপ্রাচীন নয়, পুরাতনই নানা বিবর্তনের ভিতর দিয়ে এই নবকলেবর পেয়েছে (বাঙালির গৌরবের হেতু এই যে, এই নৃত্যকলার সূচনায় বিশেষ প্রেরণা জুগিয়েছে জয়দেবের গীতগোবিন্দ)— এটি লক্ষ্য করেছি কথাকলি নৃত্যের যে বিস্তার, যে বল, যে পৌরুষ, অথচ যে অলংকরণপ্রাচুর্য, কেরল-চিত্ররীতিরও তাই নিয়েই অপূর্ব বিশিষ্টতা।

প্রথমেই উল্লেখযোগ্য, দক্ষিণ কেরলে স্থিত থিরুনন্দিক্করের শৈব গুহায় স্বল্পাবশিষ্ট ভিত্তিচিত্র।[১১] অষ্টম থেকে নবম শতকের মধ্যে অঙ্কিত এই ছবি অজন্তা বাগ বাদামীর অনুসরণ-পূর্বক ভারতীয় ধ্রুব রীতির সর্বব্যাপিতার এবং সম্ভবতঃ বিশেষ স্থানের বিশেষ কালের অন্য চিত্ররীতির সঙ্গে সহস্থিতির সাক্ষ্য দিচ্ছে। কেরলের উত্তরকালীন যে বিশিষ্ট চিত্ররীতি আমাদের উপস্থিত আলোচনার বিষয় (প্রাচীন কাজের নিদর্শন পাওয়া যায় নি ব'লেই এটি যে অতিপ্রাচীন কোনো রীতির ধারাবাহী নয়, এরূপ স্থির সিদ্ধান্তও তো অনুচিত হবে) আমাদের কাছে তার প্রথম আত্মপ্রকাশ আরও বহু শতাব্দ পরে। ত্রিবান্দ্রমে শ্রীপদ্মনাভস্বামী-মন্দিরের সীমানায় তিরুভম্পদী উপমন্দিরে এই চিত্র আঁকা হয়েছিল, খুব সম্ভব চতুর্দশ শতকের শেষ ভাগে। ভাইকম-কোট্টিয়ামের পথে এট্টুমানুরের শিবমন্দির, তারই গোপুরমের দেয়ালে ষোড়শবাহু নটরাজের বিস্ময়কর কল্পনা— আপন দিব্য-মণ্ডলের মধ্যে প্রমত্ত তাণ্ডবে আপনি নাচছেন অসুরদলন আবেশে আর মণ্ডলের বাইরে দাঁড়িয়ে মুগ্ধত্রস্ত দেবদেবী মুনিঋষি সিদ্ধগন্ধর্বগণ যুক্তকরে স্তবস্তুতি করছেন, বিষ্ণু বাঁশি বাজাচ্ছেন, ব্রহ্মা দু হাতের মন্দিরাতে আর কেউ বা করতালিতেই তাল দিচ্ছেন। যেমন জমাট তেমনি জোরালো আর তেমনি জীবন্ত রূপকল্পনা। চিত্রের আয়তন— ১২′×৮′ উচ্চতায়।

ভাইকমের শিবমন্দির ১৩২৯ থেকে ১৫৩৯ খৃস্টাব্দের মধ্যে কোনো সময়ে অগ্নিদাহে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পর পুনর্বার নূতন দেহ পেয়েছিল। (প্রাসাদে বা মন্দিরে আগুন লাগা এ অঞ্চলে বিরল নয়। কেননা, কেরল-স্থাপত্যে কাঠের ব্যবহার প্রচুর— কি গৃহস্থের বাড়ি কি প্রাসাদ আর কিবা মন্দির। এজন্য দ্রাবিড়-ভূমিতে অন্যত্র যেমন অত্যুচ্চ গোপুরম্পরিবৃত মন্দির দেখা যায় কেরলে তা বিরল। ব্যতিক্রম দেখেছি শ্রীপদ্মনাভস্বামীর মন্দিরে। আংশিক পাথরের আর আংশিক কাঠের ও সমতল টালির এই মন্দিরস্থাপত্য অতি নয়নাভিরাম; যেখানে উচ্চতা নেই সেখানে আছে বিস্তার, যেমন ভাইকমে।) এখানে দেবাধিষ্ঠিত গোলাকার গৃহের বাইরের দেয়ালে রয়েছে কেরল-চিত্ররীতির উৎকৃষ্ট নিদর্শনাবলি। অগ্নিদাহের পর, চতুদর্শ থেকে ষোড়শ শতকের মধ্যে কোনো সময়ে আঁকা। মন্দিরভিত্তির পর পর কুড়িটি আয়তক্ষেত্রে চল্লিশটি দেবদেবীর রূপ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

[১১] ইতিপূর্বে আমরা যে-সব চিত্র বা চিত্রণরীতির উল্লেখ করেছি, তার কিছু না কিছু নিদর্শন প্রত্যক্ষভাবে, নয়তো সাময়িক পত্রে ও পুস্তকে, সকলেরই পরিচিত মনে করি। কেরল-চিত্রকলা তেমন পরিচিত নয়। ডক্টর স্টেলা ক্রামরীশ প্রভৃতির রচনা-সমৃদ্ধ যে গ্রন্থে এ সম্পর্কে বহু বিবরণ ও চিত্র পাওয়া যাবে সেটি হল: *The Arts & Crafts of Travancore* (1948)

শিবের মন্দিরে প্রসন্ন হরিহর -কল্পনায় বোঝা যায়, বৈষ্ণব ও শৈবের মধ্যে সম্প্রীতির অভাব ছিল না। ছবিগুলি কোথাও ধূমকলঙ্কে অস্পষ্ট আর কোথাও মুছে গিয়ে রহস্যময় হলেও অধিকাংশই অটুট আছে এবং রূপকল্পনার বলিষ্ঠতায়, বর্ণরুচির ঔজ্জ্বল্যে ও অপ্রত্যাশিতের প্রকটনে, চকিত রূপরসিককে আকৃষ্ট ও নিশ্চল ক'রে তোলে। অথচ, এইখানে একটি পরম দুঃখের কথাই জানাতে হচ্ছে। মন্দিরের মালিকেরা হয়তো ভেবেছেন, এই প্রাচীন প্রাচীরচিত্রাবলি যথেষ্ট রসোজ্জ্বল নয় অথবা ভালো করে রক্ষা করবার আর কোনো উপায় নেই, তাই হাল আমলের কোনো শিক্ষানবিশ শিল্পীকে দিয়ে, জল-রঙের কাজের উপর তেল-রঙের স্থূলতূলি-অবলেপের ব্যবস্থা করেছেন। এর চেয়ে স্থূলবুদ্ধির পরিচয় আর কী হতে পারত জানি নে। পিতৃপুরুষের অমূল্য দান নষ্ট করা অত্যন্ত সহজ বৈকি, নূতন সৃষ্টি করার ক্ষমতাই শুধু দেখি নে। সুন্দরকে সুন্দরতর করার কথাই ওঠে না; কমলাসনার পদতলের পদ্ম- দলে দলে চিত্র করবে কে ? আর, রক্ষা করা ? দেয়ালে ঝামা ইঁট ঘষতে নিতান্ত মানা থাকলে, নষ্ট করার প্রকৃষ্টতর উপায় আর কী আছে ? জানি নে আমাদের এই প্রবন্ধরচনা শেষ হবার আগেই, সেকালের অতুল সৃষ্টি একালের পোস্টারবেশে আগাগোড়া মন্দির ঢেকে অট্টহাসি হাসতে থাকবে কিনা।[১২]

ভাইকম মন্দিরে আনুমানিক ষোড়শ শতাব্দে আঁকা ঐ ভিত্তিচিত্রাবলির পর, ত্রিবাঙ্কুরের পুরাতন রাজধানী পদ্মনাভপুরমের রাজপ্রাসাদে যে ছবি আঁকা হয়, যে ছবি আঁকা হয়েছিল কৃষ্ণপুরম্ প্রাসাদে, সপ্তদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দের মধ্যে' তারও বিশেষ উল্লেখ করতে হয়। স্বচক্ষে এই ছবিগুলি দেখবার সুযোগ হয় নি। মুদ্রিত প্রতিচিত্র দেখে', যেমন রচনাকালের দিক দিয়ে তেমনি রূপকল্পনার ও আঙ্গিকের বিকাশের দিক দিয়েও এই কলাসৃষ্টিকে— ভাইকম মন্দির ও ত্রিবান্দ্রমে

[১২] লেখা শেষ করার পর জানা গিয়েছে, এখনকার যে-সব মন্দিরে পূজাদি হয় বা যে স্থল সম্পূর্ণই পুরাতত্ত্ববিভাগের রক্ষণাবেক্ষণে গিয়ে পড়ে নি, সেখানকার চিত্রকৃতিকে কিছুকাল পরে পরে (২০ বা ৫০ বৎসরের ব্যবধানে ?) নবকলেবর-দানের প্রথা আছে। এজন্য বংশানুক্রমে যাঁরা কারিগর বা চিত্রকর তাঁরাই নিযুক্ত হতেন, হয়তো তাঁদের পূর্বপুরুষই দু'শো বা পাঁচ শো বছর আগে ঐ ছবি প্রথম এঁকেছিলেন। এমন প্রথার কিঞ্চিৎ অবশেষ উত্তর-ভারতেও লক্ষ্য করেছি। রেখার উপর রেখা, রঙের উপর রং বুলিয়ে যথাসাধ্য একই রূপসৃষ্টিকে শতাব্দের পর শতাব্দ উত্তীর্ণ করে দেওয়া হয়ে থাকে। এই দাগা না বুলিয়েও যদি রাখা যেত তা হলে খুবই সুখের বিষয় ছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু, এই প্রথা। বর্তমান ক্ষেত্রে আমাদের আপত্তি শুধু দাগা বুলোনোতে নয়, জল-রঙের কাজের উপর তেল-রঙের তূলি বুলোলে চিত্রের কিছু ক্ষতি হবে না, বা উদ্দেশ্যে সিদ্ধ হবে, বা পুরাতন চিত্রের উন্নতিবিধান (?) করা যাবে— এরূপ অজ্ঞতা বা মূঢ়তা -সূচক ধারণার বিরুদ্ধেই।

শ্রীপদ্মনাভস্বামী-মন্দিরের কাজের অন্তর্বর্তী ব'লে সহজেই চেনা যায়। বিষয় সর্বত্রই হিন্দুর আরাধ্য দেবদেবী এবং মহাকাব্যে বা পুরাণে বর্ণিত তাঁদের লীলা-বিলাস, অসুরনাশন, দুষ্টদমন ও ভক্তমনোবাঞ্ছাপূরণ। পদ্মনাভপুরম্ প্রাসাদে চতুর্থ তলের চারটি দেয়াল জুড়ে আলেখ্যের সংখ্যাও যেমন অধিক, তার মনোহারিতাও প্রচুর। কৃষ্ণপুরম্ প্রাসাদে আবিষ্কৃত গজেন্দ্রমোক্ষের একটি বিশাল ছবিতে (১৪'×১১' উচ্চতা) সেই একই মনোহারিতা পরিলক্ষিত হয়। ফলতঃ এট্টুমান্নুর ও ভাইকম মন্দিরের কাজে যে জমাট রূপকল্পনার আধারে যে স্তম্ভিত আবেগের প্রকাশ দেখা যায়, যে আদিম বলিষ্ঠতা, পরবর্তী কলাসৃষ্টিতে তার ন্যূনতা বা ক্ষীণতাই চোখে পড়ে। তার বদলে পাই পরিশীলিত সুষমা, সূক্ষ্ম কাজ ও ক্রম-উপচিত মনোহারিতা। উত্তরভারতীয় বা বিদেশীয় রূপরাগের রীতি ও কল্পনার 'অনুপ্রবেশ', তাও কি লক্ষ্য করা যায় না ? কেরলের নিজস্ব রীতির ক্ষীণতা ও বহিরাগত রীতির প্রভাব বিশেষ ভাবেই ফুটে উঠেছে, মুলাকুলমের লক্ষ্মণমন্দিরে, সিদ্ধিদাতা গণেশের ছবিতে। হয়তো অষ্টাদশ শতকের একেবারে শেষ দিকে ঐ ছবি আঁকা হয়ে থাকবে।

বিদেশীয় ও বৈদেশিক শিল্পের পরিচয় মাত্রেই কেরল যে তাকে গ্রহণ করেছে তা নয়। তার মুখ্য কারণ হয়তো এই যে, কেরল-চিত্রকলা প্রধানতঃই মন্দির-স্থাপত্যের সঙ্গে যুক্ত ও হিন্দুর সুচিরাগত পূজাপদ্ধতি ভক্তিবিশ্বাস ও সংস্কারের দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং তাতেই সংসক্ত, পারত্রিক— দৈনন্দিন ও ঐহিক জীবনযাত্রায় তুচ্ছ প্রয়োজনের বা শৌখিন অপ্রয়োজনের, ক্ষণিক ভালো লাগার বা মন্দ লাগার, ক্ষুদ্র আয়তনের ছবি নয়। এমন-কি রাজপ্রাসাদেও যখন আঁকা হয়েছে, ত্রিবাঙ্কুরে বা কোচিনে, তখনও তার-একই বিষয়, একই স্থিরলক্ষ, তাই একই পদ্ধতি। ষোড়শ শতাব্দের মধ্যভাগে পর্তুগীজ বণিকেরা নির্মাণ করায় ও কোচিনের রাজাকে উপহার দেয় মট্টনচেরী রাজপ্রাসাদ ; সপ্তদশ থেকে অষ্টাদশ শতকের অন্তকাল পর্যন্ত তারই সুপ্রশস্ত সভাগৃহে ও শুদ্ধান্তঃপুরে আঁকা হয়েছিল রামচরিত, কৃষ্ণলীলা আর হরপার্বতীর মিলনমঙ্গল-কাহিনী— কৈ, সেখানেও তো বৈদেশিক প্রভাব, আঙ্গিকে দূরের কথা, রূপকল্পনাতেও বিশেষ চোখে পড়ে না।[১৩]

ঘাটে-বাঁধা স্টীমার পেয়েই এর্নাকুলম্ থেকে ভাইকমের উদ্দেশে রওনা হবার আগে, এই চিত্রাবলীর সঙ্গে আমাদের চোখে চোখে পরিচয় হল। পরোক্ষ পরিচয়

[১৩] দ্রষ্টব্য—

Journal of the Indian Society of Oriental Art, June, 1935
Cochin Murals by V. R. Chitra and T. N. Srinivasan (1940)

ছিল আল্‌বামে ও সাময়িকপত্রে প্রতিচিত্র দেখার। এই চিত্রাবলীর মধ্যে শিব-বিবাহের বহুলাংশ শান্তিনিকেতন-কলাভবনে 'কালোবাড়ি'র দক্ষিণের বারান্দায় ঈষদুন্নত প্রতিমূর্তিতে খড়-মাটি-আলকাৎরা-মেশানো উপাদানে অনুকৃত হয়েছে— মট্টনচেরী-প্রাসাদের মূল রচনা এই একটি ক্ষেত্রে সাবলীল রেখাছন্দেই বন্দী হয়ে আছে, রঙ চড়ানো হয় নি। শেষোক্ত আলেখ্যই মট্টনচেরী প্রাসাদের 'অসমাপ্ত' শেষ কাজ বা শেষ দিকের কাজ বলা যায়। এর মূল্য সমধিক। কেননা, যদিও রূপ দ্যুতিময় হয়ে ওঠে রঞ্জনে, রেখাতেই তার প্রাণ, তার গতি, তার ছন্দ ; রঙে সেটিকে কিছু আবৃতও করে— বিশেষতঃ, যখন কেরল-চিত্রকলায় অলংকরণ অল্প নয়, বরং অত্যন্ত বেশিই বলা চলে। সাবলীল সহজ রেখার ছন্দে এই আকারের শোভাযাত্রা বিশেষ মনোহারী এবং এর আখ্যানকথনেও একটি অপ্রত্যাশিত ধারাবাহিকতা ও অবিচ্ছিন্নতা রয়েছে।

পুস্তকে ও পত্রিকায় প্রতিরূপ মুদ্রিত হওয়ায়, মট্টনচেরী প্রাসাদের চিত্রাবলী অপেক্ষাকৃত পরিচিত ও প্রশংসিত। ভাইকম্ মন্দিরের চিত্রাবলীর মর্যাদা ও মান তার চেয়ে অল্প মনে হয় নি আমাদের, বরং তার বিপরীতই। হয়তো রাজকীয় সভাগৃহ বা অন্তঃপুর ভূষিত করতে যতটা উৎসাহ বোধ করেছিল শিল্পী, মন্দিরভিত্তি অলংকৃত করতে তার চেয়ে বেশি— স্বভাবতঃই বেশি ক'রে নিবেদন করেছে আপনার বিদ্যা, আপনার শ্রদ্ধা, আর আপনাকেও। আমাদের বিশেষ মুগ্ধ করেছে। জানি না, যে মন্দিরে পূজা হচ্ছে, যেখানে ত্রিসন্ধ্যা আবালবৃদ্ধবনিতা আসছে শুচিবাসে শুদ্ধমনে তাদের অন্তরের ঠাকুরকে বাহিরেও চোখ মেলে দেখতে, নিত্য-নৈমিত্তিক পূজার্চনায় উৎসবে, সেই পরিবেশও আমাদের মুগ্ধ ও প্রভাবিত করে থাকতে পারে। সেই সুপরিসর প্রাঙ্গণে পা দিয়েই, নৈর্ঋত কোণে সেই নবকিশলয়শোভী প্রাচীন অশথের শান-বাঁধানো বেদীতলে ব'সে, নিরভিমান মন্দিরস্থাপত্যে আর মন্দিরপ্রদক্ষিণপর ভক্তিনম্র নরনারীর প্রতি দৃষ্টি রেখে, বড়ো বড়ো দীপবৃক্ষে এবং মন্দিরবেষ্টনীর অসংখ্য উদ্‌গৃত পুটে অমাবস্যার নিকষপটে লক্ষ লক্ষ আকম্পিত শিখার সচকিত স্বর্ণলিখন কল্পনায় নয়নগোচর ক'রে, যে মোহে, যে সুখে মন আবিষ্ট হয়েছিল, সে তো ছন্দোবদ্ধ কবিতাতেই ধ্বনিত হয়ে উঠতে চায়, প্রবন্ধে নয়। তাই, শিল্পবিচারে অনুচিত পক্ষপাত ঘটা অসম্ভব নয়। তবু বলব, কোচিন-ভিত্তিচিত্রে শিল্পী দেবতার লীলাচ্ছলে মানবীয় বিলাসের ভাব, ভোগায়তন দেহের মোহনীয় লাবণ্য ও 'লাস্য' যে ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন, তাতেই তাঁর অতুলনীয় গুণপনা। রাজান্তঃপুরের প্রশস্ত ভিত্তিতলে, অষ্টাদশ শতকের শেষে বা উনবিংশেরই সূচনায়, তূলির আগায় তিনি যে কুমারসম্ভবকাব্য-রচনায় প্রবৃত্ত, বহু শতাব্দ পূর্বের কালিদাসের কাব্যকেও তা মনে পড়িয়ে দেয়। দেহবিমুখ বা ভোগবিমুখ নন সেই

অবিস্মরণীয় কবি এবং এই অজ্ঞাতনামা শিল্পী বা শিল্পীগোষ্ঠী ; তবে কালিদাসের পরিশীলিত রুচির তুল্যতা এখানে অবশ্যই আশা করা যায় না, আর উক্তির সঙ্গে সঙ্গেই অনুক্তের ব্যঞ্জনাটুকু রেখে, ইঙ্গিতে ও উপমায়, কবি যে সুশোভন বর্ণন-কৌশলের আশ্রয় নিতে পারেন শিল্পীর সে সুযোগ কোথায় ? তাই, কোথাও কোথাও একালের রূপরুচিতে স্থূলতা-অপবাদেও হয়তো লাঞ্ছিত হতে পারে (বিশেষতঃ চিত্রান্তরে, রামাদি চার ভ্রাতার জন্ম-ঘটনায়) কিন্তু, সে হয়তো সেই আদিমতার অভিব্যক্তি, বর্বরতার নয়, যাতে বিশেষ একটি স্বাভাবিকতার পরিচয়, প্রচুর স্বাস্থ্য ও প্রাণশক্তির দ্যোতনা। ভাইকম মন্দিরে অধিকতর পরিশীলিত রুচির, আত্মনিবেদনপর ভক্তির ও অপরূপ রূপসৌন্দর্যের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। অথচ, বলিষ্ঠতারও কোনো অভাব ঘটে নি।

কেরলের রাজধানী ত্রিবান্দ্রমে শ্রীপদ্মনাভবিষ্ণুর তুঙ্গতোরণশোভিত মন্দির স্থাপত্যে ভাস্কর্যে আর অত্যুৎকৃষ্ট চিত্রালংকারেও অতুলনীয়। কেরল-চিত্রকলার পরাকাষ্ঠা যে এইখানে, এই শেষশায়ী ভগবানকে বার বার প্রদক্ষিণ ক'রে এ বিষয়ে আমরা তো নিঃসন্দেহ, আর পণ্ডিতেরাও একমত মনে হল। অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে (?) রচিত এই আলেখ্যলিখনে রাজস্থানী চিত্রের কিছু কিছু ভাবভঙ্গী রূপকল্পনা ও বর্ণসুষমা গৃহীত হয় নি তা বলতে পারি নে, তবে সবই মিলে মিশে গেছে, পরিপূর্ণভাবে অঙ্গীকৃত হওয়াতেই সুন্দর হয়েছে। বিষয়বস্তু হল— বিভিন্ন অবতারে বিষ্ণুর বিচিত্র লীলা, প্রধানতঃ রামায়ণ আর কৃষ্ণলীলা। বড়ো-ক'রে-আঁকা বীণা হাতে নারদ মুনি আর দর্পণ হাতে তরুণী মন্দিরভিত্তির দীর্ঘায়ত এক-একটি 'প্রকোষ্ঠে' একা একাও কতই সুন্দর! কৃষ্ণের মাতৃস্তনপানে আর সমলোভী সখা-সহ ননীচুরির দৃশ্যে বাৎসল্যরসের প্রস্রবণ উৎসারিত। বস্ত্রহরণ করে বসে আছেন গোবিন্দ ফুল্ল কদম্বের ডালে আর অপ্রস্তুত রমণীরা আবক্ষ রয়েছে যমুনাসলিলে, সলজ্জ মিনতি জানাচ্ছে কত ভাবে, আর কোনো সাহসিকা বুঝি স্থির করেছেন গাছে না উঠে অশিষ্ট চোরের শাসনের কোনো পথ নেই— চম্পকবরণীর অনাবৃত কটি ছাপিয়ে নেমেছে কোঁকড়ানো কালো চুলের বন্যা। দেয়ালের উপর দিকে দেখা গেল অশোককাননে বিষাদিনী সীতা (অবনীন্দ্র-গোষ্ঠীর প্রতিভাবান্ কোনো শিল্পীর কাজ ব'লে চালানো যায় না ?)— নীচে সবটা দেয়াল জুড়ে সুবিশাল দণ্ডকারণ্য বিশাল ও ভয়াল ; দূর দূরান্তরের দৃশ্য অধ-ঊর্ধ্ব স্তরে স্তরে সাজাবার কৌশলে ভারুত এবং সাঁচীর 'উন্নত চিত্রাবলী'র সঙ্গে অবশ্যই মেলে, রূপকল্পনার দিক দিয়ে বহু শত বৎসর উত্তীর্ণ হয়ে এসেছে। ফলতঃ, গেরী-লাল গোলাপী-লাল এলা সবুজ সাদা কালো বিরল কয়েকটি রঙের নিপুণ ও বিচিত্র সমাবেশে অপূর্ব-ঝংকার-তোলা এই প্রাকৃতিক দৃশ্যটি অজন্তা-বাগের অরণ্য নয়,
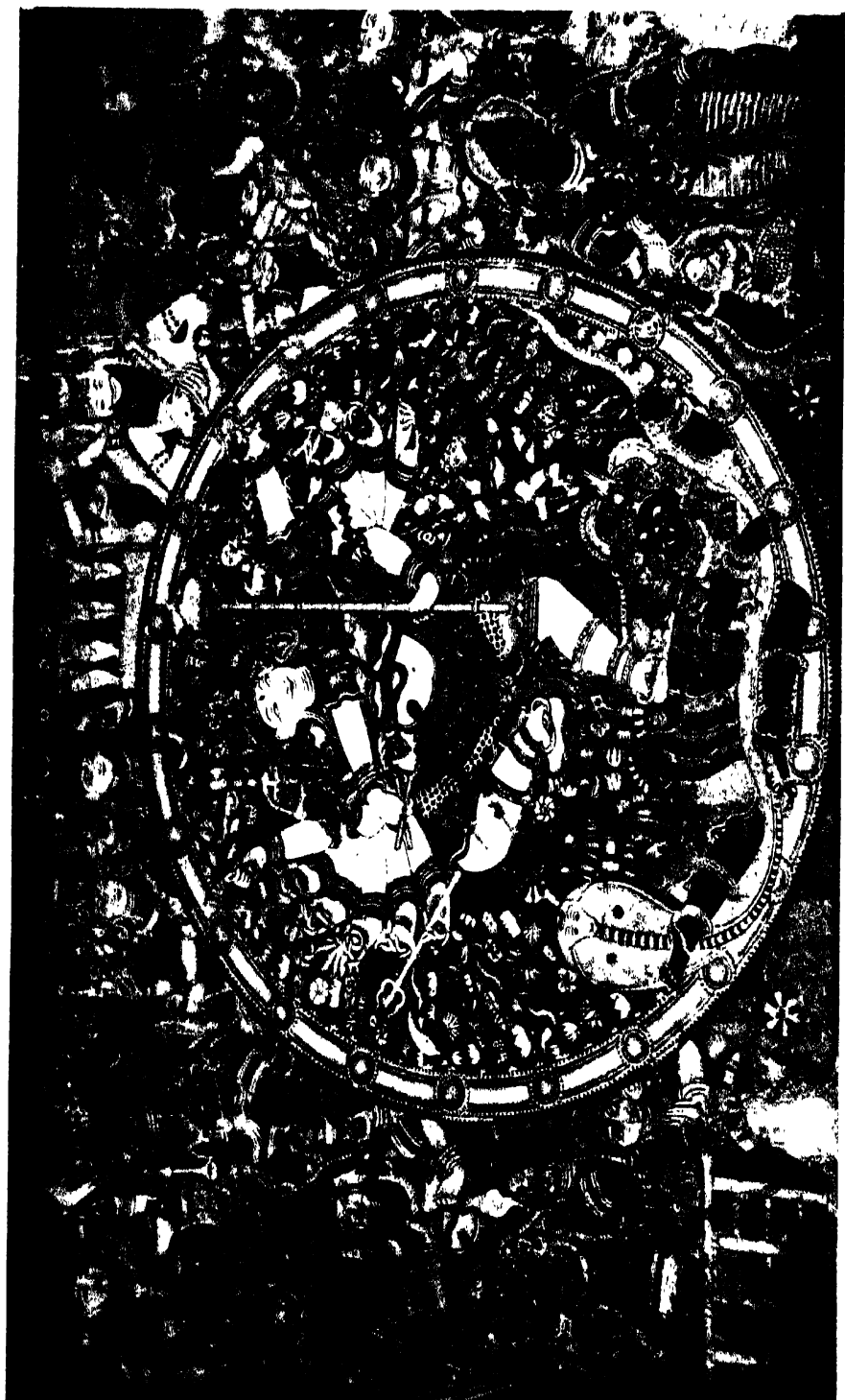
সুন্দরমূর্তির কৈলাসযাত্রা চিত্রের অংশ . মেঘলোক

তাঞ্জোর বৃহদীশ্বর-মন্দিরের ভিত্তিচিত্র

নটরাজ । প্রভু মান্নুর ভিত্তিচিত্র   আয়তন : ১২ × ৮ ফুট

আবার ঠিক কাংড়া ছবির নকলও তো কিছুতেই বলতে পারি নে। বনভূমির উপর দিকের একটি পর্ণকুটিরে কে যেন রয়েছে, নানা দিকে হরিণ ছুটে পালাচ্ছে, বাঘ তার শিকারের ঘাড়ে এসে পড়েছে, সিংহ বিবরে রয়েছে, বুনোরা মৃগয়া করতে বেরিয়েছে, নিহত শূকর রক্ত-ঝরা হেঁটমুণ্ডে বল্লমে ঝুলিয়ে দু'জন শিকারী পল্লীতে নিয়ে চলেছে, বাঁদর লাফাচ্ছে ডালে ডালে, অজগর সর্প বেষ্টন করে আছে গাছের গুঁড়ি, পাখি উড়ছে, ফুল ফুটছে— আর, অধিকাংশ পটভূমি জুড়ে এক উদ্যত অশ্বারোহী, রাজছত্র মাথায়, কী জানি শ্রীরামচন্দ্র কিনা। ভারতীয় 'ল্যাণ্ড্স্কেপ' চিত্রের আশ্চর্য এক অনাবিষ্কৃত রূপই আমাদের নেত্রগোচর হল। বিস্তারিত বর্ণনায় লাভ নেই। প্রতিচ্ছবিও দুর্লভ। এই বলেই শেষ করি, শ্রীপদ্মনাভস্বামী-মন্দিরের কাজে কল্পনার বৈচিত্র্য অনেক, আঙ্গিকও নিপুণ, বর্ণসংগীতি সুন্দর ও মোলায়েম, রূপের অলংকার কম ও লাবণ্য বেশি— কেরল-কলার বৈশিষ্ট্যেই কেরল-বহির্ভূত চিত্রকলার গুণ অঙ্গীকৃত। অঙ্গীকৃত যখন, কোনোরূপ অদ্ভুত অসংগতি আতিশয্য বা অসৌন্দর্য চোখে পড়ে নি।

বিশিষ্ট কেরল-চিত্রকলা যে-সব গুণে অভিনব ও আশ্চর্য মনে হয়েছে, সে হল এই— মন্দিরে ও রাজপ্রাসাদে প্রশস্ত ভূমিতে বড়ো করে আঁকা হয়েছে ব'লেই এ যে বড়ো এমন নয়। এর রূপকল্পনা স্বভাবতঃই বিশাল। বিশাল কল্পনা-সুলভ একটি সারল্য আছে ; অথচ আশ্চর্য এই যে, এর দেহে প্রচুর অলংকরণও সহজেই মানিয়েছে। দেবদেবী মুনিঋষি দানবমানব যেই হোন, তাঁরা যে দেহী এই সত্য যেন অত্যন্ত বলের সঙ্গে প্রকটিত। তরুণীরূপের পরাকাষ্ঠা নয় তনিমায়। এমন-কি কুমারী গৌরীও পীনোন্নতস্তনী, বিকচপদ্মবক্ত্রা, মদমুকুলিতাক্ষী ও মরাল-গামিনী ; যেখানে তিনি গণেশজননী সেখানেও তাঁর গৌরব নয় শুধু বাৎসল্যরসে। অর্থাৎ দেহের, সৌন্দর্য শুধু নয়, আছে ভার ও আয়তন। দেহের সম্পর্কে এই অলজ্জ অসংকুচিত মনোযোগ, দেহাধারে উপচিত সতত সহজ এই আহ্লাদ, অনুমান হয়, এর সুস্থ আদিমতা সুপ্রাচীন দ্রাবিড়ভূমির নিজস্ব বস্তু (সিন্ধুসভ্যতার সঙ্গেও কি যুক্ত নয়) — বৈদিক ও বৌদ্ধ প্লাবনের পরেও সগৌরবে জেগে রয়েছে।[১৪]

সুডৌল গড়ন ফুটিয়ে তোলবার জন্য মনোমত ছায়াসুষমার প্রয়োগ আর স্ফুরৎ রূপকে তার সীমায় সীমায় ধারণ করবার জন্য লক্ষগোচর রেখার সুকঠিন

[১৪] রাজা রবিবর্মার বাস্তব এবং বিলাতি রীতির অনুকারী চিত্রকৃতি কেন যে কেরলেই উদ্ভূত হয়েছিল, কেরল-চিত্ররীতির বহুশত বৎসরের পরম্পরা যখন লুপ্ত বা অনাদৃত, তারও নিগূঢ় কারণ একটি রয়েছে— ব্যাখ্যা না করলেও চলবে।

বন্ধন— কেরল-চিত্রকলার সর্বত্র দেখা যায়। চীনা বা পারসীক লেখাঙ্কনের রেখা নয়। গড়নের দ্যোতক অজন্তা-বাগের যে রেখা রূপ থেকে অস্বতন্ত্র, রূপে রূপে অঙ্গাঙ্গীভাবে মিলিত, সেই বিশেষ রেখা, আর প্রেরণার ক্ষীণতায় বা প্রতিভার অসদ্ভাবে ঘের-দেওয়া রেখাও বহু স্থলেই দেখা যায়।

কেরল-চিত্রকলায় তা ছাড়া রয়েছে একটি স্থাপত্যোচিত দৃঢ়নিপুণ নির্মাণকৌশল, ইঁটের সঙ্গে ইঁট গেঁথে যে ভাবে দালান-কোঠা তোলা হয় তারই অনুরূপ। এট্টুমান্নুরে নটরাজচিত্রে, মট্টনচেরী প্রাসাদে নরবানররাক্ষসের সংগ্রামের ছবিতে, এই 'নিশ্ছিদ্র' নির্মাণ তো চোখে পড়েই— কম-বেশি অন্য সব ছবিতেও এইটেই সাধারণ লক্ষণ। জমাট বিন্যাসের গুণে, তদুপরি অলংকরণেরও অজস্রতায়, চিত্রিত ভিত্তিতলের তুলনা হয় বহুমূল্য জামিয়ার শালের সঙ্গে, নিপুণ-বুনুনির বালুচর অথবা বেনারসী শাড়ির আঁচলার সঙ্গে। এই ঠাস বুনুনির বা সুনিপুণ সীবনের কোথাও থেকে যেন একটি সুতাও খুলে নেওয়া চলে না।[১৫] এমন জমাট 'নিশ্ছিদ্র' আলেখ্য -রচনা এই কারণেই সম্ভবপর হয়েছে, যে, চিত্রকর তাঁর রূপ-রঙ্গভূমিকে সামনে থেকে ভিতরে প্রসারিত ক'রে ধরেন নি, এই চিত্রে সেই পরিপ্রেক্ষিত বা গভীরতা নেই যাতে বিভিন্ন রূপ নিকট থেকে দূরে বা দূর থেকে নিকটে আনাগোনা করতে পারে। অর্থাৎ, যেন একটি পর্দার উপর রঙিন ছায়াবাজির ছবি ফেলা হয়েছে (পর্দার স্বল্পাবশিষ্ট অবকাশগুলি গাঢ় রঙের)— বিভিন্ন রূপ পটভূমির দক্ষিণে অথবা বামে, নয়তো মধ্যে, উপরের দিকে বা নীচে রয়েছে এই মাত্র বলা যায়। 'দূরত্ব' যখন নেই, এক-একটি রূপ'কে বা একজোট রূপ'কে অন্য সব রূপ থেকে পৃথক্ ক'রে ধরবার জন্য শিল্পী অপ্রত্যাশিত একটি কৌশল অবলম্বন করেছেন, যেমনটি ঠিক অন্য কোনো চিত্রকলায় লক্ষ্য করি নি।

এক-একটি রূপ বা নিকট সম্বন্ধে বাঁধা রূপের এক-একটি গোষ্ঠী, প্রত্যেককে বেষ্টন ক'রে 'বুটিতোলা' এক প্রকার পাড় এঁকে দেওয়া হয়েছে— সেই তার সীমা এবং সেই মায়াগণ্ডীর মধ্যেই সে সুরক্ষিত। আদ্যন্ত নক্সাদার অপরূপ দিব্যবসনের ভিতরে ভিতরে এইসব 'পাড়' স্বতন্ত্রভাবে চোখে পড়তে চায় না, আর ঐ নক্সার ভাবটি গড়ে তুলতেও যথেষ্ট সাহায্য করে, বিচার ক'রে দেখলে তাই মনে হয় এই

[১৫] মট্টনচেরীর গোবর্ধনধারণ ছবিতে দণ্ডায়মান শ্রীকৃষ্ণের ডান পায়ের পাশে কয়েকটি ছোটো শিশুকে নানাভাবে আঁকা হয়েছে, একটি দামাল ছেলেকে তার মা কোলে উঠিয়ে নিচ্ছে। আগাগোড়া নক্সার বাঁধুনির সঙ্গে মিলে এই অংশটুকুও কত যে সুন্দর বলা যায় না; কিছু আভাস পাওয়া যাবে *Cochin Murals*'এর প্রথম খণ্ডের সপ্তম ছবিতে। অথচ Text‌এর মলাটে এর আংশিক নকল বিচ্ছিন্ন ব'লেই বড়ো দুর্বল মনে হয়— মূলচিত্রের রূপরসের আবেদন কতটুকুই বা অবশিষ্ট রয়েছে!

বিশেষ কৌশল যেমন আশ্চর্য আর অভিনব তেমনি অবশ্যম্ভাবীও বটে।[১৬] মনে হয়, কেরল-চিত্রকর তাঁর আরাধ্য দেবদেবীকে, মুনিঋষি ও ভক্তবৃন্দকে, কোনো দেশ বা কালের ভিতর দেখেন নি। দেশকালনিরপেক্ষ আপন আপন সত্তাতেই তাঁরা আপনি প্রতিষ্ঠিত।

ফলতঃ, বলিষ্ঠ ভঙ্গীর গুণে যদিও এই চিত্রকলাকে নাটকীয় বলতেই ইচ্ছা হয়, সেই নাট্যাভিনয় যেন মন্ত্রস্তব্ধ। মুখচ্ছবিও সাধারণতঃ মুখোষের মতোই। (খাঁটি মুখোষের ব্যবহার ছিল কেরলের কথাকলি নৃত্যকলায়; পরে প্রসাধনের কলাকৌশলেই প্রয়োজন সিদ্ধ হওয়াতে, মুখোষের ব্যবহার ত্যাগ করা হয়।) দ্রাবিড় এবং আর্য প্রতিভার অবিচ্ছেদ্য মিলনে যে নটরাজ আকার পেয়েছে প্রস্তরে এবং ধাতুতে, তাতে রয়েছে এক নিয়তগতির ব্যঞ্জনা— বিশিষ্ট কেরল-চিত্রকলায় প্রায়শঃ তার সাক্ষাৎ মেলে না। এই বিশেষ রীতির চিত্র যতটা নির্মিত ততটা ছন্দিত নয়, বেগকে রুদ্ধ ক'রেই এর স্থাপত্যোচিত অচল প্রতিষ্ঠা।

পান্না-নীলা-গলানো অনন্ত জলরাশি উচ্ছলিত আবেগে ছুটে এসে দিন-রাত চুম্বন করছে কন্যাকুমারিকার পাষাণবন্ধুর তট; ইতস্তত-ছড়ানো কয়েকটি মগ্নশৈল পূর্বপশ্চিম-জলরাশি-সঙ্গমে ডুব দিয়ে উঠে বুঝি, রয়েছে পিতৃতর্পণে রত। সেই পুণ্যসলিলে স্নান ক'রে যাত্রা করা গেল উত্তরপূর্ব দিকে তিরুনেলভেলি বা তিন্নেভেলির উদ্দেশে। কেরলপ্রকৃতির পুঞ্জিত শ্যামিমা ও সজলস্নিগ্ধ ভাব ক্রমশই ছেড়ে আসছি, অবিরল নারিকেল-বন আর দেখা যায় না। দূরব্যাপী গৈরিক রাগে মনে পড়ে বীরভূম বা সাঁওতাল পরগনা; সন্তানকে বাঁচাতেও তো হবে, তাই তপস্বিনীর ঐ গেরুয়া আঁচলের স্থানে স্থানে সতেজ ধানক্ষেতের সবুজ পটি। পার্বতী নদী-নালায় প্রবাহিত, কূপ থেকে উত্তোলিত, জলের ধারা। ডান দিকে তরল নীলিমার সচকিত দর্শন কখন্ শেষ হয়ে গেল, বামে ন্যাড়া পাহাড়ের মাথায় কাজল-মাড়া বাষ্পসমুদ্রের শুভ্র ফেনা উপচে প'ড়ে সেই দিগম্বরকেও সুন্দর করেছে। যুগে যুগে চের চোল পাণ্ড্য পল্লব চালুক্য আর নায়ক রাজা ও রাজন্যবর্গের উত্থান পতন সংগ্রাম ও সন্ধির লীলাভূমি অনেক ইতিহাসই ভুলে গেছে আর ভূতকালের

[১৬] উত্তরকালে আগন্তুক নানা প্রভাবে ঐ নিশ্ছিদ্র নক্সার ভাব যেমন যেমন ঘুচে গেছে, সেলাই খুলে, বুটিতোলা পাড়ও একটার পর একটা ক্রমেই সরে গেছে এবং অনাবশ্যক হয়ে পড়েছে।

দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে আছে আজ। বিস্তৃত প্রান্তরে প্রান্তরে শুধু শ্রেণীবদ্ধ ঋজু তালবন লক্ষ লক্ষ পদাতিক সেনার মতোই প্রশংসনীয় শৃঙ্খলায় কুচ-কাওয়াজ করে চলেছে। পাঁচ দশ ক্রোশ দূরে দূরে প্রাকারবেষ্টিত দুর্গের মতো শিবের বা বিষ্ণুর মন্দির চার দিকে চার উন্নত গোপুরম্ উঁচিয়ে অতন্দ্র প্রহরায় নিযুক্ত রয়েছে, আর ঐ দূর অতীতকে রক্ষণ পোষণ করছে আজও যতটা পারে। সকালে সন্ধ্যায় হাজারো নরনারী আসছে সন্ন্যাসী পরিব্রাজক আর কৌতূহলী পর্যটকের দল। মন্দিরের বাইরে পড়ে আছে অজস্র-কারুকার্য-খচিত স্খলিতচূড়া দু-চারটে কাঠের রথ— প্রাচীন, অব্যবহার্য, আর উপরের গঠন নূতন তৈরি ক'রে যার ব্যবহার হবে আগামী রথযাত্রা-উৎসবে। দোকান-পশার রাস্তায় রাস্তায় আর মন্দিরপ্রবেশের দু ধারে, কখনো বা প্রথম প্রাকার পার হওয়ার পরেও— ধূপদীপ, চন্দনকাঠ আর স্তূপীকৃত চন্দনপঙ্ক, ফুলের পশরা, ফলের বাজার, ধাতু কাঠ বাঁশ বেতের রচনা নানাবিধ তৈজস-পত্র, তা ছাড়া কত দেবদেবীর বড়ো ছোটো কত রকম বিগ্রহ। প্রাকারের পর প্রাকার, তোরণ পার হয়ে তোরণ। দেবাধিষ্ঠিত গর্ভগৃহে আর সম্মুখীন মণ্ডপে সর্বদাই আলো জ্বলছে দীপবৃক্ষে, বিদ্যুৎপ্রদীপে, সন্ধ্যা হতে না হতেই মনে হয় রাত্রির তারা জ্বলছে দূর থেকে দূরে। দর্শনার্থী ব্যাকুল নরনারীর যাতায়াত কম হলে হয়তো দেখা যেত, প্রথম গোপুরমের উন্মুক্ত দেউড়িতে পা দিয়েই, ঐ তো অনেক দূরে বরদাতা বিষ্ণুর প্রসন্ন মুখচ্ছবি। লিঙ্গমূর্তি শিবের নিকষললাটে ঐ না রজতদ্যুতি বালেন্দুলেখা? কে উনি সামনে— বরদরাজ পেরুমল না কৈলাসনাথ? নাগেশ্বর অথবা শারঙ্গপাণি? নেল্লেই আপ্পর অথবা কান্তিমতী? সোমসুন্দরম্ অথবা মীনাক্ষীর মন্দিরে এসেছি আমরা?

কল্পনার মানচিত্র ছেড়ে বাস্তবের তামিলনাডেই পৌঁছে গিয়েছি। মদুরা-মামল্লপুরম্, তাঞ্জোর-চিদম্বরম্, কাঞ্চী-কুম্ভকোণম্, ত্রিচিনাপল্লী-রামেশ্বরম্ —বিচিত্র নামগুলি যেন মন্ত্রনিবদ্ধ ক'রে জপ করলেও পুণ্য আছে। না-আস্তিক না-নাস্তিক আমরা আধুনিক শিক্ষা-বৈগুণ্যে, সেই আমাদের ভিতরেও মুহূর্তে জেগে ওঠে আমাদের মহাজাতির অতিপ্রাচীন সত্তা। এই-সব তীর্থে তীর্থে যে-সব মন্দির রয়েছে— কত তীর্থই তো চোখে দেখি নি, আরও কত তীর্থের নামও শুনি নি— যে-সব মন্দির রয়েছে দেবাধিষ্ঠিত আর যেগুলি হৃতবিগ্রহ, ভগ্ন— কতকগুলি সহস্র বৎসরের পুরাতন, আর অনেকগুলি দু-তিন শতাব্দ শুধু উজিয়ে এসেছে তাও সত্য। নয় শত বৎসর পূর্বে দিগ্‌বিজয়ী রাজরাজ চোল তাঞ্জোরে বৃহদীশ্বর শিবের সৌম্যগম্ভীর মন্দিরকে অত্যুন্নত মহিমায় আকাশচুম্বী করে তুলেছিলেন। তিন শত বৎসর পূর্বেও মদুরায় কান্তিমতী ও মীনাক্ষী -মন্দিরের মতো বিশাল ও বিচিত্র

কীর্তি -স্থাপন হিন্দু নরপতির এবং স্থপতি ও ভাস্করের অসাধ্য ছিল না। সীতারাম আখ্যানে প্রাচীন উড়িষ্যার অপরূপ ভাস্কর্য -প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র যে আক্ষেপ ও ধিক্কার উচ্চারণ করেছিলেন তারই অনুবৃত্তি ক'রে কোনো লাভ নেই। তা ছাড়া, তামিল-নাডের অতীত স্থাপত্যকীর্তি ও ভাস্কর্যের কিছুমাত্র ব্যাখ্যান ও বিশ্লেষণের উপযুক্ত সময় ও শক্তি আমাদের নেই।

ভারতীয় চিত্রধারার কথঞ্চিৎ অনুসরণ করব। মাঝে মাঝে অন্য প্রসঙ্গ টেনে আনা, সে কেবল দেশকালের পটভূমি ও পরিবেশ, অন্তরের এবং বাহিরের আবহ— এগুলি পাঠকেরও মনোগোচর করার উদ্দেশে। এ আমাদের মন্দিরস্থাপত্যের এবং ভাস্কর্যেরই দেশ, মনে হয় সে-সবের বুঝি সংখ্যা নেই। প্রাচীন চিত্রও বহু গুহাগৃহে বা মন্দিরে দিনে দিনে আবিষ্কৃত হয়েছে, হচ্ছে, বিশেষতঃ বিন্ধ্যগিরির দক্ষিণে। অল্পই আমরা চোখে দেখেছি, আর যা দেখেছি তাও সবই উল্লেখ করতে চাই নে।

মীনাক্ষীমন্দিরের অভ্যন্তরে আছে 'হেমপদ্মের সরোবর'— তার দুই দিকের প্রাচীরে সুপরিসর ক্ষেত্রে অসংখ্য চতুষ্কোণ খোপে খোপে ভাগ ক'রে ভক্তবৎসল আশুতোষের অন্তহীন লীলাবিলাস অঙ্কিত হয়েছে। উত্তর দিকের দালানের কাজই উজ্জ্বল এবং স্পষ্ট মনে হয়। একেবারে ভিত্তিতলে আঁকা হয় নি; কাপড়ের উপর আঁকা হয়েছে, সেই কাপড় চৌখুপী ফ্রেম দিয়ে দেয়ালে আঁটা। মন্দিরের নির্মাণ তো সপ্তদশ শতাব্দে; অনেকে মনে করেন, এই ছবি উনবিংশ শতকের শেষ ভাগে আঁকা। লোকচিত্রেরই ধারা— শিল্পীর নৈপুণ্য চমৎকার। মোলায়েম লালের উপর নীল সবুজ এলা ও সাদা রঙের খোল্‌তাই হয়েছে বেশ। প্রথাসিদ্ধ রূপকল্পনা, প্রাণহীন তবু হয়ে ওঠে নি। ঘোড়া ছুটিয়ে কেউ যাচ্ছে এই রূপই অবিকল উল্‌টিয়ে দিয়ে সরোবরে ঘোড়সওয়ার উল্‌টে পড়ার কল্পনা করা হয়েছে, অতি ছোটোর মধ্যে গোপুরম্‌ বা মন্দির এঁকে দেখানো হয়েছে— রঙে রেখায় এবং সাদা নীল সবুজ ফোঁটায় জড়োয়া গয়নার মতোই ঝিক্‌মিক্‌ করছে। মথুরা অঞ্চলের সমকালীন কাঠ-খোদাই পুঁথিচিত্রের সঙ্গেও তুলনীয়।[১৭]

প্রাচীন কাঞ্চী, আধুনিক কাঞ্জীভরম্‌। বরদরাজ পেরুমলের মন্দিরে দ্বিতলের

[১৭] প্রাচীন প্রাসাদে ও মন্দিরে প্রাচীনতর এবং উন্নততর চিত্রনিদর্শন, আশা করা যায় ক্রমে সেগুলি রক্ষা করার উপযুক্ত ব্যবস্থা হবে। সেগুলির প্রতিচিত্র ছাপাও হবে। (আশা করতে দোষ কী?) মীনাক্ষীমন্দিরের এই অজস্র লোকচিত্র, এগুলিও কিন্তু অবহেলার বস্তু নয়। হয়তো এ ছবিও আঁকবার (এবং আঁকাবার) লোক আজ নেই। অনেকগুলি প্রতিচিত্র সংকলন ক'রে সুন্দর গ্রন্থ হতে পারে এবং হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

প্রশস্ত দেয়ালগুলিতে ভক্তবৎসল বিষ্ণুর চিরবিচিত্র লীলা রূপে রেখায় ও রঞ্জনে উদ্ভাসিত। লোকচিত্রের সুন্দর নিদর্শন, বিশেষ পুরাতন হবে না— রূপকল্পনার বাঁধাধরা ছাঁদে প্রচুর অলংকরণও সহজেই স্থান পেয়েছে।

সুবিখ্যাত চিদম্বরম্ নটরাজের মন্দির নির্মিত হয় খৃস্টীয় দ্বাদশ থেকে চতুর্দশ শতকের মধ্যে। বিশাল গোপুরম্-চতুষ্টয় আর অতিবিশাল প্রাঙ্গণ। নটরাজের দেউল ব্যতীত সেই প্রাঙ্গণে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছোটো বড়ো বহু মন্দির ও মণ্ডপ। সহস্রস্তম্ভ সভামণ্ডপের অধিষ্ঠানবেদীকে দিকে দিকে ভূষিত করে অজস্র উৎকীর্ণ 'চিত্র' আছে নাচের— যেমন সাবলীল ছন্দ তেমনি ভাবলাবণ্য। উল্লেখযোগ্য চিত্র আছে শিবকামী-মণ্ডপের ছাদে। সেও লোকচিত্রেরই ধারা, তবে বিশেষ বড়ো ক'রে আঁকা হয়েছে। স্বতঃস্ফূর্ত ও সাবলীল রূপ-রেখার ছন্দে শিল্পীর প্রাণের সজীবতা ও সরসতা সহজেই প্রকটিত। উৎকীর্ণ চিত্রের সঙ্গে অঙ্কিত চিত্রের যে ছন্দোগত মিল আছে তৎসত্ত্বেও বলতে হবে— এ চিত্র খুব পুরাতন নয়, সম্ভবতঃ উনবিংশ শতাব্দের গোড়ার দিকে অথবা অষ্টাদশ শতকের শেষে আঁকা। মুগ্ধ করে শিবের ভিক্ষাটনের চিত্র— শখের ভিখারি দিগ্‌বসন দেবতাটির কী ভুবনমোহন চিরতরুণ রূপ, ভিক্ষা দিতে এসে গলৎকবরী স্খলদ্‌বাসা মুনিপত্নীদের যুগপৎ সম্ভ্রম এবং হাস, লজ্জা এবং অভিলাষ কতই না সুন্দরভাবে পরিস্ফুট! দেশী রঙগুলির ব্যবহারে কনকারুণ আভা ফুটে উঠেছে, তাকে কোমল করেছে পাথুরে সবুজ— গড়ন দেখাতে যদিও ছায়াসুষমার প্রয়োগ নেই, লেখাঙ্কন-ঘেঁষা রেখাতেই তার অনায়াস ব্যঞ্জনা। সম্ভবতঃ এই শিল্পীরাই ছিলেন দক্ষ মূর্তিকার, তাই গড়নের জ্ঞান তাঁদের অত্যন্ত পাকা রকমের। বৃহদায়তন চিত্রে রেখার টান বা sweep সেও দেখবার মতো— মনে রাখতে হবে ছাদে আঁকা, দেয়ালে নয়। বেশিক্ষণ ঘাড় উঁচু করে দেখাও তো কৃচ্ছ্র বিশেষ, অবশেষে মেজেতে শুয়ে পড়লে বেশ আরামেই দেখা যায়।

বহুদিন হল মহাভারতের কোথাও এরূপ একটি বচন পেয়েছিলেম যে, চিত্রে সুধী ব্যক্তি দেখেন রেখা, সাধারণে দেখেন রঙ, আর রমণীরা দেখেন অলংকরণ। শুনেছি সংস্কৃত সাহিত্যে অনুরূপ উক্তি অন্য স্থলেও আছে।[১৮] সে যাই হোক, আমাদের মনে হয় প্রতিভাবান্ শিল্পী সৃষ্টি করেন অখণ্ড রূপ, আর রসিক ব্যক্তিও তাইতেই প্রীত ও কৃতার্থ হন। রেখার অনিবার্য ছন্দ, বর্ণের অদ্ভুত ব্যঞ্জনা, পরিমিত অলংকরণের সর্বব্যাপী অনুরণন, তা ছাড়াও রূপের আছে গড়ন বা নতোন্নত ভাব।

[১৮] দ্রষ্টব্য পূর্বপ্রবন্ধ : চিত্র। পৃ ১৯

অবচন ভাষার সেই পরিপূর্ণতায় ও অখণ্ডতায় অজন্তা-বাগ-বাদামীর চিত্ররীতি অতীব বিস্ময়কর।

ব্যাপক পরিচয়ে আমরা যাকে লোকচিত্র বলেছি, প্রধানতঃ উত্তরাপথে আর দাক্ষিণাত্যেও যা নানা শাখা প্রশাখায় প্রসারিত, তা হল দুই আয়তনের ক্ষেত্রে দুই আয়তনেরই চিত্র, গড়ন ফোটাবার ইচ্ছা বা আয়োজন নেই— চিত্রের অন্যান্য গুণেই তা সার্থক ও সুন্দর এবং সুমিত উপভোগের সামগ্রী। দৃষ্টিপথে শ্রুত আর অন্তরে অনুভূত খণ্ডকাব্য বা গীতিকাব্য বলা চলে। যে দেশকালে তার স্থিতি ও গতি সেটি মনঃকল্পিত।

কেরল-চিত্রকলার পরাসৃষ্টিতে আমরা দেখেছি এক দেশকালবিস্মৃত মন্ত্রস্তব্ধ নাটকীয়তা, যা বৃহৎ, যা বিস্ময়কর, যাতে রেখা রঙ গড়ন ও অলংকরণ সবই প্রচুর পরিমাণে আছে, যা একক উপভোগের সামগ্রী নয়, বহুজনের সম্মিলিত সৃষ্টি, ইষ্ট-আরাধনায় উৎসর্গীকৃত এবং স্থাপত্যলগ্ন।

অজন্তা-বাগ গুহায় ষড়ৈশ্বর্যময় রূপের ভাষায়, সংহত কল্পনায় ও ছন্দোময় আবেগে, যা রচিত হয়েছে তাকে মহাকাব্যই বলা চলে। পটভূমির মধ্যে তা সীমাবদ্ধ নয়। (রামায়ণ বা মহাভারত সীমাবদ্ধ নয় বাল্মীকি বা ব্যাসের রচনাকারে।) অতীতে ভবিষ্যতে এবং নিখিল জাতিসত্তায় প্রসারিত। যে দেশকালের আশ্রয়ে এই রূপ উদ্ভাসিত সেটি লৌকিক নয়, অলৌকিক। মনঃকল্পিত নয়, সত্তায় আবিষ্কৃত। কুণালজাতকে আছে কামলোকের উল্লেখ, তার উপরে রূপলোক, তারও উপরে অরূপলোক। কামলোকে আছে আসক্তি, তাই সেখানকার যে দেখা সেটি 'অন্ধের দেখা'য় অনুকৃত আকৃতি মাত্র এ কথা বলতে পারি। অন্ধতা ঘোচে কামনা-পরিহারে, তখন সেই কামলোকই গোচর হয় মনোহারী রূপলোক হিসাবে প্রয়োজনহীন ভারহীন সত্তায়। অরূপলোকে রূপ না থাকলেও, আছে ছন্দ। সেই ছন্দই রূপের স্রষ্টা ও প্রেরয়িতা। মনে হয় অজন্তা-বাগের তপঃসিদ্ধ শিল্পীগণ সেই অরূপলোক পর্যন্ত উত্তীর্ণ হয়ে, তারই এক ধাপ মাত্র নীচে নেমে এসে তাঁদের এই অবাঙ্‌ময় মহাকাব্য রচনা করেছেন। আনন্দ-লোকের রসসিঞ্চনে তা পুণ্যময়, অমৃতময় হয়েছে। শিল্পগুরু নন্দলাল বলেন, অরূপলোকেরও উপরে রয়েছে আনন্দলোক।

অজন্তা-বাগের সমকালে ভারতীয় চিত্রকলার উক্ত ধ্রুব বা ধ্রুবপদী রীতি ভারতের স্থানবিশেষে সীমাবদ্ধ ছিল না, এতে বিস্মিত হবার কারণ খুব বেশি নেই। নদনদী-অরণ্যপর্বত-সংকুল হয়েও বিশাল ভারতের সাংস্কৃতিক ঐক্য অতি পুরাতন বস্তু; খৃস্টপূর্ব প্রথম শতকে অজন্তার প্রাচীনতম গুহা যদি ক্ষোদিত হয়ে থাকে, নিখিল ভারতের আত্মিক ঐক্য আরও সহস্র বৎসর পূর্বের নয় যে এ কথা কেউ

সুনিশ্চিতভাবে বলতে পারবেন কি?[১৯] ভারতের ধ্রুবপদী রীতিতে খৃস্টীয় পঞ্চম শতকে আঁকা হয়েছিল সিগিরিয়ার ভিত্তিচিত্র— ফুলডালি ধরে আছেন আর পুষ্পবৃষ্টি করছেন কতিপয় সুরসুন্দরী, প্রায় কটি অবধি মেঘলোকে অদৃশ্য। সাম্নুচরী রাজকুলললনাদের প্রতিকৃতি নয়, তাও হয়তো নিশ্চিত বলা যায় না। সুদূরকাল থেকেই সিংহলে ভারতীয়দের বসবাস বা ভারতসংস্কৃতির প্রচার ও প্রসার ছিল, সকলেই স্বীকার করেন।

আরও নিকটে তামিলভূমির সিত্তন্নবাসলে, অল্পপরিসর একটি গিরিগুহার স্তম্ভে ও ছাদে সপ্তম শতাব্দে আঁকা হয়েছে অপূর্ব ছবি। এটি জৈনধর্মাবলম্বীদের কীর্তি। পরিচিত নৃত্যভঙ্গিমায় উদ্ভাসিত অপ্সরীদের রূপ, বাইরের দুটি থামের উপর দিকে, উপযুক্ত ব্যবস্থার অসদ্ভাবে আর কিছুকালের মধ্যেই অরূপে মগ্ন হবে; কিন্তু বারান্দার ছাদে পদ্মদলে আর পদ্মের কোরকে ফুলে আচ্ছন্ন কাকচক্ষু সরোবর, কাল বুঝি আঁকা শেষ করে গিয়েছে চিত্রকর। পদ্মবনে কেলি করছে হংস, নেমেছে মহিষ আর করী করিণী, কালো জলের তলায় লুকিয়ে খেলা করছে ছোটো বড়ো মীন, আর, অবশ্য, পুষ্পের লোভে কয়েকটি রাখাল বালকও নেমে পড়েছে— নত হয়ে ডাঁটিসুদ্ধ পদ্ম চয়ন করে এক বালক দিচ্ছে অপর বালকের হাতে, তৃতীয় একজন সংগৃহীত সমৃণাল পদ্মগুলি নিয়ে অপেক্ষা করছে অদূরে। অপূর্ব বাহার খুলেছে রাশি রাশি বিকচ পদ্মে আর পদ্মকোরকে— অধিকাংশই অরুণ কোকনদ, মাঝে মাঝে শ্বেত শতদল, প্রত্যেকটি আলোহিত অথবা শুভ্র ফুল স্নিগ্ধশ্যাম পদ্মপাতার পেখম মেলে শোভা পাচ্ছে, কোথাও বা পদ্মপর্ণের ঈষৎ-উল্টে-পড়া ভঙ্গীতে অন্য পিঠের ম্লান সবুজে একটি নূতন পর্দা লাগিয়েছে রঙের রাগিণীতে। গুহাভিমুখী দর্শকের দিকে প্রসৃত, যূথবদ্ধ মৃণালগুলির সর্বাঙ্গে

১৯ ইতিহাসবিধাতা নিজে ঐতিহাসিক নন। একটি লক্ষ্য সুনির্দিষ্ট রেখে, শতসহস্র অযুতনিযুত বৎসরে যা ঘটাবার সেইটি ঘটিয়ে তোলাতেই তাঁর অখণ্ড মনোযোগ। যে দিকে যে ভাবে হোক। ঘটনাপ্রবাহের পথে পথে কোথায় কী মণিরত্ন এবং উপলরাজি প'ড়ে রইল বা রইল না সে তিনি চেয়ে দেখেন না। ভূত ভবিষ্যৎ সবই তাঁর কাছে বর্তমান-মুহূর্তটিতে বিধৃত। সমুদায় সাক্ষ্য প্রমাণ কেন রাখা হয় নি, পরিসংখ্যাত তথ্যরাজির কী হল, এ-সব প্রশ্নের তাই কোনো উত্তর নেই। ইতিহাসবিদ্ পণ্ডিতের বড়ো মুশকিল, নূতন আবিষ্কৃতির সঙ্গে সঙ্গে পুরোনো থিয়োরি বিসর্জন দিতে হয়, যেমন হরাপ্পায়, মহেঞ্জদারোতে। সম্প্রতি অমেদাবাদের ঢোল্কা তালুকে ('at Lothal in the Saragvala Village'—*Hindusthan Standard*, July 8, 1957) মাটি খুঁড়ে যা দেখা গেছে ও পাওয়া গেছে, তার ফলে সিন্ধুসভ্যতার সীমা বোম্বাইয়ে কাম্বে উপসাগরের তট পর্যন্ত প্রসারিত হল। কিন্তু এখানেই সীমিত থাকবে তো!

কাঁটার আভাস দেখানো হয়েছে। পদ্মগুলির সুডৌল গড়ন ছায়াসুষমার পরিমিত প্রয়োগেই পরিস্ফুট। (মনে হয়, অজন্তার চিত্রে কোথায় কিভাবে পদ্ম আঁকা হয়েছে— ছায়াসুষমায় গড়ন ফুটিয়ে, অথবা গড়নের রেখার আশ্রয়ে, অথবা দুয়েরই মিশ্র প্রয়োগে, পুষ্প হিসাবে অথবা অলংকরণ হিসাবে, এরূপ একটি বিস্তারিত আলোচনাতেও বিশেষ লাভ আছে।) ফলতঃ পদ্মের বাস্তব রূপকেই, তার স্বাভাবিক বর্ণমাধুরী ও ভাবলাবণ্যকেই একটি সহজ সবল ছন্দে এই ছোটো গুহার ছোটো-ছাদ-ময় লীলায়িত করে তুলেছেন অজ্ঞাতনামা শিল্পী, প্রত্যক্ষ জ্ঞানে ও নিবিড় ধ্যানে উৎফুল্ল হয়ে। কন্‌ভেন্‌শন ব'লে চেনাই যায় না, কৃত্রিমতার অথবা আড়ষ্টতার কোনো লক্ষণই কোথাও নেই।

প্রায় সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ত্রিচিনাপল্লী বাস্‌স্ট্যান্‌ড্ থেকে রওনা হয়ে, ছোটো পাহাড়ের উপর প্রাকারবেষ্টিত বীরালিমালাইকে পাশ কাটিয়ে, বুঝি আন্নবাসলে আমাদের নামতে হয়েছিল। মোটরের রাস্তা থাকলেও, গুহা লক্ষ্য ক'রে আচোট মাঠের মধ্য দিয়ে হাঁটা গেল ক্রোশ দেড়। গুহায় পৌঁছুলাম দশটা বেলায় ক্ষুধিত, তৃষিত। ঘুরে ঘুরে চোখের ক্ষুধা দূর ক'রে জঠরক্ষুধার শান্তি করা গেল; গিরিনির্ঝরে পাওয়া গেল জল— এই জলে অঞ্জলি পূর্ণ করেছে যুগে যুগে বহু পথিক আর সহস্রাব্দ পূর্বে গুহাবাসী জৈন সাধু দু-এক জন।

তীরবৎ ঋজুগতিতে অজন্তা থেকে প্রায় আট শত আর বাদামী থেকে চার শত মাইল দূরে, সিত্তন্নবাসল কালের দিক দিয়ে উভয়েরই নিকট প্রতিবেশী।

তাঞ্জোর সম্পর্কে তা বলা যায় না। ট্রেন স্টীমার বিমান -হীন যুগে অরণ্য পর্বত নদী নদ -বহুল বহু শত মাইলের ব্যবধান শুধু নয়, কালের ব্যবধান চার শত বৎসর। অজন্তার সন্নিহিত ইলোরা। সেখানে হিন্দু বা জৈন মন্দিরের ছাদে বা দেয়ালে যেসব চিত্র তার রচনা অষ্টম থেকে নবম শতাব্দের মধ্যে। অজন্তা-বাগের বহিরঙ্গ এবং আঙ্গিক অক্ষুণ্ণ আছে, অথচ ভিতরের বস্তুটি সপ্তম শতাব্দ অবধি যা ছিল, যেরূপ ছিল অজন্তায়, এ ক্ষেত্রেও তাই আছে— এমনটি অনুভব করতে পারি নি। দেশ কাল দু দিক থেকেই এত কাছে থেকেও এত দূর— রেখা ও রঙের ভঙ্গী রইল, ভাব স'রে দাঁড়ালো— এর কী কারণ পণ্ডিতেরাই বলতে পারবেন। অথবা, 'কৈলাসে' ও 'ইন্দ্রসভায়' স্থাপত্য এবং ভাস্কর্যই ছিল অভীষ্ট, অতএব সে দুটিই বিশেষভাবে দর্শনীয়। অধিকাংশ চিত্রই ছাদে এ থেকেও বুঝতে হবে যে, স্থাপত্যকে অলংকৃত করাই ছিল শিল্পীর বা নিয়োগকারীর প্রধান উদ্দেশ্য।

তাঞ্জোরের বৃহদীশ্বর মন্দিরে চিত্র এমন অপ্রধান কিছু নয়। সেখানে অজন্তা-ইলোরা থেকে বহু বহু দূরে, খৃস্টীয় একাদশ শতকের সূচনাতেই, প্রথম রাজরাজ চোল এবং তাঁর সমাদৃত শিল্পীর বলবার কথা ছিল অনেক, ভাবা ও ছন্দ ছিল

অনুপযোগী। কৌতুককর দম্ভ ও মূঢ়তা -বশতঃ পরবর্তী নায়ক রাজারা ঐ শিল্প-কীর্তিকে নিজেদের কালের যে চিত্রালংকারে আবৃত করেছিলেন, সৌভাগ্যক্রমে তা খ'সে খ'সে প'ড়ে মূল চিত্রের এখানে একটু সেখানে আর-একটু এবং বর্তমানে অনেকটাই উদ্‌ঘাটিত করেছে— আর, আমাদেরও বিস্ময়ের কোনো সীমা নেই। উল্লেখযোগ্য প্রতিচ্ছবি আজ পর্যন্ত মুদ্রিত ও প্রচারিত হয় নি, আমাদের দেখাও তৃপ্তিহীন ক্ষণকালের দেখা মাত্র, তাই অত্যুক্তি হয়তো হতে পারে, তবু বলব— অজন্তা-বাগের প্রকৃষ্ট চিত্ররীতির রসোজ্জ্বল উত্তরাধিকার এমন আর কোনোখানেই দেখি নি। প্রায় সেই রেখা, সেই রঙ, সেই গড়ন, সেই সাহসিক কল্পনা ও সচ্ছন্দ প্রবাহ— রূপের সীমায় সীমায় অপরিসীমের ব্যঞ্জনা। এ আশ্চর্য কেমন ক'রে সম্ভবপর হল!

হয়তো ইতিহাসনিবদ্ধ আখ্যায়িকায় অনেক ফাঁকও আছে, আর যা লিপিবদ্ধ তাও আমরা পর্যালোচনা করে দেখি নি। তবু জানা গেল, দিগ্বিজয়ী রাজা ছিলেন রাজরাজ চোল, তাঁর রাজত্ব সময়ে (খৃ. অ. ৯৮৫-১০১৮) চোলরাজশক্তি ও রাজকুলগৌরব গগনচুম্বী হয়ে উঠেছিল। পুরাণকারদের ভাষায় বলাই যেত আসমুদ্র ক্ষিতিতলের তিনিই ছিলেন অধিপতি। তদুপরি তিনি ছিলেন একান্ত শিবভক্ত। যুগপৎ কুলগরিমাকে আর হৃদয়নিহিত ইষ্ট-আরাধনাকে প্রত্যক্ষ আকার দেবার জন্য তিনি খৃস্টীয় দশম ও একাদশ শতকের সন্ধিকালে তাঞ্জোরে যে শিখরদেউল নির্মাণ করালেন তাতে সমুদায় 'জাতি'র বা প্রজাবৃন্দের উদ্যম আনন্দ ও প্রতিভা জেগে উঠেছিল ও নিযুক্ত হয়েছিল। এই রকমই হয়ে থাকে। ত্রয়োদশ শতাব্দে দিগ্বিজয়ী রাজা নরসিংহদেবের কোণার্কমন্দির-রচনা, সেও গঙ্গা-রাজবংশের ও উৎকলের একটি আনন্দ উৎসাহ ও আত্মপ্রত্যয় -পূর্ণ পরম গৌরবের যুগেই সম্ভবপর হয়েছিল। জাতির ইতিহাসে এমন এক-একটা সময় আসে যখন বড়ো ডাক দিলেই বড়ো রকমের সাড়া পাওয়া যায়। হয়তো পূর্বগামী বহু শত বৎসর ধ'রে অলক্ষ্য প্রস্তুতি চলে। ভিতরে ভিতরে সবই যখন তৈরী হয়ে ওঠে তখন একটি মাহেন্দ্রক্ষণ এবং একটি ডাকের মতো ডাকের শুধু অপেক্ষা।

তাই এরূপ না ভেবে উপায় নেই, অজন্তা-বাগের ধ্রুবরীতি ভারতে প্রায় সর্বব্যাপী ছিল সূক্ষ্ম বা স্থূল আকারেও (সর্বসাধারণের মনোরঞ্জিনী ও সব সময়ের উপযোগী অন্য রীতিও অবশ্যই ছিল ওরই পাশাপাশি)— যখন ডাক পড়েছে বা জাতীয় হৃদয় আপনা থেকেই উচ্ছলিত হয়ে উঠেছে তখনই অগুণ্ঠিত অকুণ্ঠিত প্রকাশ দেখা গিয়েছে বৃহৎ শান্ত ভূমিকায়, বিশেষভাবে আরাধনায় আত্মনিবেদনে ও ভক্তিতে। একমাত্র, ব্যাপক আয়োজন, প্রাণস্পর্শী আহ্বান ও যথোপযুক্ত আশ্রয়ের অসদ্ভাবেই জাতীয় প্রতিভার স্ফূর্তি হয় নি বা হলেও নষ্ট হয়ে গেছে।

রক্তবীজ ট্র্যাডিশন তবু অজর, অমর ; কী ক'রে ছড়িয়ে পড়ে বা কী ক'রে টিকে থাকে কোনো পণ্ডিত ব্যক্তিই বলতে পারেন না, সিন্ধুসভ্যতার সার্থক কোনো কোনো নিদর্শনেও তা দেখা গিয়েছে। গোবীমরুর সুগভীর স্তরে কোন্ কবির শবাধারে কয়েকটি পদ্মবীজ পাওয়া গিয়েছিল ; দু হাজার বছরের পুরানো সেই বীজ উপ্ত হয়ে আজ, শুভ্র শতদল হাসছে পিকিঙের অমিতাভ মন্দিরে।[২০]

স্থাপত্যোচিত গাম্ভীর্যে, বিশালতায়, সংযমে ও সৌন্দর্যে বৃহদীশ্বর মন্দিরের কোনো তুলনা নেই। তোরণে বা মন্দিরে লগ্ন ভাস্কর্যেরও ঐ একই গুণাবলী। অতি বিশাল বৃষভরূপী নন্দী সামনের একটি মণ্ডপে। অত্যুচ্চ মন্দির, অতি প্রশস্ত অঙ্গন, অনেকগুলি পৈঁঠে ভেঙে উপরে উঠলে মুক্ত দ্বারপথে দেখা যায় উন্নতস্তম্ভ-সদৃশ বিশাল শিবমূর্তি, কৃষ্ণশিলাময় ললাটে রৌপ্যময় তিনটি স্থূলবঙ্কিম রেখা। গর্ভগৃহ বেষ্টন ক'রে ক্ষীণালোক প্রদক্ষিণপথ বর্তমানে রয়েছে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব-বিভাগের তত্ত্বাবধানে। রুদ্ধ দ্বার খুলিয়ে ভিতরে প্রবেশ ক'রে ও প্রখর বিদ্যুদ্দীপকের আভায় সবিস্ময়ে ডাইনে বাঁয়ে তাকিয়ে বুঝতে পারলেম না পূর্বে আলোকের কী ব্যবস্থা ছিল, কিভাবে শিল্পী ছবি এঁকেছে আর কিভাবেই বা দেখেছে পরিক্রমাপর নরনারী। দেখলাম, চোল-রাজবংশের চিত্রকৃতিকে সম্পূর্ণ আবৃত ক'রে পরবর্তী নায়ক রাজারা যা আঁকিয়েছিলেন অতিকৃত লোকচিত্র তাকে বলা যায়, তার বেশি নয়। বিগ্রহকে ডান দিকে রেখে গর্ভগৃহ প্রদক্ষিণ করছেন যে ভক্ত বা রূপরসিক তাঁর ঐ ডান দিকের দেয়ালে চোল-চিত্রকলা প্রায় সম্পূর্ণ ই উন্মোচিত হয়েছে। সেই এক ভাষায় সেই এক ভাবে কী তার বর্ণনা দেব ? বলে তো বোঝানো যাবে না। মেঘলোকে দু-চারটি 'অপ্সর-অপ্সরী'র বা মর্ত্যলোকের দু-চারজন উপাসক-উপাসিকার টুক্‌রা টুক্‌রা ছবি গ্রন্থে ও সাময়িক পত্রে ছাপা হয়েছে— সমুদয় ভিত্তিচিত্রের দর্শনযোগ্য 'পূর্ণ' প্রতিচ্ছবি মুদ্রিত হলে জানা যাবে, পূর্বপ্রকাশিত চিত্রাংশগুলি বিদ্বজ্জনের গবেষণার পক্ষে পর্যাপ্ত হতে পারে, রসিকের রসোপভোগের পক্ষে তেমন নয়। বিশাল ভিত্তিতল জুড়ে যা আঁকা হয়েছিল আর এপর্যন্ত উন্মোচিত হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য—

সন্ত সুন্দরমূর্তি নায়নার হাতীতে চেপে সশরীরে চলেছেন কৈলাসে, চেররাজপুত্র চলেছেন ঘোড়ায় আর তরঙ্গোদ্‌বেল মেঘলোকে চলেছে অন্তরীক্ষচারী স্ত্রী ও পুরুষ, নাচিয়ে ও বাজিয়ের দল।

বৃষভবাহিত দিব্যরথে যুদ্ধযাত্রা করেছেন ত্রিপুরারি, চতুর্মুখ ব্রহ্মা তাঁর

[২০] কিছুকাল পূর্বে সত্যই এরূপ একটি ঘটনা ঘটেছিল। সবিশেষ বিবরণ মনে না থাকায়, প্রয়োজনমত সেসব বানিয়ে নিতেই হল।

সারথি। মহেশের সঙ্গে রণবেশে ও যথোচিত বাহনে চলেছেন মহিষমর্দিনী দুর্গা, গণপতি ও ষড়ানন।

তাণ্ডব নৃত্যে মগ্ন রয়েছেন নটরাজ, প্রত্যেক পদপাতে কত ভুবনের সৃষ্টি হচ্ছে এবং বিনাশ হচ্ছে সে তাঁর খেয়ালের মধ্যে নেই। নিবাতনিষ্কম্প দীপশিখার মতো স্থির বুদ্ধের যে ধ্যান, একমাত্র তারই সঙ্গে এই তাণ্ডবের তুলনা আর তারই সঙ্গে ঐক্য ভিতরে ভিতরে। বৃহৎ পটে আত্মনিমগ্ন বিশাল দিব্যরূপে ও রূপের অপূর্ব ভাবলাবণ্যে কেন জানি নে মনে পড়ল অজন্তার প্রথম গুহার অবিস্মরণীয় পদ্মপাণি। আঙ্গিকের এবং রীতির দিক দিয়েও যথেষ্ট মিল আছে মনে হল, অন্তত অত্যন্ত অল্পকালের ভিতরে যতদূর দেখেছি।

সদাশান্ত তথাগতের পাদপদ্ম বন্দনা ক'রে যে ভারততীর্থদর্শন সূচিত হয়েছে বলতে পারি, এখানে তাণ্ডবমত্ত নটেশের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হয়ে তারই উদ্‌যাপন করা গেল। ভাবছি, ভারত শিল্পের তথা চিত্রকলার একটি উজ্জ্বল অতীত আছে— যতখানি তা জাদুঘরের জিনিস নয়, ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান -বিশেষের সতর্ক রক্ষণের দুর্লভ জড়সামগ্রী মাত্র নয়, তারই ধারাবাহী রূপে একটি বর্তমানও আছে, যতই দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব -সঙ্কুল হোক— কিন্তু, ভবিষ্যৎ কী ?

ভাবনা চলুক। উপস্থিত বহুধৈর্যশীল পাঠককে কঠোপনিষদের একটি শ্লোক[২১] উপহার দিয়েই বিদায় নেব। আত্মায় তাঁকে দেখা যায় দর্পণে (প্রায় প্রত্যক্ষ) দেখার মতো, স্বপ্নের মতো পিতৃলোকে, সলিলস্থ বস্তুচ্ছায়ার মতো গন্ধর্বলোকে, আর ছায়াতপযুক্ত (গড়ন-যুক্ত) ব্রহ্মলোকে।—

যথাদর্শে তথাত্মনি যথা স্বপ্নে তথা পিতৃলোকে।
যথাপ্সু পরীব দদৃশে তথা গন্ধর্বলোকে ছায়াতপয়োরিব ব্রহ্মলোকে ॥

২৩ আষাঢ় ১৮৭৯ শকাব্দ

[২১] শ্লোকের অর্থ স্বপ্রকাশ। তবু তো, শ্রীঅরবিন্দের প্রাঞ্জল ইংরেজি অনুবাদ না থাকলে, সহজ কথাকে সহজ অর্থে নেবার সাহস হ'ত না।

বর্তমান প্রবন্ধরচনায়, দুর্লভ পুস্তক ও পত্রিকা দেখবার সুযোগ দিয়ে সর্বপ্রকারে আনুকূল্য করেছেন শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ মহাশয়। এজন্য কৃতজ্ঞ আছি। কেরল ও তামিলভূমি -দর্শনের সঙ্গী শ্রীযুক্ত অরুণাচল পেরুমল, তেমনি অজন্তা-ইলোরা-আলমপুর-ভ্রমণের সঙ্গী শ্রীযুক্ত কালিদিণ্ডিমোহন বর্মা, এঁদেরও ঋণ শোধ করা যাবে না, উল্লেখমাত্র থাক্— উভয়েই লেখকের সতীর্থ।

কালীঘাটের পট

'বিচিত্রা'-ভবনের এই ঘরে পশ্চিমের জানলা খুলে হঠাৎ এক-একদিন মনে হয়, কাংড়া কলমের একখানা ছবি দেখছি, ইতিপূর্বে কোনো চিত্রশালায় তা দেখি নি। সত্যের অনুরোধে এ কথাও বলতে পারি, আলো-চোরা কোনো আষাঢ়ের বিকাল-বেলায় ভাবি, সম্রাট্ হুইৎসুঙ্গের আঁকা দ্বাদশ শতাব্দীর একখানা ছবি, গিরি নির্ঝর পাইন ও অপার শূন্যতা, সেই কি কোনো যাদুদণ্ডস্পর্শে অকস্মাৎ প্রাণ পেয়ে উঠল? ক্যামেরার সাক্ষ্য হাজির করলে দেখা যাবে— না, কোলকাতা শহরের স্তূপাকার বাড়ি একটার পিছনে আর-একটা (ট্রামের ঘণ্টাধ্বনি কানে আসে— রাস্তার লোক-চলাচল দেখা যাচ্ছে না বটে), গলির মোড়ে বুড়োশিবের-আস্তানা-আশ্রিত বুড়ো অশথের আকাশ-ছোঁওয়া ডালপালায় পর্যাপ্ত পল্লব, আর দৃষ্টির শেষ সীমায় হাওড়া-ব্রিজের লৌহময় একটা স্কন্ধ দিগন্তে উদ্যত, সন্ধ্যা হতে না হতেই অন্ধ ড্রাগনের হারানো এক-চক্ষু ঐখানে রক্ত আভায় জ্ব'লে ওঠে। নাহয় সবুজ, পীত, ধূসর, সাদা, নীল ও লোহিত রঙের অসদ্ভাব নেই; আকাশ-অভিমুখী রেখার বিচিত্র সমাবেশ আছে ইঁট কাঠ লোহায় আর বিরল বিটপীতে— তা ব'লে কাংড়া কলমের ছবি আর চীনা ল্যাণ্ড্স্কেপ? ও শুধু ভাবুকের খেয়াল আর দৃষ্টির বিভ্রম। লালবাজার হাইকোর্ট্ আর হাওড়ার হাটে আনাগোনা না ক'রে— সিনেমা-থিয়েটার না দেখে— লুপ্ত বা জরাজীর্ণ নানা যুগের, নানা জাতির, সচিত্র ইতিহাস ঘেঁটে আর ছিন্নবিচ্ছিন্ন পুঞ্জিত নিদর্শনে দৃষ্টি আবদ্ধ রেখে, হয়তো বা ত্রাটকযোগ অভ্যাস ক'রে— এরূপ শোচনীয় পরিণামে অবশ্য পৌঁছুতে হবে।

সে কথা মানতে পারি। কিন্তু, কালীঘাটের অজ্ঞাতনামা পোটোর আঁকা হর-গৌরীর এই সাদাসিধা ছবিটিতে একটা যুগ একটা জাতি চক্ষুষ্মান মাত্রেরই চোখের সামনে জেগে উঠেছে, জীবন্ত হয়ে উঠেছে— এটাকে কখনোই মনের ভুল বলতে পারব না। দু-শো তিন-শো বছর কোথায় গেল কেউ তা জানে না; প্রাণে-ভরা পল্লী, গোলায়-ভরা ধান, প্রাচীন দিঘির ঘাটে সকাল-সন্ধ্যায় নারীকণ্ঠের হাস্যকাকলি, সুর ক'রে শোনানো ছেলে-ভুলোনো ছড়া আর অপরূপ রূপকথা, সে হয়তো চির-পুরানো আর চির-নূতন চাঁদই দেখেছে আর শুনেছে— আমাদের কার বা সে সৌভাগ্য হয়েছে? রাগ আর তাল ব্যতীতই মনে মনে গুন্‌গুন্ করতে পারি প্রাণ-পণে বাস-দণ্ড ধ'রে ঝুলতে ঝুলতে (পারি কি?)—

> জি. পি. ও.তে ঘণ্টা বাজে, সময় নাই রে হায়,
> ঘর্ঘরিয়া চলেছি আজ কিসের ব্যর্থতায়!

কোলকাতা শহরের এক টেরে ব'সে আদি গঙ্গার ধারে গোলপাতা-ছাওয়া কোনো এক পর্ণকুটীরে (তখনো ধান-পাটের ক্ষেত ছিল আশেপাশে, রাত্রে শেয়াল ডাকত প্রহরে প্রহরে —এ তো অনায়াসেই অনুমান করা যায়) যে শিল্পী, যে কারিগর এই পট এঁকেছিলেন, দু-চার পয়সার বেশি কী এর মূল্য হতে পারে স্বপ্নেও ভাবেন নি, অজ্ঞাত পরলোক থেকে তাঁর দৃষ্টি যদি এ লেখায় পড়ে আধুনিক শহর-বাসী 'শিক্ষিত' জনের প্রগল্‌ভতা তিনি ক্ষমা করুন। চিরকালের কানে বাজতে থাকবে এমন কথা তিনি বা তাঁর সজাতি কেউ কইতে শেখেন নি, আর না-শেখায় কিছু ক্ষতিও হয় নি, চিরকালের চমৎকৃত দৃষ্টিতে বিরাজ করবে এমন অনেক-কিছুকে রূপ দিয়ে গেছেন— যদিও কাগজ অতিশয় সস্তা রকমের, উপকরণ অতিশয় অল্প, বিষয়ের ঘটা-পটা বিশেষ কিছু নেই— এবং ধ'রে ধ'রে কাজ করবার, সূক্ষ্ম কাজ করবার, প্রাচীন পরম্পরাগত রঙের রুচি প্রকাশ করবার সময় সুযোগ আর প্রয়োজনও দেখা যায় নি।

প্রসঙ্গক্রমে পুরোনো দুঃখের কথাটাই বলি। আজও এ দেশের রাষ্ট্র সমাজ ও সংস্কৃতির যা-কিছু উল্লেখযোগ্য আলোচনা, প্রকাশিত হচ্ছে ইংরেজী ফরাসী বা জর্মান ভাষায়। বাংলায় বা হিন্দীতে তেমন নয়, অথবা আদৌ নয়। কালীঘাটের পট সম্পর্কেও বিলাত থেকে একটি বই এই প্রথম বেরিয়েছে কয়েক বৎসর হল। তার দোষ ত্রুটি দেখানো কঠিন কিছু নয়। কিন্তু, এ দেশেই কালীঘাট পটের উদ্ভব, এখানেই নানা জায়গায়[১] তার সুসমৃদ্ধ সংগ্রহ আজও আছে, ঐ চিত্ররীতির অক্ষম বা অনাবশ্যক অনুকরণেরও বিশেষ অভাব হয় নি— অথচ, এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা অতিশয় অল্প, আর সুমুদ্রিত সংকলন কিছু আছে ব'লে জানি নে। কালীঘাট-পট সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য আলোচনা করেছেন শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ, বোধ হয় ১৯২৬ সালেই প্রথম ; নিপুণ ও দরদী সমঝদারের চোখ দিয়ে দেখে সংগ্রহও করেছেন অমূল্য সব নিদর্শন— বিস্তারিত বিবরণ বিশ্লেষণ ও আলোচনা এখনো এ দেশ থেকে সর্বসমক্ষে প্রকাশলাভ করে নি। (সত্য বলতে হলে, 'সর্ব-সমক্ষে' হল একটা বাঁধা বুলি, এ ব্যাপারে দেশীয় 'সর্ব'জনের আদমসুমারি না নেওয়াই ভালো।)

কালীঘাটের পট বাংলা সুচিরাগত পট আঁকারই একটি বিশেষ ধরণ, বিশেষ পরিণতি। ইংরেজ-রাজত্বের শ্রীবৃদ্ধির সূচনায়, কালীঘাট-সুতানুটির রূপসমৃদ্ধিশালিনী কলিকাতা-নগরীতে পূর্ণ পরিণতির অনেক পূর্বেই, প্রায় শতবর্ষ সময়ে তার উদ্ভব বিকাশ ও বিলয়। দূরকাল থেকে কয়েকটি নাম মাত্র এ কাল অবধি এসে পৌঁছেছে :

১ যেমন, শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষের সংগ্রহে, বিশ্বভারতীর কলাভবনে, রবীন্দ্রভারতীতে।

নীলমণিদাস, বলরামদাস, গোপালদাস। আমরা অজিতবাবুর কাছে শুনেছি সাবলীল তুলি দিয়ে টানা কালো রেখার রূপই হল এই পটের আদিম চেহারা। তুলি দিয়ে আঁকবার আগে পেন্সিল দিয়ে হাল্কা হাতে একটি আদ্রা আঁকা হয়েছিল, এমনও দেখা যায়— এটি কিন্তু উত্তরকালীন রীতি। আর, নিতান্তই সহজলভ্য হলুদ, নীলবড়ি, আলতা ও ভুষোর মিশ্র বা অবিমিশ্র প্রয়োগে রূপের রঞ্জন এটি আরও পরবর্তী ব্যাপার। কালো রেখার ড্রয়িঙের উপর রঙ বুলিয়ে তাকে অধিকতর জনমনোহারী করা হয়েছে এও যেমন দেখা যায়, পেন্সিলে আঁকা রূপের আভাসকে রঞ্জিত করা হয়েছে, কালো রেখার কাজ শুরু হয়েছে বা পরে হবে— এরূপ পটেরও অভাব নেই। ফলতঃ সাবলীল বলিষ্ঠ রেখাতেই কালীঘাট-পটের অতুলনীয় বিশিষ্টতা।

অথবা, 'অতুলনীয়' কথাটা একেবারে নির্‌ভুল হল না ; দেশী ও বিদেশী গুণিগণ, রসিকগণ, বহুপ্রাচীন অজন্তা-বাগের রেখার সঙ্গে এর সাদৃশ্য দেখেছেন। এ রেখাই কথা কয়, কোনো রকমে বস্তুকে ঘের দিয়ে ঘিরে রেখেছে ('আউট্‌লাইন' বললে ঠিক যা বোঝায়) তা নয়। রূপের গড়ন, গড়নের বিভিন্ন স্থলের কঠিন বা কোমল ভাব, স্বভাবস্থিরত্ব সত্ত্বেও সারা পটে একটি নিরন্তর গতির ব্যঞ্জনা, রেখারই নিজস্ব এক শ্রী ও শক্তি যা লেখাঙ্কনের মতো সচেতন ও সর্বেসর্বা না হয়েও কতকটা লেখাঙ্কনের গুণোপেত— এ-সবই এই রেখায় নিহিত আছে। কালীঘাট-পটের উৎকৃষ্ট নিদর্শন-গুলি দেখলে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকে না। (দুঃখের বিষয়, মূল চিত্রে রেখার যে অপরূপ লাবণ্য ও আশ্চর্য শক্তি, প্রতিচিত্রে তার অল্পই আভাস আছে।) আমার মনে হয়, এরূপ রেখাকেই আচার্য নন্দলাল তাঁর 'শিল্পচর্চা' গ্রন্থে 'গড়নের রেখা' অভিধা দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। নানাভাবে এর দূর-দেশকাল-ব্যাপী পরম্পরা চলে আসছে পনেরো-কুড়ি হাজার বৎসরের প্রাগৈতিহাসিক গুহাচিত্র থেকে আজ পর্যন্ত। পূর্বেই এক-প্রকার বলেছি, জৈন পুঁথিচিত্রের ঘের-দেওয়া রেখা আর পারসিক-চিত্রের লেখাঙ্কনের রেখা থেকে এ পৃথক— উভয়ের মধ্যবর্তীও বলা চলে। আকার-সংঘটনের ব্যাপারে অপ্রধানও নয়, স্বপ্রধানও নয়, আকারের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী-ভাবে মিলিত, এমন-কি একাত্ম। প্রাণময়, বাঙ্ময়। রূপরচনার ষড়ৈশ্বর্যে মণ্ডিত হয়ে এর পরমোৎকর্ষ দেখা যায় অজন্তা-বাগের উৎকৃষ্ট সৃষ্টিনিচয়ে। শত শত বৎসর ধরে ক্রমবিকশিত ধারার একটি পরম পরিণাম সেখানে আমাদের দৃষ্টি-গোচর। কিন্তু, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের তুলনায় চিত্রের আধার ও উপকরণ প্রায়শই অচিরস্থায়ী হয়ে থাকে ; তাই উক্ত চিত্রশৈলীর পূর্বে কী ছিল আর পরে কী হয়েছে তার নিদর্শন পাওয়া যায় অল্পই, ধারাবিবরণ দেওয়া কারও সাধ্যায়ত্ত নয়। তবু সারা ভারতের এখানে সেখানে, প্রাচীরে আর পুঁথিতেও, তথা সিংহলের

সিগিরিয়ায় আর ব্রহ্মদেশে পাগানের প্রাচীর-চিত্রাবলীতে[২] ঐ একই রীতির বহুধা বিকাশ দেখা যায়। খৃস্টীয় পঞ্চদশ শতকের শেষে বা ষোড়শ শতকের প্রথমে রাজা মানসিংহের প্রাসাদ-ভিত্তিতে যে চিত্রকল্পনা রূপ পেয়েছিল সুধীজন তাতেও দেখেছেন অজন্তাচিত্রশৈলীর বিশেষ প্রভাব। আকবর জহাঙ্গীর শাজাহান বাদশার কালে এসে কি সে ধারা লুপ্ত হয়ে গেল? গেল ব'লেই শোনা ছিল। কিন্তু, সম্প্রতি দু-একখানি গ্রন্থে (অবশ্য, ফ্রান্সে বা লণ্ডনে প্রকাশিত, ফরাসী বা ইংরেজি ভাষায় ব্যাখ্যাত) মোগল-চিত্ররীতির যে বিস্ময়কর পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, তাতে আমাদের মতো বিদ্যাহীন ব্যক্তির বলতে বাধা নেই যে, ভারতের চিরাগত রীতির সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ, এমন-কি অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ উজ্জ্বল ভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। পারস্য থেকে একটা প্রভাব এসেছিল সত্য, আকবরের সময়ে তার প্রতি পদক্ষেপ গুনে গুনে দেখানো যায় সেও সত্য; কিন্তু সে প্রভাবকে সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করে ভারতের নিজস্ব প্রতিভার পরিচয়পত্র-রচনা ও স্বাক্ষর-লিখন ভারতীয় চিত্রকরগণের অসাধ্য হয় নি। ধর্মে তাঁরা কেউ হিন্দু, কেউ মুসলমান; প্রতিভায় তাঁরা ভারতীয় ছাড়া আর কিছু নন। অনেক সময় একই চিত্রে দক্ষতা দেখিয়েছেন ফরুক্ বেগ ও বসন, শংকর ও মুশ্‌কিন। অপূর্ব রূপসৃষ্টির কোথাও কোনো ভেদের রেখা পড়ে নি। পূর্ববর্তী পণ্ডিতেরা যাই বলুন, আকবরের পরে মোগল-চিত্রের ক্রমাবনতি দেখা যায়। সে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। এটুকু বললেই যথেষ্ট বা যথেষ্ট'র

[২] এই প্রাচীরচিত্রাবলী সম্পর্কে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ জ্ঞান চিত্রবিদ্ রসিক-মহলেও কতদূর সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। অধুনা প্রকাশিত *The Art and Architecture of India* (*The Pelican History of Art Series*) গ্রন্থে একটিমাত্র বাক্যে বলা হয়েছে: Such fragments of thirteenth-century wall-paintings as survive in various shrines near Pagan are clearly derived from the style of Tantric painting of Bengal.

অর্থাৎ, পাগানের বিভিন্ন মন্দিরে লুপ্তাবশিষ্ট ভিত্তিচিত্র যা আবিষ্কৃত হয়েছে তাতে বাংলার তান্ত্রিক চিত্ররীতির সঙ্গে যোগ স্পষ্টভাবে প্রকটিত। (তান্ত্রিকরীতি বলতে, তান্ত্রিক তাল-পাতার পুঁথি-চিত্রণে যে রীতি দেখা যায়।) গ্রন্থকার উল্লিখিত ভিত্তিচিত্রাবলী নিজে কতদূর পর্যালোচনা করেছেন বোঝা গেল না। কেননা, গান্ধার ভাস্কর্যের অজস্র প্রতিচিত্র দেওয়া হয়েছে— অনেকটা অনাবশ্যক— অজন্তা-গুহার চিত্রও অবশ্য আছে, নেপালী তন্ত্রগ্রন্থের একটি চিত্র আছে, পাগান-প্রাচীর-চিত্রের সন্ধান পাওয়া যায় না। ভারতীয় চিত্রকলার পরম্পরায় ও সামগ্রিক বিবরণে এর স্থান কোথায় সংক্ষেপে তার আলোচনা করেছেন শ্রীনীহাররঞ্জন রায়, ১৩৪৫ বৈশাখের প্রবাসীতে 'পাগানের প্রাচীর-চিত্রাবলী' প্রবন্ধে। তাঁর অন্য একটি প্রবন্ধে অপেক্ষাকৃত বিশদ আলোচনা আছে, সে হল: *Paintings at Pagan: Journal of the Indian Society of Oriental Art, June-Dec., 1938.*

চিত্রপুত্তলি

শ্রীনন্দলাল বসু

বনভূমে যূথপতি । ছদন্ত জাতক । দশম গুহা । অজন্তা । খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দের শেষে বা প্রথমের সূচনায়

রাজান্তঃপুর : ছদন্ত জাতক । দশম গুহা । অজন্তা : ৬০-পৃষ্ঠার সম্মুখীন চিত্র দ্রষ্টব্য । হস্তীযূথ উহার বামে, এই চিত্র দক্ষিণে স্থিত
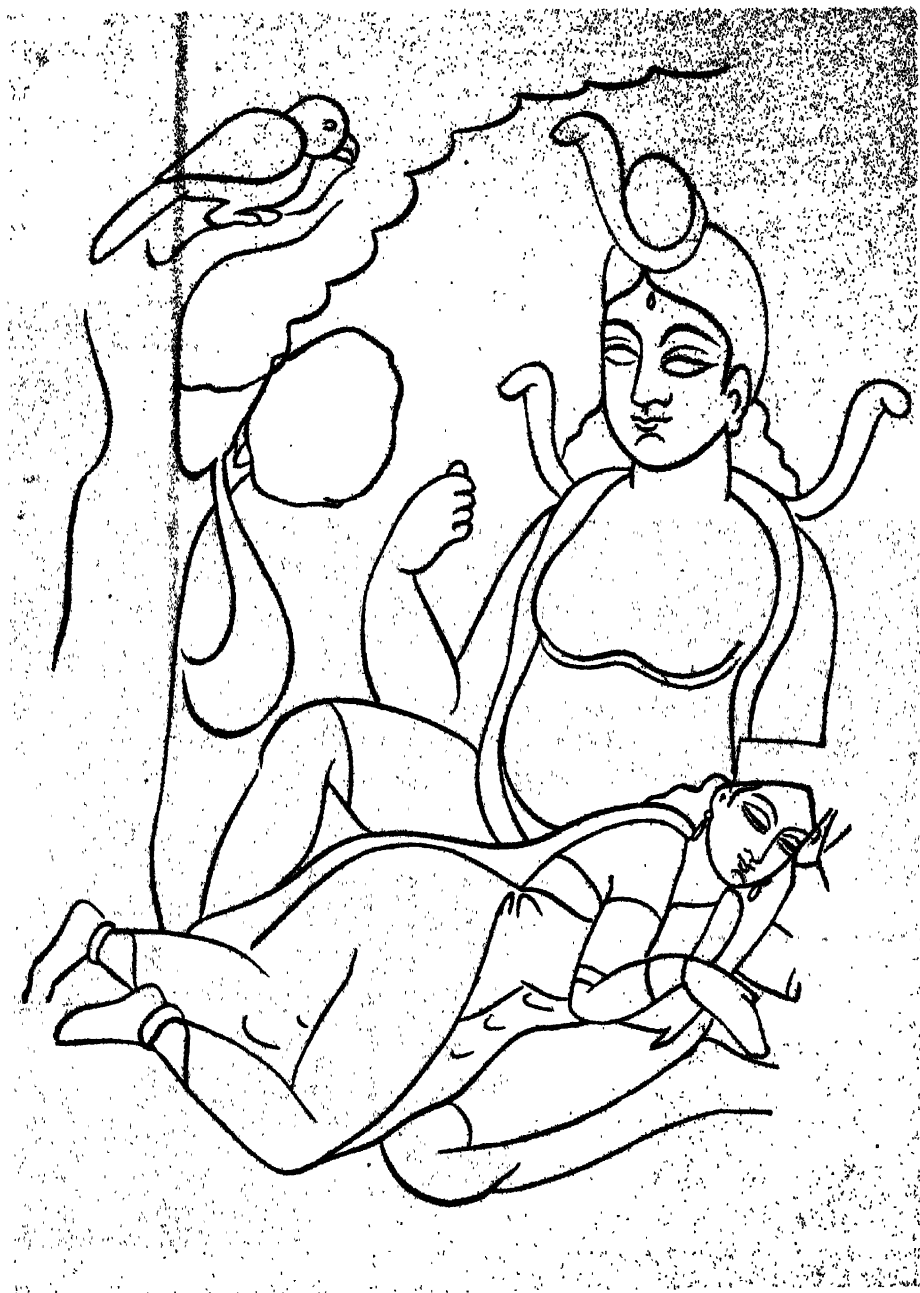
হরগৌরী

কালীঘাট

বেশিই হবে যে, আকবরের আমলের এই-সব শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিতে সাবলীল রেখার ব্যবহারে, রূপকল্পনার সাহসে ও স্বাচ্ছন্দ্যে, পটভূমির সমস্ত ফাঁক ভ'রে দেওয়ার প্রবণতায়— অজন্তা-বাগ-গুহার ছবির সঙ্গে সাদৃশ্য এবং সাজাত্য রয়েছে প্রচুর। অজন্তা-বাগ-গুহার চিত্রকলা যেমন মূর্তিকলার সঙ্গে সহোদর ভাই-ভগিনী সম্পর্কে বাঁধা, এও তাই। অর্থাৎ এতেও গড়ন আছে, ছায়াতপের বাড়াবাড়ি নেই। বলা যেতে পারে স্বভাব নেই তা নয়, স্বভাবের অনুকরণ নেই। পারস্য-চিত্রকলার জাতই আলাদা। আর, আকবর-পরবর্তী চিত্রকলাও ক্রমে ক্রমে তার স্বধর্ম থেকে চ্যুত হয়েছে। 'সে প্রচণ্ড গতি অবসান'। 'নিরক্ষর' আকবরের ধৈর্য বীর্য, গ্রহণক্ষম উদারতা, সংগঠনশক্তি ও সমন্বয়ভাবনা পরবর্তীদের ছিল না। তাঁরা পূর্বপুরুষার্জিত ঐশ্বর্য ভোগদখল করেছেন— জড় ঐশ্বর্য— প্রাণপ্রবাহ ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে এসেছে। মোগল চিত্রকলার এই সাক্ষ্য। নব-অভ্যুদিত পাশ্চাত্য প্রভাবে প'ড়ে নিষ্প্রাণ অনুকরণে তার অকাল মৃত্যু।

এ কথা জানা আছে, যে কালে সাম্রাজ্যের উত্থানপতন হতে থাকে বড়ো বড়ো রাজধানীতে আর বিভিন্ন রণক্ষেত্রে, ঠিক সেই সময়েই পল্লীর লোকেরা চাষ-আবাদ করে, বাউল ভাটিয়ালি গান গায়, পিঁড়ি আঁকে, পট আঁকে, আর চিরকেলে সুখে দুঃখে দিনাতিপাত করে। অন্তত বিগত দুটি বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত এইভাবেই চলেছিল। অর্থাৎ, এক কালে পাটলিপুত্রে উজ্জয়িনীতে আর বহুপরবর্তী কালে দিল্লি আগ্রা লক্ষ্মৌ শহরে, সম্রাট্ ও শ্রেষ্ঠী, বাদ্‌শাহ ও আমীর-ওম্‌রাহ— এঁদের আনন্দজনক ও আদরণীয় যে ভাবের কাব্য সংগীত চিত্রকলাই চলুক, সে-সব যত উন্নত বা কালক্রমে যত অবনতই হোক, সমস্ত দেশ ব্যেপে, সমাজ ব্যেপে, সর্বসাধারণের স্তরে ঐ-সবের আর-একটা ধারা হয়তো চলত যাকে পণ্ডিতগণ বলেন লৌকিক, কেউ উপেক্ষা করেন, কেউ বা মাত্রাতিরিক্ত বহুমানও দিয়ে থাকেন— এই লৌকিক সাহিত্য শিল্প সংগীতেরও ধারা চলে আসছে স্মরণাতীত কাল থেকে। বর্তমান যন্ত্রযুগে পৃথিবীর আয়তন দেখতে দেখতে 'ছোটো' হয়ে আসছে, সর্বস্তরে যোগাযোগের ব্যবস্থা হয়েছে দ্রুত ও প্রচুর, তাই সমাজও এসে পড়েছে রাষ্ট্রেরই মুঠোর মধ্যে— পূর্বে এমন ছিল না। অথচ তলে তলে যোগ থাকত সমাজের সর্বস্তরে। প্রত্যক্ষ প্রভাব এসে পড়ত না শহর থেকে পল্লীতে, বিক্রমাদিত্য বা আকবরের রাজসভা থেকে কৃষিজীবী-শিল্পজীবীর শান্ত জীবনে প্রতিদিন। এতে যে সবটাই ছিল লোকসান এমনও বলতে পারি নে।

কালীঘাটের পটই তার অন্যতম প্রমাণ নয় কি? মোগল-সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের সঙ্গে, মোগল-চিত্রকলার বিকাশ ও বিকারের সঙ্গে, পুরুষানুক্রমে অচ্ছেদ্য-ভাবে জড়িত থাকলে গোপাল-নীলমণি-বলরামের আঁকা এই সহজ সরল সবল

অঙ্কনরীতির সাক্ষাৎ মিলত কি? এ দেশের যা চিরন্তন প্রাণধারা সৃষ্টিধারা তার নিঃশব্দ সঞ্চার চলে এসেছে যুগ থেকে যুগে, প্রদেশ থেকে প্রদেশান্তরে, তার জন্যে এঁদের প্রতিদিন দিল্লি আগ্রা মুর্শিদাবাদের মুখ চেয়ে থাকতে হয় নি, কোনো আর্ট্ স্কুলেও ভর্তি হতে হয় নি। বস্তুতঃ, যখনই কোলকাতা শহর ফুলে ফেঁপে উঠতে লাগল, অন্য অনেক জিনিসের সঙ্গে সঙ্গে আর্ট্ স্কুলেরও উৎপত্তি হল, তখনই কালীঘাটপটের মুমূর্ষু দশা এসে গেল। যুগের প্রভাব এসে পড়ল সুচিরাগত ধারায়, ধরণে। তার সচিত্র ইতিহাস লেখা কিছু কঠিন নয়। কালীঘাট-পটের বিচিত্র বিবর্তনের প্রচুর সাক্ষ্য প্রমাণ এখনও সব নষ্ট হয় নি বা বিদেশে চলে যায় নি।

রেখাই কালীঘাট-পটের প্রায় ষোলো আনা। পরবর্তী কালের ছবিতে রঙ দেওয়া হয়েছে বটে, রঙের বিচিত্র ব্যঞ্জনা আর অতুল ঐশ্বর্য তেমন নেই।[৩] সর্বদাই

৩ বর্তমান গ্রন্থে মুদ্রিত 'গোষ্ঠলীলা' ছবিটি 'জাত কালীঘাটের পট' নয়। কালীঘাট অঞ্চলেই আঁকা হয়ে থাকতে পারে, কোনো কালীঘাট-পটুয়ারই তুলিতে অথবা তাদের কোনো জ্ঞাতিকুটুম্বের। পীতাম্বর বললে যেমন পীত বস্ত্র বা পীতবস্ত্রধারী ব্যক্তি না বুঝিয়ে বিশেষ ক'রে শ্রীকৃষ্ণকেই বোঝায়, 'কালীঘাট-পট' শব্দও তেমনি তার আদিম পরিচয়-গত বা ব্যুৎপত্তি-গত অর্থকে অতিক্রম ক'রে বিশেষ একটি রূঢ় বা যোগরূঢ় অর্থের ব্যঞ্জনা দিচ্ছে। গ্রন্থশেষে সঙ্কলিত পূজনীয় শ্রীনন্দলাল বসুর চিঠিতে সেটির ব্যাখ্যা রয়েছে। 'গোষ্ঠলীলা' ছবিটি লিপ্তপদ্ধতিতে আঁকা, বা টেম্পারা। অঙ্কন শুরু করবার পূর্বেই সাদা আস্তরণে 'জমি' তৈরি করা হয় নি সত্য— তবু অনচ্ছ ভারী রঙে, সাদা-মেশানো রঙে, লেপন ক'রে ক'রে এবং ধ'রে ধ'রে কাজ করা হয়েছে। গড়ন ফোটাবার জন্য ভারতের নিজস্ব পদ্ধতিতে (যেমন অজন্তায়, যেমন উৎকৃষ্ট মোগল-চিত্রে) ছায়াসুষমার নিপুণ প্রয়োগ আছে, পর্দাজ্ব বা স্টিপ্লিং আছে। আকাশের সবটায়, তা ছাড়া কোথাও কোথাও জমিতে ও গবাদির দেহে, কাগজের রঙটি কাজে লাগানো হয়েছে অতি অপূর্ব দক্ষতায়। কালীঘাট-চিত্রের সজাতীয়তা এর বলিষ্ঠ এবং সাবলীল কালো রেখার ছন্দে— রঙ লাগাবার আগেই সেই রেখাপাত একরূপ সারা হয়েছিল মনে হয়। রেখা ছাড়া, রূপকল্পনারও বিশেষ লাবণ্যে ও কমনীয়তায় বাঙালির জাতিগত প্রতিভার বিশেষ ছাপ রয়েছে। গোরু-বাছুরগুলিতে পর্যন্ত একপ্রকার নিহিত মানবতা ফুটে উঠেছে, কৃষ্ণ-বলরামে একটা যেন অদ্ভুত বাৎসল্য ও প্রীতি; এরা যে ষোলো-আনা অ-বোলা জীব তা মনে হয় না। ফলতঃ, রাজস্থান-কাংড়ার পটুয়াদের ক্ষেত্রে যেমন তেমনি সময়-সুযোগ উপায়-উপকরণ ও ইচ্ছার সংযোগে, রাজা-মহারাজা বণিক-ধনিকের সমাদরপূর্ণ অকুণ্ঠ পোষকতায়, বাঙালি পটুয়ার ছবি যেমন রেখায় তেমনি রঙে কী রুচি এবং কতখানি ঐশ্বর্য প্রকাশ করত এই চিত্র যেন সেই সম্ভাবনারই স্ফুট ইশারা। হয়তো বা ঠিক বলা হল না। কারণ, এই চিত্রে বাংলাদেশের ধারাবাহী পটের সম্ভাবনার ইশারা শুধু ছিল না, অতীত ইতিবৃত্তও প্রচ্ছন্ন। প্রাচীন পুঁথির পাটায় যে রূপ ও রঙের রুচি আবিষ্কৃত হয়েছে তাই শুধু নয়, বিষ্ণুপুর অঞ্চলে এমন পট (বরাহ-অবতার?) পাওয়া গিয়েছে ও আমরা দেখেছি

এটা মনে রাখতে হবে, কার জন্য পট এঁকেছিল পটুয়া, কতটুকু সময়ে, কী সামান্য উপকরণে— কী দর আর কতই বা সমাদর পেয়েছিল। তার কদরদাঁ ছিল না আমীর-ওমরাহ রাজা-মহারাজা। ম'রে ভূত হয়ে যাওয়ার আগে নবসভ্যতাভিমানী নূতন-শিক্ষিত জনের সঙ্গেও তার জানাশোনা ছিল কি? সব তথ্য বর্তমান লেখকের জানা নেই। এটা জানি, উঠতি শহরের প্রান্তে জাগ্রত কালীমায়ের রক্তপদতলে রক্তজবা ও বিল্বদল যারা দিতে আসত তারাই ছিল এর ক্রেতা, কোম্পানির-ছাপ-মারা বা মহারাণী-ভিক্টোরিয়ার-মুখ-আঁকা দু-চারটে তামার পয়সায়। থালা-বাটি, সাঁড়াশি-খুন্তি, তাঁতের কাপড় আর ছেলে-ভুলোনো কাঠের বা মাটির পুতুল কিনত— সেই

যাতে কাংড়া-রাজস্থানের ছবির মতোই ধ'রে ধ'রে কাজ করা হয়েছিল, অষ্টাদশ শতাব্দের শেষভাগে। পুরোপুরি টেম্পারা ছবি; পিউরি হলুদ, রাজাবর্তের নীল, লাল, সবুজ, সাদা, বিচিত্র রঙের সমাবেশ তাতে— যেমন উজ্জ্বল তেমনি স্নিগ্ধ, আর তেমনি সমন্বিত। এরূপ অন্য ছবিও দেখা যায়। রূপ রেখা রঙ ও অলংকরণের মনোহারী সমাবেশের গুণে কাংড়া বা রাজপুত ছবির সঙ্গে তাদের তুলনা হতে পারে। ফলতঃ, 'গোষ্ঠলীলা'র যে চিত্রশৈলী, বাংলাদেশে তারও ধারা অনেক দিন থেকে চলে আসছিল সন্দেহ নেই। দুঃখের বিষয় নিদর্শন তার অল্পই রক্ষা পেয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে, ভারতের ইংরেজ সরকার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত *Art-Manufactures of India* (*1888*) গ্রন্থে, অভিজ্ঞ লেখক ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় তৎকালীন বাংলা পট সম্পর্কে বলতে গিয়ে যে তথ্য দিয়েছেন তাও উদ্ধারযোগ্য—

Until recently, a superior kind of water-colour paintings was executed in Bengal by a class of people called the *Patuas*, whose trade was also to paint idols for worship. These paintings were done with minute care, and considerable taste was evinced in the combination and arrangement of colours. The industry is on the decline, owing to cheaper coloured lithograph representations of Gods and Goddesses turned out by the ex-students of the Calcutta School of Art having appeared in the market. A painting in the old style can still be had, by order, at a price of Rs. 10 and upwards.

['বরাহ-অবতার' বা 'গোষ্ঠলীলা'র সজাতীয় চিত্র]।

The *Patuas* now paint rude "daubs" which are sold by thousands in stalls near the shrine of Kalighat ... ... at a price ranging from a farthing to a penny.

[দু-পয়সা চার-পয়সার বেশি দাম নয়]

উল্লিখিত 'বরাহ-অবতার' চিত্র বা ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের প্রচুর তথ্য-পূর্ণ গ্রন্থখানি সম্পর্কে শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ মহাশয় আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। কালীঘাট-পটের পূর্বাপর ইতিহাস তথ্যের দিক দিয়ে অনেকটা পরিস্ফুট হল, সত্যের দিকটা স্বতন্ত্র— বিশেষ দেশকালের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা আঘাত-ব্যাঘাতের বহু ঊর্ধ্বে।

সঙ্গে কিনত দু-একখানা দেবদেবীর পট। পশুপক্ষীর ছবি[8] আর হাসি-মশ্‌করা ব্যঙ্গবিদ্রূপের নক্সাও কিনত। কিন্তু কতদিন আর কিনেছিল? বৌবাজার আর্ট্‌ স্টুডিও'র রঙিন লিথো-ছবি পাওয়া যেতে লাগল অল্প দামে। কালীঘাট-পটের চেয়ে কত যে চমৎকার! যতদূর তার শক্তি ও সম্বল, রঙ দিয়ে, বিষয়বৈচিত্র্য দিয়ে, ব্যঙ্গ দিয়ে, বিমুখ জনমানসকে ধরে রাখতে চেয়েছিল দরিদ্র পটুয়া। শেষ পর্যন্ত পারে নি। গ্রামে ফেরে নি নিশ্চয়, এখানেই কোনো রকমে শেষ দিনগুলি কাটিয়েছে প্রায় নিঃসম্বল, এবং রুগ্‌ণা স্ত্রীর হয়তো চিকিৎসা করাতে পারে নি, বয়স্থা মেয়ের বিয়ে দেওয়া হয় নি এবং ছেলেটা বড়ো হলে বড়ো লোকের দ্বারে ধন্না দিয়ে হয় তাকে খানসামাগিরিতে ভর্তি করেছে, নয়তো কি আর্ট্‌ স্কুলে?

এ-সব ইতিহাসই হারিয়ে গেছে। সুখের বিষয়— বড়ো জিনিস মরে না, হারায় না। বারে বারে চিতাভস্ম থেকে ওঠে নবদেহ পেয়ে পুরাণপ্রথিত বিহঙ্গের মতো। সে আলোচনা আজ নয়।

কালীঘাট-পটের বিস্তারিত ইতিবৃত্ত-রচনার বা নিখুঁত বিশ্লেষণের অবকাশ নেই। যোগ্যতর ব্যক্তি সে কাজে প্রবৃত্ত হবেন। আমাদের কাজ সাহেবেরাই সব করে রেখেছেন অথবা করবেন, আশা করি এ ভাব চিরদিন থাকবে না।

[8] নির্দিষ্ট কতকগুলি বিষয় নির্দিষ্ট ভঙ্গীতে আঁকা হ'ত। যেমন সাপে ব্যাঙ ধরেছে, বিড়ালে মাছ বা পাখি শীকার করেছে, অথবা দুটি টিয়া পাখি এক গাছের ডালে উড়ে বসেছে। কালীঘাট-পটুয়াদের রূপ লেখবার বা বিষয় সাজাবার রীতি যে বিশেষ ভাবে আলংকারিক, সাবলীল রেখার ছন্দে বাঁধা— এ কথা না বললেও চলে। সেই মণ্ডনধর্মী রেখার ছন্দ টিয়াপাখির ছবিতে একান্তভাবে প্রকট, অন্য ছবিগুলিতে অন্যান্য গুণের সঙ্গে সমন্বিত হয়ে কোনো-একটি লৌকিক বা অলৌকিক আখ্যান বলবার দায় নিয়েছে এইমাত্র— নষ্ট হয় নি বা চাপা পড়ে নি।

লৌকিক শিল্পে কতকগুলি বাঁধা-ধরা বিষয়, রূপ, ভঙ্গী ও বিন্যাস থাকে। কতকাল পরে পরে কোনো শিল্পী যখন নতুন একটি রূপকল্পনা করে এবং সেটি স্বগোষ্ঠীতে ও রসিকসমাজে আদৃত হয়, তখন সেই শিল্পীর বংশপরম্পরায় তারই অনুকরণ বা অনুসরণ চলে দীর্ঘকাল ধ'রে। এরূপ কতকগুলি রূপকল্পনা থাকে এক-এক শিল্পীপরিবারের পৈতৃক সম্পত্তি। অবশ্য, উৎকৃষ্ট কল্পনা ক্রমশ পরিবারের বাইরেও ছড়িয়ে পড়ে। রাজস্থানী কাংড়া মোগল চিত্ররীতিতেও অনুরূপ প্রথা ছিল; এবং সে ক্ষেত্রে ভালো ছবির মূল রেখাচিত্র সর্বদাই সঞ্চয় করে রাখা হত, কোথায় কোন্‌ রঙ দেওয়া হবে তাও হয় লিখে নয় একটু একটু রঙ ছুঁইয়ে টুকে রাখা হত। এই মূল রেখাচিত্রকে বলা হ'ত চর্বা। এরই সহায়ে পুরুষানুক্রমে একই ছবি একাধিক রচিত হতে পারত। অবশ্য, ছবিটি স্রষ্টার হাতে প্রথম যে ভাবে ওৎরাতো পরে তেমন আর হতে পারত না বলাই বাহুল্য। কালীঘাটের পটুয়া-মহলে চর্বার চলন ছিল বলে জানা যায় না। তাদের সরল সাবলীল রূপকল্পনা তাদের স্মৃতিতে আর তুলির ডগেই সঞ্চিত থাকত।

(গোষ্ঠলীলা)

বাংলাপট

শিকারী বিড়াল

কালীঘাট

এই অসম্পূর্ণ লেখায় ইতি লেখবার আগে আর-একবার চেয়ে দেখব হর-গৌরীর মূল চিত্রটির দিকে। অজিতবাবুর অভিমতে চিত্রটি প্রায় শতবৎসরের পুরাতন। সাদা কাগজ বাদামী হয়ে এসেছে; ধারে ধারে ছিঁড়েও গেছে; চিত্রের আয়তন চওড়ায় এক ফুটেরও কম, উচ্চতায় সওয়া এক ফুট। তুলি ধরার আগে পেন্সিল ধ'রে হাল্কা হাতে যৎসামান্য আদ্‌রা একটা আঁকা হয়েছিল তারও চিহ্ন আছে; হয় দাগ-মোছা রবারের চলন ছিল না, নয়তো পটুয়ার তাতে প্রয়োজনই ছিল না। ঠিক এই বিষয় এই রূপ প্রায় এইভাবে সাজানো, আরও বহু দেখেছি। কিন্তু এমন উৎকৃষ্ট অঙ্কন, অপরূপ ছবি, আর তো চোখে পড়ে নি।

সওয়া এক ফুট উচ্চতা বলেছি। আমার মনে হয়, ফণাধরবিজড়িত গিরিশের শির হিমালয় ছাড়িয়ে উঠেছে। হিমালয় পর্বতমালার আকাশচুম্বী যেসব শিখর তারই রেখার সঙ্গে উর্ধ্বমুখী রেখাবলীর একটি আশ্চর্য মিল আছে। গৌরী শুয়ে আছেন শিবের কোলে মাথা রেখে— কী শান্তি! কী তৃপ্তি! কী নির্ভর! যেন হিমালয়ের জানুতে মাথা রেখে ভারতভূমিই শুয়ে আছেন। এসব কল্পনা এই পট-স্রষ্টার ছিল না। কিন্তু তখনকার সমাজে, সমষ্টি ও ব্যষ্টির জীবনে, যে শান্তি, যে তৃপ্তি, যে অনায়াস ছন্দ ছিল— যে ধর্ম, যে বিশ্বাস, যে গভীর উপলব্ধি ছিল— আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক বহু বিড়ম্বনার তলে তলে যে অধ্যাত্মসাধনার ধারা বয়ে চলেছিল অল্পবিত্ত 'অশিক্ষিত' সাধারণ নরনারীরও ভিতরে, তারই তো নিখুঁত একটি প্রতিরূপ এই। আদর্শ গৃহী শিব ও পার্বতী— একাধারে ভুবনেশ্বর ও ভিখারী, একাধারে পতিগতপ্রাণা অবলা আর সর্বশক্তিময়ী। কেবল কৈলাসে নয়, ঘরে ঘরেও তাঁদের লীলা অসংখ্য নরনারীর জীবনে। সেই স্বর্গে-মর্তে-মেশানো দেবতায়-মানুষে-মেলানো বিশ্বাস ও উপলব্ধি, বাঙালি প্রতিভার বিশেষ লাবণ্য-মাখানো, এই একখানি চিত্রে সম্পূর্ণই শরীরী হয়েছে মনে হয়। তাই বলতে হয়েছে, একটি দেশ, কাল, জাতি ও সংস্কৃতি এই চিত্রপটে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। আশা করি এ কথায় কোনো অত্যুক্তি ঘটে নি।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ

উষার শুকতারা আর প্রভাতের রবি। মৌক্তিকলাবণ্যময় বিশদ দিগঙ্গনে একটি যেন অন্যটিকে নিঃশব্দ ইঙ্গিতে ডেকে এনে, দেখতে দেখতে কোথায় মিলিয়ে যায়। উদ্ভাসিত দিকে দিগন্তে, রৌদ্রছায়াঞ্চিত বনে উপবনে, গৃহে পথে, তার কোনো স্মৃতিই থাকে না। রজনীর শেষ তারা, উজ্জ্বলতম তারা, গোপনে, আঁধারে, আধোঘুমে, ফুলে ফুলে কী বাণী রেখে গেল ফুলগুলিও তা জানে না। দিবা দ্বিপ্রহরে কার বা মনে পড়ে ক্ষয়-হয়ে-আসা অন্ধকারের পটভূমিকায় রাত্রিশেষের সেই তারাটি কত সুন্দরই না ছিল?

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-আলোচনায় উল্লিখিত উপমাটি নিতান্ত বাক্যালংকার নয়! নানা দিকে জ্যোতিরিন্দ্র-প্রতিভার অনন্যতা, আর রবীন্দ্র-প্রতিভার বিকাশে তারই আশ্চর্য আনুকূল্য ও মঙ্গলময় প্রভাব, পর্যালোচনা করে দেখলে যার-পর-নেই বিস্মিত হতে হয়। রাত্রিশেষে শুকতারা ও সূর্যের উদয়ে ইচ্ছা-অনিচ্ছা-রহিত কালক্রম ব্যতীত অন্য কোনো গূঢ় তাৎপর্য বা কার্যকারণ-সম্বন্ধ নেই যে, তার্কিক ব্যক্তির অপ্রিয় স্পষ্টভাষণের অপেক্ষা না রেখেও সে আমরা মনে মনে জানি বা মানি; অথচ উপমান ভুলে উপমিতের ক্ষেত্রে এসে, নিছক কবিকল্পনায় নয়, বাস্তবের ডাঙাজমিতেই আমাদের প্রতীতি দৃঢ়পদে দাঁড়াতে পারে। তখন মনে হয়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে বাংলাদেশ বা বাঙালি যে একেবারেই ভুলতে বসেছে সেটা কোনোক্রমেই সংগত নয়।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পঞ্চম পুত্র তিনি। বড়ো, মেজো, সেঝো, ন, সব বিশেষণ নিঃশেষ হয়েছে যখন তখনি এলেন তিনি জননী সারদাদেবীর কোলে অকলঙ্ক চন্দ্রকলাটির মতো— তাঁর পরিচয় হল 'নতুন'। দেবেন্দ্রনাথের পরবর্তী পুত্রকন্যাদের 'জ্যোতিদাদা' বা 'নূতন দাদা' আর জ্যেষ্ঠদের কাছে শুধুই 'নতুন'। এমন সার্থক অভিধান বা নামের অভিজ্ঞান খুব কমই হয়েছে। ঠাকুর-বাড়িতে সম্পূর্ণ নূতন তিনি প্রতিভায় ও প্রবণতায়। নূতন তাঁর আচার-আচরণ, মতি-গতি। আর, যেহেতু তৎকালীন বঙ্গীয় সমাজে, শিক্ষায় ও সংস্কৃতিতে, ঠাকুর-বাড়ির বিশিষ্টতা ছিল প্রায় তুলনারহিত, বাংলাদেশে বাঙালির ঘরেও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আশাতীত নূতন। যে চিরনূতনের রূপ রস শব্দ গন্ধ স্পর্শ সার্থকভাবে আবাহন করে এনেছেন পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ, তিনি তারই অগ্রসাধক।

অগ্রজ হেমেন্দ্রনাথের ঝোঁক ছিল বাড়ির ছেলেমেয়েদের সব রকমে শিক্ষিত ক'রে তোলায়। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে তার কতদূর কি সুফল ফলেছিল রবীন্দ্র-

জীবনস্মৃতির পাঠকেরা তা জানেন। রবীন্দ্রনাথের পূর্বে জ্যোতিরিন্দ্রই ছিলেন তাঁর স্নেহশীল সেজদাদার বিশেষ তত্ত্বাবধানের বিষয়, 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি' থেকেই তা জানা যায় (দু ভাইয়ের বয়সের ব্যবধান তো পাঁচ বৎসর মাত্র)—

'বাড়ীতে মাষ্টারের কাছে ইংরাজী পড়া আরম্ভ হইল। তখন জ্যোতিবাবুর অভিভাবক হইলেন, তাঁহার সেজদাদা (স্বর্গীয় হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর)। হেমেন্দ্র-বাবুর শিক্ষারীতিও সেকালের অনুরূপ অতি কঠোর ছিল। অষ্টপ্রহর ঘাড় গুঁজিয়া টেবিলে ঝুঁকিয়া পড়িতে হইত। মিছামিছি সময় নষ্ট হইবে বলিয়া, তিনি খেলিতেও ছুটি দিতেন না। যখন বাড়ীর অন্যান্য বালকগণকে খেলিতে দেখিতেন, তখন জ্যোতিবাবুর যে কি কষ্ট হইত, তাহা তাঁহার বর্ণনাতীত। তিনি ভাবিতেন, তিনি যেন জেলখানায় আছেন— সমস্ত জগৎব্রহ্মাণ্ড তাঁহার নিকট অন্ধকার; জগতে তিনি যেন নিতান্ত একা, অবরুদ্ধ। মুক্তির জন্য তাঁহার প্রাণ ছটফট করিত। হেমেন্দ্রবাবু অবশ্য তাঁহার ভালর জন্যই করিতেন, কিন্তু ইহাতে হিতেবিপরীত হইল। লেখাপড়ার উপর জ্যোতিবাবুর একটা বিষম বিতৃষ্ণা জন্মিয়া গেল।'[১]

তবে কি জ্যোতিরিন্দ্র শিক্ষাহীন সংস্কৃতিবিমুখ মূর্খই থেকে গেলেন? তা অবশ্য নয়। শুভার্থী অভিভাবকের শাসনে যত না শিখলেন তার বহুগুণ বিদ্যা জ্ঞান ও রুচি অর্জন করলেন শিক্ষার শাসনপাশ শিথিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, নিজেরই খেয়ালে এবং খুশিতে। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়েছিল জানি। তবে বালক ও কিশোর কবি পেয়েছিলেন তাঁর জ্যোতিদাদার, নতুন দাদার, অকুণ্ঠ স্নেহ ও সহযোগ। সেই স্নেহে কোনো শাসন বা পীড়ন ছিল না, আর সেই সহযোগিতাই ছিল আনন্দোদ্‌বেল শিক্ষার অপূর্ব মুক্তিক্ষেত্র। সে কথা স্মরণ করেই প্রৌঢ় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

'সাহিত্যের শিক্ষায়, ভাবের চর্চায়, বাল্যকাল হইতে জ্যোতিদাদা আমার প্রধান সহায় ছিলেন। তিনি নিজে উৎসাহী এবং অন্যকে উৎসাহ দিতে তাঁহার আনন্দ। আমি অবাধে তাঁহার সঙ্গে ভাবের ও জ্ঞানের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতাম; তিনি বালক বলিয়া আমাকে অবজ্ঞা করিতেন না।[২]

'তিনি আমাকে খুব-একটা বড়ো রকমের স্বাধীনতা দিয়াছিলেন; তাঁহার সংস্রবে আমার ভিতরকার সংকোচ ঘুচিয়া গিয়াছিল। এইরূপ স্বাধীনতা আমাকে আর কেহ দিতে সাহস করিতে পারিত না; সেজন্য হয়তো কেহ কেহ তাঁহাকে

[১] জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি (১৩২৬), পৃ ২৬

[২] এটি জ্যোতিরিন্দ্র ও রবীন্দ্রের যে বয়সের কথা সে সময়ে এক যুগ বা বারো বৎসরের ব্যবধান খুব সামান্য হতে পারে না।

নিন্দাও করিয়াছে। ··· সে সময়ে এই বন্ধনমুক্তি না ঘটিলে চিরজীবন একটা পঙ্গুতা থাকিয়া যাইত। ··· শাসনের দ্বারা, পীড়নের দ্বারা, কান-মলা এবং কানে মন্ত্র দেওয়ার দ্বারা, আমাকে যাহা-কিছু দেওয়া হইয়াছে তাহা আমি কিছুই গ্রহণ করি নাই। যতক্ষণ আমি আপনার মধ্যে ছাড়া না পাইয়াছি ততক্ষণ নিষ্ফল বেদনা ছাড়া আর কিছুই আমি লাভ করিতে পারি নাই। জ্যোতিদাদাই সম্পূর্ণ নিঃসংকোচে সমস্ত ভালোমন্দর মধ্য দিয়া আমাকে আমার আত্মোপলব্ধির ক্ষেত্রে ছাড়িয়া দিয়াছেন, এবং তখন হইতেই আমার আপন শক্তি নিজের কাঁটা ও নিজের ফুল বিকাশ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে পারিয়াছে।'[৩]

এতখানি উদ্‌ধৃতির একটু বিশেষ হেতু আছে। বিশাল মুক্তির ক্ষেত্রে আনন্দের উদ্দীপনায় ও স্বভাবের সঞ্চালনে, শিক্ষা-দান ও গ্রহণের যে উদার অপূর্ব নীতি কবির জীবনে উদ্‌ভাবিত হয়েছে, শান্তিনিকেতন-ব্রহ্মচর্যবিদ্যালয় যার ছিল একটি সমষ্টি-সীমায়িত স্ফুট রূপলেখা মাত্র— বিশ্বভারতীর গঠনতন্ত্রে অথবা বাস্তব গঠনে যার ছাপ কালক্রমে মুছে যেতেও পারে— জানা যাবে কেমন ক'রে কোথায় তার প্রথম অঙ্কুর দেখা দিল। প্রথমতঃ এটি বালক ও কিশোর জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনতত্ত্ব।[৪] দ্বিতীয়তঃ এটি বালক ও কিশোর কবি রবীন্দ্রনাথেরও অভিজ্ঞতা, জ্যোতিরিন্দ্রনাথই তাঁর সহায় ও সহযোগী। তৃতীয়তঃ এটি সুস্থ স্বাভাবিক সমাজ-গঠনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় সত্যবস্তু, সমুজ্জ্বল সার্থক ভবিষ্যতের একমাত্র অঙ্গীকার-নামা— অথচ, সমাজ বা জাতি এ তত্ত্ব আজও কতদূর বুঝেছেন আর কবে বুঝবেন নিশ্চিত বলা যায় না— রাষ্ট্রের অজস্র অর্থব্যয়ে বা আদেশে ও অনুদেশে 'কাজের কাজ' কিছু হতে পারে না সে তো বলাই বাহুল্য।[৫]

৩ জীবনস্মৃতি (১৩৬৩), পৃ ৭১

৪ দ্রষ্টব্য জ্যো. জীবনস্মৃতি, পৃ ২০-২৪। খেলাচ্ছলে, আনন্দের ভিতর দিয়ে, শিক্ষা দেওয়ার নানা পরীক্ষা ঘরোয়াভাবে জ্যোতিরিন্দ্রনাথও করেছিলেন— তারও বর্ণনা আছে।

৫ স্থান-কালের বিবেচনায়, একটি 'বাহুল্য' প্রসঙ্গের অবতারণা। এ কথা হয়তো অনেকে জানেন, রবীন্দ্রনাথ-যে শান্তিনিকেতন আশ্রমে ছাত্র শিক্ষক সকলকে নিয়ে, স্বয়ং নাটের গুরু হয়ে নানারূপ উৎসবানুষ্ঠান ও অভিনয় করান, তদুপযোগী শারদোৎসব ফাল্গুনী প্রভৃতি নূতন নূতন নাটক লেখেন, কবিপ্রেরণা ছাড়াও তার একটি বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। ছাত্রদের মধ্যে কিছু কিছু অশোভন অবাধ্যতা বা উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দেয়, তারই এই অভিনব প্রতিবিধান। দণ্ডপাণি হয়ে অসহায় অপরিণত শিশুদের সংশোধন বা বর্জন বা তাদের প্রাণশক্তির নিষ্কাষণ মর্মদর্শী কবির পক্ষে একেবারেই অসম্ভব ছিল। বিপথগামী প্রাণপ্রবাহকে সুপথে চালিত ক'রে কী না আশ্চর্য ফল তিনি পেয়েছিলেন। এই সঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে ভূলোকে যখন নানা অনাচার ও অধর্মের প্রাদুর্ভাব হয়, ভরতের নাট্যশাস্ত্রে বলা হয়েছে, তখনই দেবগণ প্রজাপতি

ছেঁড়া ছবি

শ্রীনন্দলাল বসু

রেখাচিত্রাবলী

কালীঘাট চিত্রশৈলী

মালিনী

নিদ্রিতা

মাছ কোটা
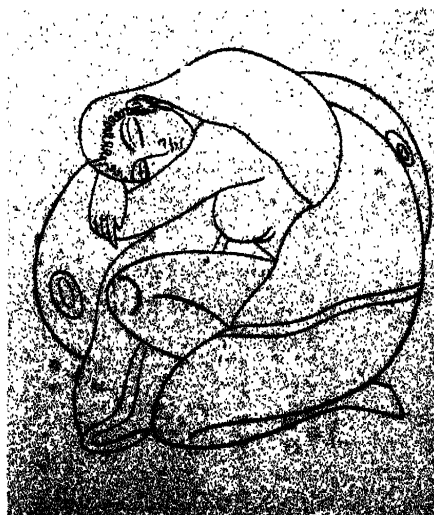
বৃক্ষরোপণ-উৎসব
শ্রীনন্দলাল বসু

নিরবধি কালের কবিকুলে বিশিষ্ট কবি রবীন্দ্রনাথ, তাঁর প্রতিভা-বিকাশের উপযুক্ত পরিবেশ-সৃজনে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অনায়াসসিদ্ধ কৃতিত্ব অনেকখানি— যদিও সুধী সাহিত্যিক এবং মহাপ্রাণ ভাবুক তিনি, আসলে কবি নন। কবি শব্দের অর্থ এখানে সীমাবদ্ধ। মুখের কথা ছাড়া অন্য মানবীয় উপায়-উপকরণের কথা যদি ধরি, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ছিলেন সুরস্রষ্টা ও চারিত্ররূপস্রষ্টা এবং সে অর্থে অসামান্য প্রতিভারও অধিকারী। সুরস্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর কী সম্বন্ধ সে প্রসঙ্গটিও সংক্ষেপে আলোচনার যোগ্য।

মধুসূদন ও দীনবন্ধুর পরে, গিরীশচন্দ্রের পূর্বে, নূতন বাংলা নাট্যাভিনয়ের আসরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অচিরকালীন সৃষ্টি অলৌকিক না হলেও উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থবিশেষ সম্পর্কে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন। নাট্যাভিনয়ের প্রয়োজনে ও সহজাত অনুরাগে সংগীতের চর্চা করেছেন 'নতুন', খুব-যে বাঁধাধরা পদ্ধতিতে তা হয়তো নয়। অনেকটা তার শুনে শেখা, খুশিমনে শেখা, এবং নিজেই নিজেকে শেখানো। হেমেন্দ্রনাথের মতো শিক্ষাদানের অত্যুগ্র ঝোঁক ছিল না সত্যেন্দ্রনাথের। তাঁর স্নেহের পক্ষচ্ছায়ায় আমেদাবাদে যখন ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, মেজদাদার চিঠিতেই জানা যায়—

'জ্যোতি সেতার শিখিতেছে। ইহাই তাহার একমাত্র আমোদ। আমি তাহাকে ফরাসী শিখাইতেছি। সে খুব খাটিতেছে। বড় লাজুক— সমাজে মিশিতে পারে না।'[৬]

এ কথাও জানি, বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের একটি পুরাতন পিয়ানো ছিল (হয়তো তিনি সেই যন্ত্রে স্বরগ্রামের উচ্চনীচতার মাপজোপে অভিনব কোনো আঙ্কিক বা দার্শনিক সমস্যা-সমাধানের চেষ্টায় ছিলেন) সেই যন্ত্রে বালক জ্যোতির খেলা ছিল – চুরি ক'রে হাত লাগিয়ে যখন-তখন সুরের ঢেউ খেলিয়ে তোলা। 'হাঁ-হাঁ' ক'রে উঠতেন অগ্রজ— 'পিয়ানো ভেঙে যাবে, নতুন, ভেঙে যাবে'। তখনকার মতো ত্রস্ত বা অপ্রস্তুত হয়ে পড়ত বালকের সুরসাধনা। কিন্তু, চুরি করে হোক আর যেমন ক'রেই হোক, এই পিয়ানো যন্ত্রে কালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পূর্ণ অধিকারই এসেছিল এবং তাঁর মতো গুণীর সুরস্বর্গে নূতন নূতন প্রয়াণের যোগ্য বাহন হয়েছিল সেটি সে কথা কে না জানে। রবীন্দ্রনাথের সাক্ষ্যই সংকলন করা যেতে পারে —

ব্রহ্ম'র শরণ নেন। সকলকে সুপথে প্রবর্তিত করার অপূর্ব উপায় হিসাবে ব্রহ্মা এই নাট্যকলার সৃষ্টি করেন। অর্থাৎ, এ তত্ত্ব কিছু নূতন নয়, এর উপযুক্ত বোদ্ধা বা প্রয়োগকর্তাই বিরল।

৬ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ (১৩৩৪), পৃ ২১

'এক সময়ে পিয়ানো বাজাইয়া জ্যোতিদাদা নূতন নূতন সুর তৈরি করায় মাতিয়াছিলেন। প্রত্যহই তাঁহার অঙ্গুলিনৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে সুরবর্ষণ হইতে থাকিত। আমি এবং অক্ষয়বাবু [কবি অক্ষয় চৌধুরী] তাঁহার সেই সদ্যোজাত সুরগুলিকে কথা দিয়া বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টায় নিযুক্ত ছিলাম। গান বাঁধিবার শিক্ষানবিশি এইরূপে আমার আরম্ভ হইয়াছিল।'[৭]

এই উপলক্ষে কবি আরও বলেন—

'আমাদের পরিবারে শিশুকাল হইতে গান-চর্চার মধ্যেই আমরা বাড়িয়া উঠিয়াছি। আমার পক্ষে তাহার একটা সুবিধা এই হইয়াছিল, অতি সহজেই গান আমার প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল।'[৭]

মনে হয়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও এ কথা সমান প্রযুজ্য।

খৃস্টীয় উনবিংশ শতাব্দের শেষ ভাগে, যুগপৎ কবি ও সুরকার রূপে রবীন্দ্রনাথের যে অলৌকিকসুন্দর আত্মপ্রকাশ তার প্রেরণাদায়িনী এক দিকে যেমন 'নতুন বৌঠান' কাদম্বরীদেবী, তার সমর্থ সহযোগী ছিলেন নতুন দাদা বা জ্যোতিদাদা, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। হিন্দুমেলার অনুষ্ঠানে হোক, ভারতী পত্রিকার প্রকাশ ব্যাপারে হোক, আর বিদ্বজ্জনসমাগমের আয়োজনে এবং তদুপলক্ষ্যে নূতন নূতন নাট্যরচনায় ও অভিনয়েই হোক, সর্বদা জ্যোতিরিন্দ্রই ছিলেন আনন্দ-উৎসাহের আধারভূত প্রাণপুরুষ। বহু ক্ষেত্রে বহু ভাবে তাঁর প্রাণ তাঁর প্রতিভা আত্মসাৎ ক'রেই রবীন্দ্র-প্রতিভা বড়ো হয়ে ওঠার সুযোগ পেয়েছে— এ উক্তি কোনোরূপ অত্যুক্তি মনে হয় না।

বাল্মীকিপ্রতিভা,[৮] কালমৃগয়া, মায়ার খেলা, এই গীতিনাট্য তিনখানির আয়োজন ও অভিনয় হয় যথাক্রমে বাংলা ১২৮৭, ১২৮৯ ও ১২৯৫ সালে। জীবনস্মৃতিতে জানা যায়, রবীন্দ্রনাথ বিলাত থেকে ফিরে আসার পর—

'দেশী ও বিলাতী সুরের চর্চার মধ্যে বাল্মীকিপ্রতিভার জন্ম হইল। ইহার সুরগুলি অধিকাংশই দিশি, কিন্তু এই গীতিনাট্যে তাহাকে তাহার বৈঠকি মর্যাদা হইতে অন্য ক্ষেত্রে বাহির করিয়া আনা হইয়াছে ··· সংগীতের এইরূপ বন্ধনমোচন ও তাহাকে নিঃসংকোচে সকল প্রকার ব্যবহারে লাগাইবার আনন্দ আমার মনকে বিশেষভাবে অধিকার করিয়াছিল।'[৯]

রবীন্দ্রনাথ আরও বলেছেন—

৭ জীবনস্মৃতি, পৃ ৭১-৭২

৮ পরিবর্তিত পরিবর্ধিত সংস্করণ ১২৯২ ফাল্গুনে।

৯ জীবনস্মৃতি, পৃ ১০৭, ১০৮-১০৯

'বাল্মীকিপ্রতিভা ও কালমৃগয়া যে উৎসাহে লিখিয়াছিলাম সে উৎসাহে আর কিছু রচনা করি নাই। ওই দুটি গ্রন্থে আমাদের সেই সময়কার একটা সংগীতের উত্তেজনা প্রকাশ পাইয়াছে। জ্যোতিদাদা তখন প্রত্যহই প্রায় সমস্তদিন ওস্তাদি গানগুলাকে পিয়ানো যন্ত্রের মধ্যে ফেলিয়া তাহাদিগকে যথেচ্ছা মন্থন করিতে প্রবৃত্ত ছিলেন। তাহাতে ক্ষণে ক্ষণে রাগিণীগুলির এক-একটি অপূর্বমূর্তি ও ভাবব্যঞ্জনা প্রকাশ পাইত। যে-সকল সুর বাঁধা নিয়মের মধ্যে মন্দগতিতে দস্তুর রাখিয়া চলে তাহাদিগকে প্রথাবিরুদ্ধ বিপর্যস্তভাবে দৌড় করাইবামাত্র সেই বিপ্লবে তাহাদের প্রকৃতিতে নূতন নূতন অভাবনীয় শক্তি দেখা দিত এবং তাহাতে আমাদের চিত্তকে সর্বদা বিচলিত করিয়া তুলিত। আমি ও অক্ষয়বাবু অনেক সময়ে জ্যোতিদাদার সেই বাজনার সঙ্গে সঙ্গে সুরে কথাযোজনার চেষ্টা করিতাম। ··· এইরূপ একটা দস্তুর-ভাঙা গীতবিপ্লবের প্রলয়ানন্দে এই দুটি নাট্য লেখা। এই জন্য উহাদের মধ্যে তাল-বেতালের নৃত্য আছে এবং ইংরেজি-বাংলার বাছ-বিচার নাই।'

নানা সূত্রেই জানা যায়, বাল্মীকিপ্রতিভার প্রায় সব গানের সুরই জ্যোতিবাবুর সংযোজিত।[১০]

রূপভাবুক রূপস্রষ্টা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পরিচয় জানেন অতি অল্পলোক। রবীন্দ্রনাথের 'ছেলেবেলা' ও 'জীবনস্মৃতি'র কল্যাণে জ্যোতিরিন্দ্র-চরিত্রের অন্য নানা দিকই উদ্ভাসিত হয়েছে, এমন-কি বসুমতী-সাহিত্যমন্দিরের সুলভ গ্রন্থপ্রচারে তিনি-যে সংস্কৃত ফরাসী মরাঠী নানা ভাষা থেকে নানা অমূল্য নিধি সঞ্চয়ন ক'রে বাংলাসাহিত্যভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে গেছেন সে কথাও হয়তো অবিদিত নেই— কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আবাল্যের আর-এক নেশা ছিল বার্ধক্যের অন্তিম সীমাবধি অক্ষুণ্ণ— মানুষের মুখ আঁকা, মানুষের স্বরূপ-পরিচয়কে অনায়াস রেখাবলীর মায়া-জালে চিরন্তন ক'রে ধরে রাখা— সে তথ্য আজকের জনসমাজে এক-প্রকার অজ্ঞাতই বলা চলে।

মনোবুদ্ধি দিয়ে সত্য এবং সৌন্দর্যের ধারণা এবং রূপকল্পনা, বিচিত্র উপায়ে ও উপাদানে, এই যদি হয় প্রতিভার সংজ্ঞার্থ— না হবে কেন? কবি চিত্রকর দার্শনিক সুরস্রষ্টা ও বিজ্ঞানী অন্য কোন্ পরিচয়েই বা এঁদের জানি— জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রতিভা অপূর্বভাবে ফুটেছিল সুরে এবং স্বরূপসৃজনে। সৃষ্টির ক্ষেত্র তাঁর সীমাবদ্ধ,

১০ জ্যো. জীবনস্মৃতি, পৃ ১৩। এ উক্তি বাল্মীকিপ্রতিভার প্রচলিত দ্বিতীয় সংস্করণ সম্পর্কে কতটা সত্য কে বলবে— অন্তর্বর্তীকালীন কালমৃগয়া নাটকের বহুগান এর অঙ্গীভূত হয়েছে।

কিন্তু কল্পনাকৃতির সততা ও মৌলিকতা বিস্ময়কর। সঞ্জীবচন্দ্রের প্রসঙ্গে সমালোচক রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, তাঁর প্রতিভা যথেষ্টই ছিল, ছিল না কেবল প্রতিভার উপযুক্ত গৃহিণীপনা। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সম্পর্কেও তাই বলা যায় না কি? যতটা তাঁর ক্ষমতা ছিল তাও যেন করেন নি, নিজে যা করেছেন তার সম্বন্ধে ছিল তাঁর চরম ঔদাসীন্য— এ বিষয়ে বহু প্রমাণ হয়তো দেওয়া যায়। অন্যের প্রতিভাবিকাশে আনুকূল্য ক'রে, অন্যকে অভিনব সার্থকতায় উত্তীর্ণ হতে দেখে, তাঁর হ'ত অপরিসীম সুখ। অনতি-ক্রান্ত যৌবনে বিপত্নীক, নিঃসন্তান, এই গুণীকে সন্ন্যাসীও বলা চলে। কিন্তু সন্ন্যাসে ও স্রষ্টৃত্বে রয়েছে এক মূলগত বিরোধ। সেই বিরোধের অ-সমাধানে, যে সীমা পার হয়ে গেলে কল্পনা সত্য হয় এবং প্রাণপ্রৈতির কম্পনে অদৃশ্যই দৃশ্য হয়, অশব্দই গান হয়, উত্তাপ আলো হয়ে ওঠে, সে যেন সর্বদা তিনি পার হয়ে যেতে পারেন নি। তাঁর নিজের হয়তো সন্তোষের অভাব ছিল না, সর্বত্যাগেও কোনো দুঃখ হ'ত না, কিন্তু বাংলার নবযুগে সুর ও রূপ -কল্পনার ভুবনে প্রধানতঃ তিনি অগ্রসাধক হয়েই রইলেন, এক দিকে রবীন্দ্রনাথের আর অন্য দিকে অবনীন্দ্র-গগনেন্দ্রের, তাতে কি অনেকটাই আমাদের বঞ্চিত করলেন না? কে জানে এও হয়তো এক প্রকার নিয়তি, এবং ব্যষ্টি-মানুষকে নিয়েই নিরতিশয় ব্যস্ত না হয়ে সমষ্টির বিষয় চিন্তা করলে ক্ষোভেরও কোনো কারণ নেই। সুতরাং জ্যোতিরিন্দ্র-প্রতিভার হেলাফেলার দান, পরিচিত-অপরিচিত খ্যাত-অখ্যাত বহুশত বালবৃদ্ধ নরনারীর প্রতিকৃতি, পাঁচ হাত ফিরে, অনেক নষ্ট হয়ে, কিছু যে তবু উত্তরকালের হাতে এসে পৌঁচেছে এই আমাদের বিশেষ আনন্দের হেতু। খাতায় এবং টুক্‌রো কাগজে লঘুক্ষিপ্র লেখনীর অনায়াস সঞ্চরণে লেখা হতে হতে স্রষ্টার সঙ্গে সঙ্গে এইসব সৃষ্টিও যার-পর-নেই খুশী হয়ে উঠেছিল সন্দেহ নেই, ক্রমে নেপথ্যের নিরালোকে নির্বাসিত হলে পরে অবিন্যস্ত জীর্ণ খাতার পাতায় পাতায় দক্ষিণসমীরিত মর্মরে মর্মরে কদাচিৎ এই স্বর বুঝি শোনা যেত—

'ঝরা পাতা গো,
আমি তোমারই দলে!'

ঝরা পাতার অনেক বেশি মর্যাদা দিলেন ও আগ্রহ দেখালেন যেমন-তেমন-ক'রে-দৈবাৎ-ছাপা-হওয়া কয়েকটি প্রতিচিত্র দেখে বিদেশের এক গুণী। তাঁর বক্তব্য আমরা পরে আলোচনা করব, তৎপূর্বে খেয়াল-খুশি-ভরা এই চিত্রাঙ্কনের ইতিবৃত্তের দিকটাও অল্প জানা দরকার। জ্যোতিরিন্দ্র-জীবনস্মৃতির কাহিনী হল এইটুকু—

'জ্যোতিবাবু তখন হিন্দুস্কূলে পঞ্চম-শ্রেণীতে পড়িতেন। বয়স প্রায় বার কি তেরো··· ক্লাসে বসিয়া তিনি একবার তাঁহাদের মাষ্টার জয়গোপাল শেঠের ছবি আঁকিয়াছিলেন। তাঁহার যে চিত্র অঙ্কিত হইতেছিল, এ ব্যাপার মাষ্টার মহাশয়

কিছুই জানিতেন না। সে প্রতিকৃতি এমনই অনুরূপ হইয়াছিল যে মাষ্টারদের মধ্যেও তাহা লইয়া কিছুদিন যাবৎ একটা খুব হাসি তামাসা চলিয়াছিল। [জয়গোপাল-বাবুর চেহারায় ও পরিচ্ছদে প্রচুর হাস্যকরতা ছিল।]

'পূর্ব্বোক্ত ঘটনারও দুই এক বৎসর পূর্ব্বে জ্যোতিবাবু তাঁহার জীবনে সর্ব্বপ্রথম চিত্রাঙ্কন করেন।··· [রায়পুরের] প্রতাপনারায়ণ সিংহ মহাশয় একবার জ্যোতিবাবুর মেজ্‌দাদাকে (সত্যেন্দ্রনাথ) তাঁহার কর্ম্মস্থান মণিরামপুরে নিমন্ত্রণ করেন। জ্যোতি-বাবুও তাঁহার মেজ্‌দাদার সঙ্গে সেখানে গিয়াছিলেন। একদিন, কেন কে জানে, প্রতাপবাবুর ছবি আঁকিতে তাঁহার বড় ইচ্ছা হয়। ইহার পূর্ব্বে তিনি আর কখনও কাহারও ছবি আঁকেন নাই, বা আঁকিতে চেষ্টা করেন নাই। এই ছবিখানি এত সুসদৃশ হইয়া ছিল যে বালক জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে চিত্রাঙ্কনের জন্য সকলেই মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিয়াছিলেন।··· তাঁহার প্রথম চিত্র দেখিয়াই সকলে যখন প্রশংসা করিতে লাগিলেন, তখন তিনি মধ্যে মধ্যে বাড়ীর লোকদেরও চেহারা আঁকিয়া হাত পাকাইতে লাগিলেন।'[১১]

উল্লিখিত ঘটনা দুটি খৃস্টীয় ১৮৫৯-৬১ সালের মধ্যে ঘটেছিল ধ'রে নেওয়া যেতে পারে। ভারতচিত্রকলার নবপ্রাণদাতা অবনীন্দ্রনাথ বা গগনেন্দ্রনাথ তখনও জন্মগ্রহণ করেন নি। ১৮৬৭ খৃস্টাব্দের মে মাসে আমেদাবাদ থেকে সত্যেন্দ্রনাথ লিখছেন— 'আমি তাহার জন্য একজন ড্রয়িং মাষ্টারও নিযুক্ত করিয়া দিয়াছি, কিন্তু জ্যোতি পারিবে কিনা জানি না।'[১২] বিনা প্রমাণে 'শুষ্কং কাষ্ঠং' ব'লে অজ্ঞাতনামা মাস্টার-মশাইয়ের নিন্দা করতে পারি নে, তবু মনে হয় তাঁর অধীনে শিক্ষা বেশি দূর এগোয় নি। কারণ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সারা জীবনের কাজে কোনো ড্রয়িংমাস্টারের পাকা হাতের দাগে দাগে দাগা বুলোনোর কোনোই আভাস খুঁজে পাওয়া যায় না। সত্যকারের কোনো গুণীর সংস্পর্শে এলে কী যে হ'ত কেউ অনুমান করতে পারি নে যেমন, তেমনি বলাও যায় না বিশেষ প্রতিভাবানের চরিত্রে যে দুর্দমনীয় জেদ থাকে সকল বাধাকে পরাভূত ক'রে সকল সীমা ডিঙিয়ে চলে যাওয়ার, তারই খানিকটা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের চরিত্রে থাকলে বা কেমন হ'ত। কিন্তু, যা হয় নি বা হতে পারে নি তা নিয়ে আক্ষেপ করা বৃথা, এমন-কি শিল্পী নিজেও যদি সে আক্ষেপ করে থাকেন বৃদ্ধবয়সে।[১৩] শিল্পীর যে রূপসৃষ্টির সাক্ষাৎ পরিচয় আজ পাচ্ছি তার সম্পর্কে এই কথাই মনে করতে পারি যে, স্বভাবসুন্দরকে আরও বেশি সুন্দর করতে গেলে

১১ জ্যো. জীবনস্মৃতি, পৃ ৪৪ ১২ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, পৃ ২০-২১

১৩ চিত্রবিদ্যায় রীতিমত শিক্ষালাভ করিবার সুযোগ পান নাই বলিয়া তিনি এখনও [১৯১২ ?] ক্ষুব্ধ। —জ্যো. জীবনস্মৃতি, পৃ ৪৫

হয়তো কথঞ্চিৎ আবরণ করাই হ'ত। এই চিত্রপ্রতিকৃতিকে লক্ষ্য ক'রে রূপমুগ্ধ দুষ্মন্তের ভাবাতেই বলা যায়—

ইয়মধিকমনোজ্ঞা বল্কলেনাপি তন্বী।
কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্॥

প্রায় এই কথাই বলেছেন সমুদ্রপারের গুণী ও সমঝদার উইলিয়াম রোটেন্‌স্টাইন (W. Rothenstein) 'প্রতিকৃতি-পঞ্চবিংশতি'র ভূমিকায়—

'চিত্রাঙ্কন ঠাকুর মহাশয়ের পেশা নয়। নেহাৎই খেয়াল-খুশির বশে আত্মীয়-বন্ধুদের প্রতিকৃতি-অঙ্কন তাঁর বহুদিনের নেশা বলা যেতে পারে। এই ছবিগুলিতে সেই তন্ময়তা ও আন্তরিকতা ফুটে উঠেছে, খেয়ালী চিত্রাঙ্কনে যার বিশেষ প্রত্যাশা থাকে অথচ কদাচিৎ সাক্ষাৎ মেলে। এ ক্ষেত্রে অঙ্কিত মুখাকৃতিনিচয়ে এমন রূপ-রুচি বা গড়নের মর্মজ্ঞতা দেখা যায় যা সত্যই দুর্লভ। অথচ আয়াসশূন্য একান্ত সাচ্ছন্দ্যে সব-কিছু প্রকাশ পেয়েছে। না আছে পাশ্চাত্য শিল্পাদর্শ নিয়ে দুর্ভাবনা, না রয়েছে মোগল-চিত্ররীতির-গাঁটছড়া-বাঁধা অবোধ অনুস্মৃতি। ভারতীয় মহিলাদের প্রতিকৃতি বিশেষভাবেই দর্শনীয়। সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দে য়ুরোপীয় চিত্রকরদের কাজে নারীর এমন একটা প্রাণহীন চারিত্র-মুছে-যাওয়া প'ড়ে-পাওয়া ছাঁদ আরোপিত হয়েছিল যে, সহজতায় ও সততায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কাজের তুলনা মেলে শুধু আরো-পূর্ববর্তী ডুরার বা হল্‌বেনের আঁকা প্রতিকৃতিচিত্রে। জগতের ও জীবনের অনন্ত বৈচিত্র্য তাঁদের চতুর্দিকে, জানি নে তবু কেন নূতন কালের ভারতীয় চিত্রকর-গোষ্ঠী অতীতের মোগল আর রাজপুত চিত্ররীতির বিষয়বস্তু ও আঙ্গিক নিয়েই সন্তুষ্ট থাকেন।...

'আর্ট্ থেকে আর্টের জন্ম হয় না, একান্ত আবেগ থেকেই হয়। সেই আবেগ ও ঐকান্তিকতার আভাস পাচ্ছি জ্যোতিরিন্দ্র ঠাকুর -বিরচিত প্রতিকৃতিচিত্রে। সহজশোভন অনাড়ম্বর এদের ভাবখানা; কিন্তু বুঝতে বাকি থাকে না, তন্ময়তার গুণে, একমুখী প্রকাশের এষণায়, চিত্রে চিত্রে চিত্রিতব্যক্তির বিশেষ রূপলাবণ্য আর বিশিষ্ট চারিত্র চমৎকার ধরা পড়েছে।... বিদেশী আমরা, বঙ্কিমের কাহিনীতে যে বাঙালি-চরিত্রের বর্ণনা পাই, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ছবিতে তাই যেন চোখ ভ'রে দেখতে পেলাম! ভাবব্যঞ্জনায় ও অন্তর্দৃষ্টিতে এগুলিকে অতিক্রম করে, সমসাময়িক প্রতিকৃতিচিত্রের এমন নিদর্শন আমার অল্পই জানা আছে।'[১৪]

[১৪] Twenty-five Collotypes from the Original Drawings by Jyotirindra Nath Tagore, 1914। ভূমিকার কতক অংশের মর্মানুবাদ। নব-ভারত-চিত্রকলার শিল্পীদের, প্রাচীন মোগল ও রাজপুত -চিত্ররীতির মধ্যে স্বেচ্ছাবন্দী দশা নিয়ে

এ-সবই সমঝদার সুধী ব্যক্তির বহু-বিচার-বিবেচনা-প্রসূত প্রত্যয়পূর্ণ উক্তি। অনভিজ্ঞজনের শূন্যগর্ভ উচ্ছ্বাস নয়। ইনি আলাপ-আলোচনায় ঘরোয়া ভাবে কী বলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের চিঠিতে তা জানতে পারি—

'ভাই জ্যোতিদাদা,

আপনার ছবির খাতা আমি Rothensteinকে দেখিয়েছি।··· তিনি দেখে অত্যন্ত আশ্চর্য্য হয়ে গেছেন। তিনি আমাকে বল্লেন, আমি তোমাকে বলছি, তোমার দাদা তোমাদের দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্রী। আমাদের দেশের প্রথম শ্রেণীর ড্রয়িং যাঁরা করেন, তাঁদের সঙ্গেই ওঁর তুলনা হতে পারে। এতদিন যে, আমাদের দেশে এ ছবির কোনো সমাদর হয় নি, এর মত এমন অদ্ভুত ঘটনা কিছু হতে পারে না। most marvellous, most magnificient এই ত তাঁর মত।··· যেটা যথার্থ আপনার জিনিষ এবং যাতে আপনার শক্তি এমন আশ্চর্য্য রূপে প্রকাশ পেয়েছে, সেটাকে লুপ্ত [অথবা বিস্মৃত] হতে দেওয়া উচিত হয় না। আপনার এই ছবি এখানে যাঁরাই দেখেছেন, সকলেই খুব প্রশংসা করছেন। রোথেনষ্টাইন খুব একজন গুণজ্ঞ লোক··· ২৯ ভাদ্র ১৩১৯

আপনার স্নেহের রবি।'[১৫]

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পেন্‌সিলে-আঁকা প্রতিকৃতিরাজির প্রত্যেক রেখায় রেখায় যে অনায়াস অবিচলিত প্রত্যয় আর সর্বাঙ্গব্যাপী সূক্ষ্ম সুকুমার শ্রী, চিত্রের ঐ উভয় গুণই অক্ষুণ্ণ রেখে প্রতিচিত্র-রচনা এ দেশে আজও বুঝি সম্ভব নয়— কেননা, সে উপায় উপকরণ উৎসাহ এবং অ-ব্যয়কুণ্ঠার একত্র সমাহার দেখি নে। আর, ছবিও এঁকেছেন কত হাজার ঠিকমত জানা যায় না। (প্রায় সবই পাশ-ফেরানো মুখের

রোটেন্‌স্টাইন যা ভেবেছিলেন তা সম্পূর্ণ সত্য নয়, আর মিথ্যাও নয়। কারণ, অবনীন্দ্রনাথ-নন্দলালের চিত্রকৃতিতে পরিচিত জগতের ও জীবনের অনন্তবৈচিত্র্যের সার্থক প্রকাশ অল্প হয় নি। বিশেষতঃ শিল্পী নন্দলাল, আচার্য নন্দলাল, রবীন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতন-আশ্রমের স্থায়ী অধিবাসী হওয়ার পরে। ভারতবন্ধু রোটেন্‌স্টাইনের পক্ষে সে-সবের সম্যক্ পরিচয় -লাভ খৃস্টীয় ১৯১৪ সনে নানা কারণেই অসম্ভব ছিল। নন্দলালের বহু কৃতী ছাত্রও ঐ *Song of the Open Road*-এর আহ্বানে আকৃষ্ট হয়ে এবং যাত্রা শুরু ক'রে, কালে যশস্বী হয়েছেন। একদা অজন্তা মোগল কাংড়া রাজস্থান -চিত্রশৈলীর অন্ধ অনুসরণ বা অনুকরণ ছিল এবং কোথাও কিছু পরিমাণে আজও আছে সন্দেহ নেই ; কিন্তু নব-উজ্জীবিত ভারত-চিত্রকলার মূল্য এবং প্রকৃতি -নির্ধারণ তা দিয়ে হবে না— উৎকৃষ্ট যে সৃষ্টি, সার্থক যে প্রতিভা ও প্রবৃত্তি, সেই দিকেই সংস্কারমুক্ত চোখে চেয়ে দেখতে হবে।

১৫ বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ ১৩৫৯, পৃ ১০১

আকৃতি, কাগজের উপর নরম পেন্‌সিলে আঁকা।) তিন চার শত ছবি রবীন্দ্র-ভারতীর চিত্রসংগ্রহ থেকেই বেছে নেওয়া যায়। সেগুলি পর পর সাজিয়ে দেখলে যুগ থেকে যুগান্তরে চলে যায় মন, বৎসরের পর বৎসর পার হয়ে। যা ছিল পঠিত বা শ্রুত তাই হয় চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ। এক-জীবনের-দেখা বিলীয়মান সে এক জগৎ বলা চলে। যে নাট্যাভিনয়ের উপর রঙ্গমঞ্চের শেষ যবনিকা প'ড়ে গেছে বহুদিন হল, কয়েকটি সাচীকৃত আস্যের সংকেতে আবার সে যেন উঠে যায়, আবার সেই কুশীলবদের অভিনয় করতে দেখি উনবিংশ শতাব্দের শেষ আর বিংশ শতাব্দের প্রথম পাদের পাদপ্রদীপের উজ্জ্বল আলোয়। না, অভিনয় তো নয়, কল্পনাও নয়, বাস্তব জীবন। প্রতিগ্রাহী মুকুরখানি শুধু মনোময়। কত আশা আকাঙ্ক্ষার ইঙ্গিত-ইশারা, কত জানা অজানা জীবনের নিঃশব্দ কাহিনী, আর, বালেন্দুরেখায় আভাসিত আব্‌ছায়া কত ছবির দিনে-দিনে-উপচিত পূর্ণ প্রকাশ— কেননা, এক-একটি মুখ এই গুণীর অনিমেষ দৃষ্টিতে বৎসরে বৎসরে নবনবায়মান রূপে রেখায় এবং ছায়াসুষমায় ফুটে উঠতেও দেখা গিয়েছে। শিল্পীর স্নেহের রবি অথবা 'বিবি', মেজো বৌঠান, বড়দাদা, প্রমথ চৌধুরী, আরও অনেকে। যে জীবনমুকুল অকালে ঝরে গিয়েছে। যে জীবন বালিকামূর্তিতে আর তরুণীরূপেও বার বার দেখা দিয়েছে শিল্পীর উদ্ভাসিত পটে··· আর, অশীতিবর্ষ পার হয়ে বুদ্ধির দীপ্তি, অনাড়ম্বর আভিজাত্যের গরিমা এবং উন্নত হৃদয়ের সৌন্দর্যে মণ্ডিত হয়ে আজও রয়েছে আমাদের সামনে— সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পৌত্রী, রবীন্দ্রনাথের 'প্রাণাধিকা', ঠাকুর-পরিবারের মহনীয় ইতিহাস কবিকল্পনা নয় বা কাহিনী নয় তারই প্রধান সাক্ষী।

নিমেষকালই অনন্তকাল হয়ে রয়েছে। সেই অনশ্বর মুহূর্তমালার নিরালা আলয়ে দ্বার উদ্‌ঘাটন করে যাঁদের দেখা পেলাম কে তাঁরা? রাজনারায়ণ বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মতিলাল ঘোষ, বিপিনচন্দ্র পাল, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অম্বিকাচরণ মজুমদার, অশ্বিনীকুমার দত্ত, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, মহামতি রানাড়ে— আরও কত লোকনেতা। লোকেন পালিত, আশুতোষ চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, জগদানন্দ রায়, ক্ষিতিমোহন সেন, টাইকন য়োকোয়ামা, দীনবন্ধু এন্‌ড্রুজ, 'উইলি পিয়র্‌সন্', চিত্রকর ঈশ্বরীপ্রসাদ— দেশী বিদেশী আরও কত কবি, কলাবিদ্, ধীমান্ এবং উদারহৃদয় মনীষী।
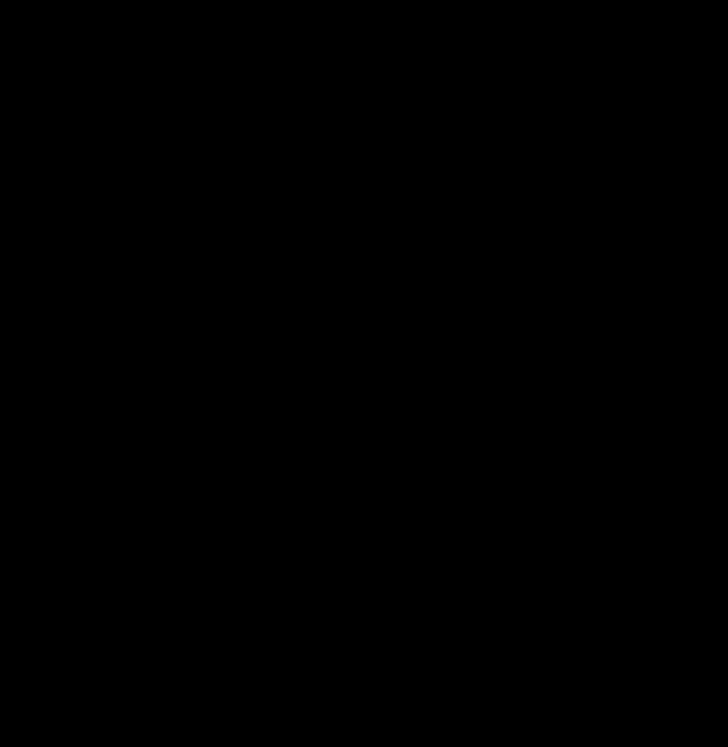
'সরোজিনী' বা 'স্বদেশী' কবে না জানি গঙ্গাসলিলে ডুবে গিয়েছে, বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী হয়েছে 'সরোজিনীপ্রয়াণ', স্থায়ী হয়ে রয়েছে শিল্পীর সাবলীল রেখাজালে জাহাজের বিদেশী কাপ্তেন বা সারেঙ।

অবনীন্দ্রনাথ

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাউল

শ্রীগগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথকে দেখি যৌবনে, প্রৌঢ় বয়সে এবং বার্ধক্যে— নিচু-বাংলার আম জাম আমলকী -শোভিত, দোয়েল শ্যামা শালিখ -মুখরিত, শান্ত তপোবনে যাঁর ঋষিকল্প মূর্তি। বালক মুনীশ্বরকেও দেখি, তাঁর চিরজীবনের সঙ্গী। গীতাপ্রস্থানের গূঢ় তাৎপর্য এবং কপিল-কাণ্টের নিহিত ঐক্য যথোচিত ভাবে বোঝানো হল কিনা এই মুনীশ্বরকেও শুনিয়ে স্থির করতেন দার্শনিক। প্রাঞ্জল মধুর ব্যাখ্যান তাতে আর সন্দেহ কী। না জানি কী ভাবে ভাবে-ভোলা মানুষকে প্রবোধ দিয়ে, তাড়াতাড়ি মুনীশ্বর ছুটত ফেলে-আসা ঘরকন্নার কাজে।

শমীন্দ্রনাথকে দেখি, কবির বিলুপ্ত বাল্যবয়সের নূতন প্রতিমা, স্নেহময় পিতার গূঢ় হৃদয়ের কত আশাস্বপ্নের আধার। ১৯০৭ সনের গরমের ছুটিতে বালক-বন্ধুর সঙ্গে মুঙেরে গিয়েছিল, আর ফেরে নি। নিদারুণ দুঃখের কথা কবি কোথাও লিখে যান নি, কখনো উল্লেখ করেন নি বলা চলে। এই সেই শমী। কয়েকটি মাত্র রেখা, একটি ঈষৎ-হেলানো বোঁটায় একটি শিশিরিত সকালের ফুল, অরুণ রশ্মির আশিস্‌চুম্বন নিয়ে জাগবার সঙ্গে-সঙ্গেই আবার সে ঘুমিয়ে পড়ল।

হায় সুস্থির অতীত! আমি যে ধাবমান বর্তমানের ভাড়াটিয়া। পেয়াদা পাঠিয়েছেন কয়েকবার, আজ যদি সাময়িক পত্র -সম্পাদক স্বয়ং আসেন তাঁকে তো ফেরাতে পারব না। কাজেই, চোখে চোখে জীবনসত্যের পরিচয় -গ্রহণে আর কাজ নেই, বানানো তত্ত্বের কয়েকটি কথা সেরে নিয়েই এ নিবন্ধ শেষ হোক।

বানানো তত্ত্ব না হলেও, বানাবার তত্ত্ব এ কথা ঠিক। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অনাড়ম্বর চিত্রকলা, অতি সুলভ উপকরণে। রঙ নেই, সর্বাবয়বসম্পূর্ণ রূপ নেই। কাহিনী নেই, অথবা যা আছে তা দর্শককেই মনে মনে রচনা ক'রে নিতে হয়। তবু, এত কেন তার আকর্ষণ? যে ব্যক্তির কল্পরূপ ফুটেছে পেন্‌সিলের যৎসামান্য আঁকাজোকায়, অল্প আয়াসে, তাঁরই অত্যুৎকৃষ্ট আলোকচিত্র যদি পাই সেও এমন আদরণীয় হবে না। কেন?

গাছের ফুল গাছেই থাকে, বড়ো জোর তাকে মালায় গেঁথে বা ফুলদানিতে সাজিয়ে সৌন্দর্যরুচির অল্প একটু পরিচয় দিতে পারে মানুষ। তুলি ধ'রে কমল-কুমুদকে কিছু চিত্রিত করা চলে না। অথচ শিশু যেমন খেলা করে, তেমনি খেলার ছলে মানুষ চায় স্রষ্টৃত্ব। সে সোলার ফুল বানায়, মণিমুক্তাখচিত সোনার ফুল বানায়— বাগানের ফুলের অনুকরণ করে না। তেমনি ক'রেই চিত্রীর বিশিষ্ট ধ্যান ধারণা ও দৃষ্টির গুণে, উপায় ও উপকরণের স্বভাববশে, উপলক্ষ্যেরও কারণে, চিত্রিত বিষয়ে একটি যে রূপান্তর হয় সেটি কেবলই দোলা দেয় শিল্পী ও রসিকের মনে। ভেবে সুখ পায় শিল্পী, 'আমার সৃষ্টি এই, আমার

আঁকা ছবি।' অর্থাৎ, সে ছবিতে বিষয় এবং বিষয়ী মিলে-মিশে এক হয়ে গিয়েছে। আর, রসিক দর্শক? অনিমেষ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকার বিরল মুহূর্তেও তিনি যে নিষ্ক্রিয় এমন নয়। রচনা যে শেষ হয়েছে এমন নয়। সেই ব্যঞ্জনা, সেই 'ধ্বনি' তাতে রয়েছে, যাতে কোনো দিন তা শেষ হবার নয়— অনন্ত কাল অগণ্য লোক তাকে মনে মনে পুনঃ পুনঃ রচনা ক'রে তুলবে। ফোটোগ্রাফে বা বস্তুনিষ্ঠ অনুকৃতিতে সে সুযোগ নেই; তাই সে আকর্ষণ, সেই আনন্দ-চাঞ্চল্যও নেই।

বীণার একটি তার ছুঁয়ে ছুঁয়ে বাজিয়ে চলেছেন গুণী, সেই হল সার্থক শিল্পরূপ। তরফের তারগুলি গোনা গাঁথা যায় না, সে আছে সকল কালের সকল রসিকের মনে মনে।

বিচিত্র ব্যক্তিস্বরূপের রাগিণী বেজেছে জ্যোতিরিন্দ্রের সুর-বাঁধা বীণাযন্ত্রে, তাঁর সারা জীবনের সাধনায়। সেই আলাপ শুনে আর-একজন গুণী, অবনীন্দ্র-নাথ, মুগ্ধ হ'য়ে বলেছেন এই কথা—

'ছবির খাতায় জানা অজানা ছোট বড় আত্মীয় পর কারু ছবি তুলে রাখতে তিনি ভোলেন নি।··· এই ছবির খাতা উল্টে পাল্টে দেখতে দেখতে আমার সেদিন মনে হ'ল কই আমরাও তো ছবি আঁকি কিন্তু ছেলে বুড়ো আপনার পর ইতর ভদ্র সুন্দর অসুন্দর নির্ব্বিচারে এমন ক'রে মানুষের মুখকে যত্নের সঙ্গে দেখা এবং আঁকা আমাদের দ্বারা তো হয় না, আমরা মুখ বাছি! কিন্তু এই একটি মানুষ তিনি কত বড় চিত্রকর হবার সাধনা করেছিলেন যে সব মুখ তাঁর চোখে সুন্দর হ'য়ে উঠলো, কী চোখে তিনি দেখতেন যে বিধাতার সৃষ্টি সবই তাঁর কাছে সুন্দর ঠেকলো— কোনো মুখ অসুন্দর রইলো না! রূপবিদ্যার সাধনা পরিপূর্ণ না করলে তো মানুষ এমন দৃষ্টি পায় না! যেমন এই মানুষের সঙ্গে তেমনি সুরের সমস্ত যন্ত্রের সঙ্গে তাঁর ভাব ছিল— বাদ্যযন্ত্রগুলো তাঁর কাছে অতি সহজে পোষ মেনে যেতো।'[১৬]

১৬ বঙ্গবাণী, আষাঢ় ১৩৩২, পৃ ৫৭৬

গগনেন্দ্রনাথ

শহরবাসী বন্দীজীবন। একটু নির্‌মুক্ত আকাশ আলো ও সবুজের ক্ষুধায় শনি-বার বিকালে শহরের উপকণ্ঠে ছুটে চলেছি যন্ত্রবাহনে। ঝর্‌ ঝর্‌ ঝনাৎঝন্‌ আওয়াজ ও ঝাঁকুনি বহু দিনরজনীর অভ্যাস-বশতঃ শরীর ও মনকে নূতন করে আর পীড়া দিতে পারে না। যাত্রীর ভিড়ে ১২সি বাসের লৌহদণ্ড অবলম্বনে দণ্ডায়মান থাকতে বিস্তর কসরত করেছি বহুক্ষণ; সে ভিড় এখন পাৎলা হয়ে যাওয়াতে, জানলার কাছে আরামে বসে চেয়ে দেখবার অবকাশ পেয়েছি বাইরে। হঠাৎ চমকে উঠে ভাবলাম— কার চোখের দেখা আবির্‌ভূত হল আমার রূপান্ধ দু চোখে। কী দেখছি! ডায়মন্‌ড্‌ হার্‌বার রোডের দু ধারে এগিয়ে আসছে নির্মীয়মাণ জনপদ, হবু-সিনেমাসৌধের অসমাপ্ত এক তলার আধখানা বহু ইষ্টক-বাহু উঁচিয়ে আছে কল্কে করবী আর আস্‌শেওড়ার জঙ্গলে, সজনে ফুলের ঝুরি নামে নি এখনো, ভাঁট ফুলের বনে খই ছড়ানো হবে চৈত্রে না ফাল্গুনে, উপস্থিত লোক জটলা করছে ভাঙা হাটে আর ছেঁচা বেড়ার দোকানে দোকানে, স্বল্পজল ডোবা থেকে কাপড় কেচে উঠছে পাড়ার বউ-ঝি, নানা দিকে নানা ভঙ্গীতে মাথা তুলে শ্যামবর্ণ ঝালর ঝুলিয়ে দিয়েছে নারিকেল-সুপারি, জামরুল আম জাম কাঁটালের ঘনজনতার পুঞ্জ পুঞ্জ সবুজের শিয়রে এবং পিছনে এবং নানা ফাঁকে ফুকোরে নিরাময় নির্লিপ্ত আকাশের আপাণ্ডুর অবাধ বিস্তার— আস্বচ্ছ মেঘলেখায় ঈষৎ এক পোঁচ— সেখান থেকে আলো এসে পড়েছে দ্রুত-অপস্রিয়মাণ অপূর্ব এই দৃশ্যের কুটীরে অট্টালিকায় গাছপালায় আনাচে-কানাচে পথে ও পথচারীদের গায়ে মাথায়। চকিতে সরে গেল সব, পৌঁছে দিল বাস আগন্তব্য ঠিকানায়।

শত সহস্র বার যা দেখেছি সেও দেখি এতটুকু শ্রীহীন ম্লান বা পুরাতন হয় নি। সে আমার বাংলাদেশ, আমার মাতৃভূমি, আকাশ-আলোক-ধৌত, ধূসরে সবুজে কনকে সুনীলে শুভ্রে সজ্জিত, ভাগিরথী ব্রহ্মপুত্র অজয় কপোতাক্ষ তিস্তা কর্ণফুলি -আলিঙ্গিত, নীলাম্বুরাশিচুম্বিত, শিয়রে যার অহরহ জেগে আছে সহস্রশিখর হিম-মৌলি শৈলমালা। পরিচিতকেই অপ্রত্যাশিত আলোকে এবং সৌন্দর্যে দেখা গেল চিত্রশিল্পী গগনেন্দ্রনাথের অম্লান অমৃতায়িত চোখে, সেই সঙ্গে অন্তঃকর্ণে বাজতে লাগল অনাহত কবিকণ্ঠস্বর—

আমি ভালোবাসি, দেব, এই বাঙ্গালার
দিগন্তপ্রসার ক্ষেত্রে যে শান্তি উদার

বিরাজ করিছে নিত্য— মুক্ত নীলাম্বরে
অচ্ছায় আলোক গাহে বৈরাগ্যের স্বরে
যে ভৈরবীগান, যে মাধুরী একাকিনী
নদীর নির্জন তটে বাজায় কিংকিণী
তরলকল্লোলরোলে, যে সরল স্নেহ
তরুচ্ছায়া-সাথে মিশি স্নিগ্ধ পল্লীগেহ
অঞ্চলে আবরি আছে, যে মোর ভবন
আকাশে বাতাসে আর আলোকে মগন
সন্তোষে কল্যাণে প্রেমে।

কবি রবীন্দ্রনাথে ও শিল্পী গগনেন্দ্রনাথে আশ্চর্য মনের মিল আছে। যতদূর জানি 'জীবনস্মৃতি'র আলেখ্যলিখনে গগনেন্দ্র-প্রতিভার প্রথম স্ফূর্তি না'ও যদি হয়, সাধারণ-সমক্ষে প্রথম আত্মপ্রকাশ। এমন স্বচ্ছ দৃষ্টি, এমন সজীব সতেজ সহজ প্রকাশ, অনায়াস রূপকল্প, ইতিপূর্বে কোথা ছিল আর শিল্পী কখন কেমন করেই বা আয়ত্ত করলেন! গগনেন্দ্রনাথের এই শিল্পসিদ্ধি সম্পর্কে প্রায় বলা চলে—

যখনি জাগিলে বিশ্বে যৌবনে গঠিতা
পূর্ণপ্রস্ফুটিতা।

তাঁর অতুলনীয় প্রতিভার বাল্যলীলা সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি নে এ যেমন সত্য তেমনি অন্যভাবে বিচার করে এ কথাও বলা চলে যে, বালকোচিত সহজ সিদ্ধি, অনায়াসলব্ধ ঐশ্বর্য, বিস্ময়, অনুরাগ, ঋজুতম ভাব ভাষা অভিব্যক্তি, এ-সবই যেন তাঁর জন্মসহচর।

গগনেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ কম-বেশি পরিণত বয়সেই চিত্রকর্মে মনোনিবেশ করেছেন জানি। এ কথাও সত্য, চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন নি তাঁরা, অক্লান্ত এবং অবিরত সাধনা করেছেন তার, অলৌকিক প্রতিভাবলে বলীয়ান ও একাগ্র হয়ে। খুব বেশি বয়সে মন দেওয়াতে এবং বিপুল শক্তি ও প্রতিভা এই দিকেই সম্পূর্ণ নিযুক্ত করার কোনো সম্ভাবনা না থাকায়— রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী বিদেশী কোনো শিল্প-পরম্পরার উপরে কোনো দাবি রাখেন নি, নিজের কর্মকৌশল নিজেই উদ্ভাবন ক'রে নিয়েছেন এমনও বলা চলে। অপর পক্ষে, গগনেন্দ্রনাথ তাঁর প্রতিভাবান্ অনুজ-ভ্রাতাকে কাজ করতে দেখেছেন, প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের শিল্পী ও রসিকদের স্বগৃহে উদার আতিথেয়তা দিয়ে চর্চিত করবার সুযোগ পেয়েছেন— যা দেখেছেন, যা শুনেছেন, স্বয়ং নানাভাবে পরীক্ষাও করেছেন, তাতে তাঁর শিল্পসাধনা অপেক্ষাকৃত সুসাধ্য ও সহজবোধ্য হয়েছে প্রথম থেকেই, তুলিচালনার আঙ্গিকে অপূর্ব অধিকার এসেছে,

এবং আবহমান কালের চিত্রপরম্পরার এক ধারে একটি পরিষ্কৃত প্রসন্ন কোণ তিনি আপনার ক'রে নিয়েছেন। অর্থাৎ, কোনো শিক্ষাগুরুর কাছে বাঁধাধরা নিয়মে শিক্ষা না করার দিক দিয়ে উভয়ে কতকটা মিল থাকলেও, সাধনার পদ্ধতিতে বিশেষ মিল নেই। আর, প্রতিভা? সে তো অ-বিশেষ কখনোই হয় না। সুতরাং, তুলনায় আলোচনার প্রয়োজন তেমন নেই। 'পথ আমারে পথ দেখাবে এই জেনেছি সার' —অন্তর্যামী গুরুর এই মন্ত্র কানে নিয়ে যাত্রা শুরু করায়, উভয়েই একক তীর্থযাত্রী, তাঁদের সত্যকার সঙ্গী নেই, ভ্রান্ত ধারণা -বশতঃ তাঁদের অনুসরণ বা অনুকরণ করতে গেলে দুঃখ পেতে হবে আর ব্যর্থতাই লাভ হবে, অথচ শিল্পী গগনেন্দ্রনাথ (অথবা রবীন্দ্রনাথ) সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণার উদয় হলে, সৃষ্ট চিত্রকলার নানা গুণ পরিচিত হলে— যে-কোনো নূতন শিল্পী, নূতন রূপতীর্থঙ্কর, যার-পর-নেই লাভবান্ হবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

একটি অভাব বা অসুবিধার কথা এখানে উল্লেখ করতে হয়। রবীন্দ্রজীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ জানবার সহজ উপায় আছে। অবনীন্দ্রনাথ, বিশেষতঃ গগনেন্দ্রনাথ সম্পর্কে, সেরূপ তথ্যসংকলন আজও দেখা দেয় নি। অথচ তার একান্ত আবশ্যকতার বিষয়ে কোনোরূপ মতভেদের অবকাশ নেই। তথ্যনির্ভর না হলে অধিকাংশ ব্যাখ্যাই নিরর্থক বা বিপথগামী হয়ে থাকে। বাংলার তথা ভারতের গৌরবোজ্জ্বল একটি অধ্যায়কে ভালোরূপে অধ্যয়ন করতে হলে গগনেন্দ্রনাথ-অবনীন্দ্রনাথ-নন্দলালের জীবনকথা ও কর্মের বিবরণ যথাসম্ভব নির্ভুল সম্পূর্ণভাবে জানা দরকার। তা ছাড়া, এক সময় ছিল বটে শিল্পসৃষ্টিতে শিল্পীর নাম-পরিচয় কেউ যখন খুঁজে দেখত না ; চিত্র মূর্তি তো বটেই, এমন-কি কাব্য নাটকও নিজেই নিজেকে ব্যাখ্যা করত— অর্থাৎ, কাব্য নাটক চিত্র মূর্তি যতটা রসস্বরূপ এবং স্বপ্রকাশ তাতেই সুধী সামাজিকের সম্পূর্ণ সন্তোষবিধান হত। রসরূপ স্বপ্রকাশ হওয়া চাই এ সত্যের আজও যে অন্যথা হয়েছে এমন নয়, তবে বিচারবিশ্লেষণ-পূর্বক রসসৃষ্টিকে বা রূপসৃষ্টিকে যতটা সজ্ঞানে বুঝতে পারা সম্ভব সে বিষয়েও কোনো সভ্যসমাজ নিরুৎসুক নিষ্ক্রিয় থাকতে রাজী নয়। ব্যাস বাল্মীকি হোমর বা কালিদাস সম্পর্কে, স্তুতি-বা-নিন্দাচ্ছলে, সে কালে যে ভাবের রূপকথা রচনা ক'রে জনসমাজ সন্তুষ্ট ছিল আজ তা সমুচিত বা সম্ভবপর নয়। স্বভাবগত আলস্য বা জড়ত্ব -হেতুই এ দেশে তার অন্যথা দেখা যায়। অথচ অতীত বা সদ্য-অতীতকে একই কালে বোধে আর বুদ্ধিতে না পাওয়া পর্যন্ত বর্তমানের অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তার পারে ভাবী সার্থকতার উদ্দেশ -লাভ সুকঠিন। গগনেন্দ্রনাথের রূপ-

স্মৃতি সামনে রেখে, আর জীবনের বিচ্ছিন্ন বিবরণ তাঁর যতটা জানা গিয়েছে তারই সম্বলে, গগনেন্দ্র-প্রতিভার আলোচনায় আমরা প্রবৃত্ত হয়েছি— এর আংশিকতা বা অসম্পূর্ণতা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে।

দ্বারকানাথ ঠাকুরের বংশে সম্ভ্রান্ত জমিদার-গৃহে গগনেন্দ্রনাথের জন্ম। গুণেন্দ্র-নাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র তিনি; বাপের অকালমৃত্যুর পরে, ধীমতী বহুগুণবতী জননীর স্নেহপক্ষপুটে মানুষ হয়ে একান্নবর্তী বৃহৎ পরিবারের যোগ্য প্রতিনিধি, স্বভাবসৌন্দর্যে সম্ভ্রমে সৌজন্যে সামাজিকতায় ঘরে বাইরে সকলেরই পরম প্রিয়জন। (দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অপূর্ব পরিবার সকল রকমে এতই নিকটবর্তী যে, পৃথগন্ন হলেও সত্যই পৃথক্ যে এমন বলা যায় না।) সেই সৌহৃদ্যে ও নিত্যনৈমিত্তিক জীবনযাত্রার দুঃখে সুখে যেমন তিনি রবীন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দীনেশসেন প্রভৃতির প্রীতিভাজন আত্মীয় তেমনি আপনার ছিলেন ওকাকুরা হ্যাভেল উড্রফ নিবেদিতা কার্মাইকেল রোনাল্ড্‌শের— আবার অখ্যাত অজ্ঞাত কত ব্যক্তি তারাও কি তাঁর চিত্তের ঔদার্য এবং ব্যবহারের সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয় নি? মোটের উপর বলা যায়, পরাধীন দেশ হলেও, অখণ্ড সেই বাংলায় সচ্ছন্দ সার্থক এবং শ্রীসম্ভাবনাপূর্ণ ছিল শিল্পীজীবনের সেই উদয়ারুণ সূচনাকাল— সমাজে এবং পরিবারে (ঠাকুর-পরিবার ছিল প্রগতিশীল শিক্ষিতসমাজের পুরোভাগে) আনন্দ উৎসাহ উদ্দীপনার শেষ ছিল না। গগনেন্দ্রনাথের স্বভাবেও ছিল জীবনে অখণ্ড অভিনিবেশ ও প্রীতি। এই প্রসন্নতা, সামাজিকতা, জীবনানুরাগ ও হৃদয়ের বাধামুক্ত প্রসার— কোনো উচ্চ-আদর্শ-সঞ্জাত নয়, অলৌকিক-কল্পনা-বিহারী নয়, সহজ ও স্বতঃ — গগনেন্দ্রনাথের রূপসৃষ্টিতে এরই প্রবল ও পরিপূর্ণ প্রকাশ দেখা যায় প্রথম দৃষ্টিপাতে। এ কথা সকলেই জানেন যে, আঁকবার বিষয় খুঁজে খুঁজে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে বেড়ান নি গগনেন্দ্রনাথ দূর দেশে বা দূর কালে, ইতিহাসে পুরাণে বা অলৌকিক কবিকল্পনায়। দূরপ্রাচ্যের কালী-তুলির প্রয়োগবিদ্যায় যেমনি তাঁর দখল এসে গেল— মনে হয় স্বভাবেই ছিল অনুকূলতা, অশেষ অধ্যবসায় তাঁকে করতে হয় নি— কোলকাতা শহরের ইটকাঠের জঙ্গল, ভিখিরী, ফেরিওলা, তিন-তলার জান্‌লার পাশে নির্বাসিত যক্ষের মতো নিঃসঙ্গ নারিকেল-গাছ আর অকবি অমিশুক কালো কাক —ফিঙে বা বুল্‌বুল্ হলেও কথা থাকত— শিল্পীর সানুরাগ দৃষ্টি হতে, রসক্ষর তুলির প্রসাদ হতে বঞ্চিত হল না কেউ। কেনই বা হবে? রূপসৃষ্টির উৎকর্ষ যে অনেকটাই বিষয়নিরপেক্ষ; গগনেন্দ্রনাথের অজস্র চিত্রকৃতি দেখে মনে পড়ে, মনের পরশমণিটির ছোঁওয়াতে সবই সোনা হয়ে যায়। বিংশ

শতাব্দের শহরের রূপ শিল্পীর তুলির লিখনে অপরূপ হয়ে উঠেছে। তার প্রভাত, তার সন্ধ্যা, তার দিবা দ্বিপ্রহর আর চন্দ্রমাশালিনী রাত-দুপুরের ছাদে-ছাদে-বিস্তারিত জাগরস্বপ্নের মরীচিকা। মনে হয়, আমরা ভালোবাসতে জানি নে ব'লেই আমাদের এ শহর দিনে দিনে কদর্য হয়ে উঠছে। তবু যে অজস্র সৌন্দর্য জনারণ্যে ও যন্ত্রযানের ঘূর্ণচক্রে চুর্ চুর্ হয়ে প্রতিক্ষণে ছড়িয়ে হারিয়ে যাচ্ছে তারও উপযুক্ত কবি খুঁজে পাওয়া যায় না। রূপস্রষ্টা আর-কেউ কি দেখা দেবে? কবে?

কিন্তু, গগনেন্দ্রনাথ শুধু কোলকাতা শহরের রূপদর্শী কবি ছিলেন না। বাংলার মাঠ বাট আকাশ আলোকের আদিগন্ত প্রসার ও প্রসন্নতা তাঁর তুলিকাপাতে অপূর্বরূপে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে— তার রেখায় রেখায়, প্রীতিসিঞ্চিত কালো কালীর পর্দায় পর্দায়, ছাপে ছোপে, এই বাণীই জেগে উঠেছে—

> আমি ভালোবাসি, দেব, এই বাঙ্গালার
> দিগন্তপ্রসার ক্ষেত্রে যে শান্তি উদার
> বিরাজ করিছে নিত্য।

সুদূরবিস্তৃত নদীর ঘাটে যে কুলবধূটি দিনশেষের জল ভরতে এসেছে কলসে, ধারাবর্ষী শ্রাবণে মাঠ-বাড়ির পুকুরে ছিপ ফেলে বসে আছে গোলপাতার ছাতার তলে যে বাবুটি— দূরে দেখা যায় শুভ্রহসিত কাট-মল্লিকার ঝাড়— জেনে বা না জেনে ঐ শান্তিসলিলেরই স্নানে ও পানে ধন্য হয়ে রয়েছে ওরা সব। শ্রীচৈতন্য-চরিতকথার ছলে বঙ্গপ্রকৃতির এই শান্তি, বাঙালি-স্বভাবের এই ভাবমুগ্ধ প্রসন্নতা ও সুখ, ছবির পর ছবিতে শিল্পী আর-এক ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। নিমাই, শচীমাতা, বিষ্ণুপ্রিয়া, কেশবভারতী, সংকীর্তনের সঙ্গী আর টোলের যত পড়ুয়া, এরা কোনো কল্পনাসৃজিত অবাস্তব কাহিনীর নায়ক নায়িকা তো নয়, অতিপরিচিত বাঙালি-ঘরের অতিপ্রিয় বালবৃদ্ধবনিতা— বাংলার আকাশ-আলোকের অবাধ ভূমিকায় এই-যে জীবননাট্য আজ উন্মোচিত এ আমাদের স্বচক্ষে দেখা নয় কিছুতেই বলতে পারি নে। একদিন শোকার্ত হৃদয়ের সান্ত্বনা পেয়েছিলেন গগনেন্দ্রনাথ পুরাণকথা-শ্রবণে ও শিবু কীর্তনীয়ার গানে— সম্ভবতঃ তারই অল্পকালের মধ্যে রচিত হতে থাকে চৈতন্য-চিত্রাবলী। তা হলেও বিশেষ বিবেচনার বিষয় এই যে, রামায়ণ বা মহাভারতের কাহিনী আঁকতে চেষ্টা করেন নি শিল্পী। গোরাচাঁদের জীবন? এমন কে দরদী বঙ্গসন্তান আছে, যে সেই দিব্যজীবনকে অবাস্তব বোধ করে বা প্রত্যক্ষবৎ দেখে না মনের নয়নে? আধুনিক শিল্পীগোষ্ঠীর আর কেউ কেউ, ক্ষিতীন্দ্রনাথ ও নন্দলাল, চৈতন্যের রূপ কল্পনা করেছেন ধারাবাহী ভারত-চিত্ররীতির সঙ্গে সংগত ক'রে, ধ্যানের অভিনিবেশে সকল লৌকিকতার অন্তরালবর্তী অলৌকিককে

উদ্ভাসিত ক'রে— গগনেন্দ্রনাথের স্বভাব-ঘেঁষা স্বস্থ রূপদৃষ্টিতে তার কোনো প্রয়োজনই ছিল না। কারণ, গগনেন্দ্রনাথ অঙ্কিত করেছেন ঘরের ছেলে আর বাঙালি-ঘরের অতি পরিচিত মা-বোনকে মনের মাধুরীতে অভিষেক করিয়ে— অমানব অমর্ত কোনো মাধুরী বা দৈবী লীলা তাঁর কামনায় বা কল্পনায় ছিল না।

ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে এ-সব কিছুই বোঝানো যায় না। বিভিন্ন ফলের স্বাদ এবং ফুলের সৌরভ তুলনায় আলোচনা করে কী লাভ আছে? নিজের অস্পষ্ট ধারণাকে স্পষ্ট করবার জন্যই বলা বা লেখা। ফলে, আর কারও প্রতীতিতে অনুরূপ অস্পষ্টতা থাকলে, হয়তো সেও আকার এবং স্পষ্টতা নিয়ে ফুটে উঠতে পারে।

আমাদের বলবার কথা এই যে, চোখ চেয়ে যে রূপ দেখা যায়, দৈনন্দিন জীবনে আমরা যাদের সংস্পর্শে এসে থাকি, সেই অতি সাধারণ বস্তু বিষয় দৃশ্য ও মানুষ সম্পর্কেই গগনেন্দ্রনাথের দরদ ও ভালোবাসা অতিশয় নিবিড় ও গভীর, উপলব্ধি অতীব অকৃত্রিম। তাই পুরাণ ইতিহাস বা অলৌকিক কোনো কল্পনার আশ্রয় তাঁকে নিতে হয় নি। চৈতন্যজীবনালেখ্য গগনেন্দ্রনাথের পক্ষে অতীত বা অলৌকিক নয়। অনায়াসলব্ধ প্রত্যক্ষই যেমন তাঁর বিষয়, সেই বিষয়ের প্রতি তাঁর মনের ভাব ও ভঙ্গীটি তেমনি অতিশয় সহজ, সরল, অব্যবহিত। সুস্থ সহজ বালকের মনোভাবের সঙ্গেই তার তুলনা। মাটিজল, পশুপাখি, গাছপালা, অতিপরিচয়ের দৈন্যে কিছুই তার চোখে পুরোনো হয়ে ওঠে নি। অনায়াসলভ্যের মধ্যেই অসীম বিস্ময়। আর, নিজের মন ভোলাতে মনে মনে রূপকথা যদি রচনা করতে হয় তাতেও আয়াস বা অসুবিধা নেই।—

আমার রাজার বাড়ি কোথায় কেউ জানে না সে তো।
সে বাড়ি কি থাকত যদি লোকে জানতে পেত।
রুপো দিয়ে দেয়াল গাঁথা, সোনা দিয়ে ছাত।
থাকে থাকে সিঁড়ি ওঠে সাদা হাতির দাঁত।
সাত-মহলা কোঠায় সেথা থাকেন সুয়োরানী,
সাত রাজার ধন মানিক-গাঁথা গলার মালাখানি।
আমার রাজার বাড়ি কোথায় শোন্ মা, কানে কানে—
ছাদের পাশে তুল্‌সিগাছের টব আছে যেই খানে।

কানে কানে বলাই তো দরকার, অবুঝ অনাহূতের দল পাছে হুড়্‌মুড়্ করে ঢুকে পড়ে। অথবা অতিপ্রাজ্ঞ মাস্টারমশাই যদি ভেবে কূলকিনারা না পান হতভাগা ছেলেটার কাছে স্যাৎলাপড়া পুরোনো ছাদ আর মণিমাণিক্য-খচিত অপরূপ রাজপ্রাসাদ দুটোই এক সঙ্গে রইল কী করে। ইচ্ছাময় বালকের ক্ষেত্রে এই এক

মায়ালোক

শ্রীগগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

হিমাচল

শ্রীগগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

অপূর্ব মনস্তত্ত্ব। অলৌকিকের জন্য অন্য কোনো লোকে যেতে হয় না, কঠিন কোনো আসন প্রাণায়াম বা যৌগিক প্রক্রিয়াও লাগে না। বালকের কল্পনায় মাটির ঢেলাই পরশপাথর হয়ে ওঠে; দিনে দুপুরেই জোচ্ছনায় ফটি—ক ফোটে; মা যখন নদীতে নাইতে গিয়েছে সেই ফাঁকে একবার ছাদে চলে এলেই ব্যাঙ্গমা বেঙ্গমী বলো, শেয়াল পণ্ডিত বলো, নাপিত ভায়া বা ঘুমন্তপুরীর রাজকন্যাই বলো, সকলেরই দেখাসাক্ষাৎ মেলে—সঙ্গে মিনি বেড়ালটা থাকে— সত্যি বেড়াল, কল্পনার নয়, প্রত্যক্ষ রূপের অপরূপ লোকে তারও বুঝি বাধাহীন আনাগোনা।

বালকের এই-যে অকৃত্রিম অনাড়ম্বর বোধ, লৌকিকের অন্তরেই অলৌকিকের আস্বাদন, অথবা লৌকিক এবং অলৌকিকের একাসনে এক মালা দুলিয়ে বরণ— সেজন্য বিশেষ চেষ্টা নেই, জটিল কোনো কলাকৌশলের অবতারণা নেই—এটি আমরা গগনেন্দ্রনাথের সমুদয় রূপসৃষ্টিতেই দেখতে পাই। দেখতে পাই তাঁর ভূদৃশ্যাবলীতে, তাঁর শ্রীচৈতন্যচরিত্রচিত্রে, তাঁর রহস্যের-ছক-কাটা অভিনব রূপ-সৃষ্টিতে— কিউবিজ্‌ম্ নামে অতিব্যাপ্তি অথবা অব্যাপ্তির দোষ ঘটে, উত্তর-কিউবিজ্‌ম্ বা নবকিউবিজ্‌ম্ বলা চলে, অথবা ঐ পর্যায়ের সূচনাকালীন বিশেষ একটি চিত্র স্মরণ করে বলাও যেতে পারে— আলাদীনের অপরূপ-রাজ্য -প্রয়াণ। আলাদীন গগনেন্দ্রনাথ স্বয়ং আর আমার বিশ্বাস তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে জানা যেত মায়াবী প্রদীপটিও যে বৈদূর্যমণি-রচিত বা দুর্লভ কোনো ধাতুর এমন নয়, তাঁর আদরের নাৎনিটির খেলাঘরের অতি ছোটো একটি প্রদীপ, হাটে বাজারে অমন অসংখ্য পাওয়া যায়। বয়স্ক আলাদীনের বড়ো অভাব; শত বৎসরে এক-আধটাই দেখা যায়।

শিল্পীর স্বভাবে বালকোচিত বাস্তবপ্রীতি আর সহজাত বিস্ময় থাকাতে তাঁর সৃষ্টিতে, তাঁর রূপকল্পে, অনুরূপ আড়ম্বরহীন অকৃত্রিমতাও দেখা যায়; এজন্য চিত্র-রূপের আকার-অবয়বের সন্নিবেশ ও সংহতি কদাচিৎ দুর্বল হয়ে পড়লেও, সর্বদাই অকৃত্রিম মাধুরী ও অনুকরণহীন নবীনতার গুণে রসিকমাত্রেরই মনোহারী হয়ে ওঠে। সহজ প্রবৃত্তি থেকে বালকে যে ছবি আঁকে তার সঙ্গে তুলনা চলে— ভিতরে ভিতরে একটি সজাতীয়তা আছে। অবশ্য, শিল্পীর নিরন্তর ও নিরলস সাধনার গুণে এমন একটা উৎকর্ষে পৌঁচেছে, এত বিচিত্র হয়েছে, যা নাকি চঞ্চলমতি অপরিণত-বুদ্ধি বালকের ক্ষেত্রে কল্পনা করা যায় না। আবিরভূত কল্পনা ও ভাবনা, ইমাজিনেশন ও আইডিয়া, বস্তুরূপকে কবলিত ক'রে তাকে রূপান্তরিত করে, আর্টের ক্ষেত্রে এমনও হয়। আর, অনায়াসলভ্য বস্তুরূপের আশ্রয়ে, যথোচিত সন্নিবেশে ও সংগতিতে, সহজেই সার্থক হয় ও আপনাকে পরিচিত করে—এমন হতেও বাধা দেখি নে। আমাদের ধারণা, গগনেন্দ্রনাথের শিল্পসৃষ্টিতে শেষোক্ত প্রক্রিয়াই দেখা যায়, তাই

শুরু থেকে শেষ পর্যন্তই বাস্তবানুকারী না হয়েও তা বাস্তব-ঘেঁষা, আর পরবর্তী রূপ-রোমান্টিসিজ্‌ম্‌'এর পর্যায়ে যতটা হেঁয়ালির মতো মনে হয় আসলে তার কিছুই নয়— কিছু-পরিমাণ সচেতন প্রয়াস ও কৃত্রিমতা, সফিস্টিকেশন, দেখা দিয়ে থাকলেও।

অর্থাৎ, শিল্পী গগনেন্দ্রনাথকেই আমাদের দেশের যথার্থ 'মডার্‌ন্‌' বা আধুনিক বলা যায়— তফাত এই যে, আধুনিকদের রূপসৃষ্টিতে প্রায়শঃই আড়ম্বর ও কৃত্রিমতা অত্যধিক, কোথাও বা শ্বাসরোধকর। গগনেন্দ্রনাথের রূপসৃষ্টি তেমন নয়— বিশেষতঃ তাঁর সচেতন বুদ্ধিতে সেদিনের 'অত্যাধুনিক' পাশ্চাত্য চিত্রকলার অভিঘাত না হওয়া পর্যন্ত একেবারেই অকৃত্রিম ও স্বতঃসিদ্ধ।

স্বভাবদৃশ্য, মনুষ্যপ্রতিকৃতি, চৈতন্যচরিত, সামাজিক বিরূপ-লেখন, অপরূপ-চিত্রাবলী— গগনেন্দ্র-চিত্রকলাকে বিষয়বিচার-পূর্বক এই কয়টি প্রধান পর্যায়ে ভাগ করা চলে।

বিশেষ করে চীনা জাপানী চিত্ররীতির প্রভাবে তাঁর শিল্পীজীবনের সূচনা; সে প্রভাব সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করে তার একটি মৌলিক রূপ দিতে তিনি প্রথম থেকেই কৃতকার্য হয়েছেন। কালীতূলির কাজে, ছাপছোপের বিস্ময়কর ব্যঞ্জনায়, টোনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম স্তরবিন্যাসে, তাঁর রুচি ও নৈপুণ্যের তুলনা এ দেশে দুর্লভ বলা চলে। স্বভাবদৃশ্যে —চীনা জাপানী কাজে —দূরত্বের বোধ, সীমাহীন আকাশের প্রত্যক্ষ প্রকাশ ও পরোক্ষ প্রভাব, এবং সেই বিশালতায় চিরবিচিত্র পর্দায় আলোকের ব্যাপ্তি, বায়ুর স্পর্শ, জলের কলধ্বনি, এগুলিই হল বৈশিষ্ট্য এবং বিশেষ ভাবে আদরণীয়। মনুষ্যরূপের কোনো প্রাধান্য এখানে নেই; গাছপালা নদীনির্ঝর জল মাটি পাহাড় কিছুই যখন অচেতন বা জীবনহীন বলে বোধ হয় না, জীব মাত্রই তথাকথিত অ-জীবের সঙ্গে একসূত্রে একই-প্রকার রূপে রেখায় রঞ্জনে গ্রথিত— তার ন্যূনতম ভাব-ভঙ্গীটি থাকলেই চলে এবং চলাই স্পৃহনীয়, কেননা একটুতেই অনেক-কিছুর দ্যোতনা। চেনা লোক দূর দিয়ে গেলে, মুখ না দেখে, আকার অবয়ব না দেখেও, তবু তাকে চেনা যায় এই ভাবে ভঙ্গীতে ও অনুষঙ্গে; আর ঐ লোক যদি স্নেহের বা প্রেমের পাত্র হয়, তবে কত অল্পেই যে তার পূর্ণপরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়ে সে এক পরমাশ্চর্য— কোনো বিশ্লেষণে ব্যাখ্যা করা যায় না। গগনেন্দ্রনাথের মনুষ্যরূপকল্পনায় তথা অন্যান্য বস্তুরূপ-লিখনে, এই ঠারে ঠোরে বলা, অল্পেই অনেকখানির প্রকাশ সর্বদাই আমাদের বিস্মিত ও পুলকিত করে; বিশেষ বিশেষ রূপ প্রত্যেক অঙ্গে প্রত্যঙ্গে, আকারে প্রকারে, অজস্র খুঁটিনাটি যোগ ক'রে, সুগঠিত ক'রে তোলেন নি ব'লে অখণ্ড চিত্ররূপের ভাবলাবণ্যে কোনো ক্ষতি পৌঁছোয় নি, বরং তার সামগ্রিক সারল্যটি চিত্রগত শান্তি ও বিস্তারের অনুকূলই হয়েছে।

শুধু স্বভাবদৃশ্যে নয়, প্রতিকৃতিরচনাতেও। অল্পেই অধিকের ব্যঞ্জনা ফুটেছে;

অনাবশ্যক ও অবান্তর খুঁটিনাটি বাদ দিয়ে সার্থক ও চরিত্রদ্যোতক গড়ন ও রেখা, ছায়ালোকসম্পাত, অচেষ্টায় তুলির ডগে ধরা দিয়েছে। প্রতিকৃতিশিল্পী হিসাবেও গগনেন্দ্রনাথ অতুলনীয়। অথবা, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গেই তাঁর তুলনা চলে। সেই তুলনায় দেখা যায় যে, অত্যল্প রেখার ফাঁদে সারূপ্য এবং চরিত্র ধরার কৌশলে উভয়েই সমান নিপুণ, এবং সুন্দর-অসুন্দর শিক্ষিত-অশিক্ষিত বালবৃদ্ধবনিতা -নির্বিশেষে সকলেই সমভাবে এঁদের শিল্পের বিষয়ীভূত। পার্থক্য এই যে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের চিত্রকৃতিতে রয়েছে কতকটা বিজ্ঞানীর মেজাজ, 'মুখ চেনা' ও 'মাথা মাপা'র গবেষণার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর শিল্পীজীবনের সূত্রপাত— গগনেন্দ্রনাথ বিশেষ ভাবেই শিল্পী, রূপ-ভাবুক, কবি ; ব্যক্তিনির্বিশেষে পরিব্যাপ্ত বোধ এবং প্রীতিই তাঁর প্রতিকৃতিরচনার মুখ্য প্রেরণা। বাস্তববোধ ও সমাজচেতনা তাঁর বিরূপরচনার মূলে। রূপকে ঈষৎ বিকৃত বা অতিকৃত করার কৌশল তিনি একলব্যের মতোই আয়ত্ত করেছেন কতকটা দূর-প্রাচ্য এবং অনেকটা পাশ্চাত্য গুণীজনের নিকট। অথচ মৌলিক রূপ দিয়েছেন। আমাদের সমাজের যা-কিছু অদ্ভুত ও অযৌক্তিক তাই লক্ষ্য ক'রে তাঁর বিরূপবজ্র নিক্ষেপ করেছেন হাসতে হাসতে। অট্টহাস্যও বলা যেতে পারে— বিদ্বেষের জ্বালা বা উগ্রতা নেই। গগনমার্গচারী খুড়ার ছবিতে আছে শুধুই স্মিত কৌতুক, মানসসরোবর ভরাট ক'রে পাকা শড়ক বানাবার চেষ্টা দেখে নির্বাক্ বাগ্‌দেবীর মুখে প্রকাশ পেয়েছে বেদনা, আর অবিমিশ্র বেদনারই অতি মর্মান্তিক রূপ ফুটেছে মাতাল পতিদেবতার পূজারিণী বঙ্গরমণীর রূপে— ললাটের রক্তধারা অজস্র ঝ'রে ঝ'রে যাঁর সিঁথির সিঁদুরকে তিরস্কৃত করেছে। সমাজের ব্যাধি ও বিকৃতির উদ্‌ঘাটনে, রূঢ় সমালোচনে, গগনেন্দ্রনাথ সত্যই পথিকৃৎ ও আধুনিক। যদিও প্রকরণগত মিল আছে বলিষ্ঠ এবং সাবলীল কালীর লেখায়, ভাবব্যঞ্জনার দিক দিয়ে কালীঘাট-পটের ব্যঙ্গ বিদ্রূপ থেকে এই বিরূপ চিত্রাবলীর জাত আলাদা।

পরিদৃশ্যমান স্বভাবের রূপায়ণেই গগনেন্দ্রনাথের অনন্যতা ও শ্রেষ্ঠতা। আকাশ ও আলোকের ব্যাপ্তি, প্রসার ও প্রশান্তি, যেমন ভূদৃশ্যরচনায় তেমনি তাঁর শ্রীচৈতন্য-চিত্রাবলীতে। বালিকা লক্ষ্মী নিমাইপণ্ডিতের কপালে চন্দনের ফোঁটা দিচ্ছে— গঙ্গাতীরে মুণ্ডিতমস্তক সোনার গৌর হোমের আগুন জ্বেলে পিতৃতর্পণে নিযুক্ত, চারি ধারে সিক্তপক্ষ্ম স্বজন প্রতিবেশী— পুরীর সমুদ্রতটে নিঃসঙ্গ সন্ন্যাসী— নীলোচ্ছল জলরাশিতে ভাসমান চেতনাহারা শ্রীচৈতন্য— যে ছবিই চোখ চেয়ে ও মন দিয়ে দেখি-না কেন, চিত্রের বিষয় যে কোন্‌টি— ভাগীরথীবিধৌত বাংলার, সমুদ্রচুম্বিত শ্রীক্ষেত্রের, আকাশ আলোক ও ভূপ্রকৃতি, অথবা অতীত অনাগত -ব্যাপী বাঙালির মন ও বাঙালীর জীবন, নিশ্চয় করে বলা যায় না। হয়তো উভয়ই। অথবা হিন্দু-

বাঙালির সামাজিক জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে সকল বাঙালির প্রাণদা জন্মভূমি —কথাটা শুনতে উল্টো হলেও হয়তো সত্যই।

নিমাই-এ গৃহত্যাগ ক'রে গেছে, রাত্রি তখনো পোহায় নি, দুটি ঘরে প্রদীপ তখনো নেভে নি। নিমাইগতপ্রাণা জননী ও বধূ তাঁর এ নিদারুণ সংকল্পের কথা আদৌ জানতেন না যে তা নয়, তবু যেন বিশ্বাস করেন নি। আর, আজই বা কী করে মানবেন সে দিন সত্যই এসেছে! বৃদ্ধা জননীর দাওয়া থেকে নামবার শক্তি আর নেই। ছায়াসম বধূ আঙিনার হাট-করা দরোজার কাছটিতে এসে দাঁড়িয়েছেন— ঘর-বার নিমেষে সব শূন্য হয়ে গিয়েছে; কাল সন্ধ্যায় সবই তো ছিল, আর আজ সারা নবদ্বীপে কিছু নেই, কেউ নেই। এই হা-হা-করা শূন্যতা দরদী শিল্পীর তুলিতে, যৎসামান্য রঙে ও রেখায়, আকাশে আকাশে বিস্তীর্ণ হয়ে গেছে। শিল্পীর এই অতুল সৃষ্টিতে বিশেষ কোনো চেষ্টা বা কৌশল আছে তা বলা যায় না। বস্তুরূপকে অল্প ক'রে অথচ সুসন্নিবিষ্ট করে অরূপ অবকাশকে অসামান্য করে তোলা হয়েছে।

এর পরের দৃশ্যেই দেখতে পাই অপূর্ব ভাবের পাগল, সুপ্তিচারী পথিক, কেশব-ভারতীর রুদ্ধদ্বারে হাতটি শুধু ঠেকিয়ে ঢুলে পড়েছেন— ঘা দিয়েছেন বলে তো মনে হয় না। ভারতী কেমন করে কী তবু জেনেছেন, জননান্তর পরিচয়ের প্রদীপটি বুকের কাছে আগলে কুটীর থেকে নেমে আসছেন— কত যুগ ধরেই যেন আসছেন, পথ যেন ফুরোয় না— আজ বুঝি মুখোমুখি দেখা হবে গুরু শিষ্যের, তবু জানা যাবে কি কে গুরু আর কে শিষ্য!

মিলনে-বিরহে সুখে-দুঃখে ভক্তিতে-প্রীতিতে বিচিত্রিত মানবজীবন আর বিশ্ব-প্রকৃতি— উভয়ই এই আলেখ্যমালার লেখ্য বিষয় তাতে আর ভুল নেই। বিশ্ব-প্রকৃতিকে পাই এখানে বাংলার অতিপরিচিত সমতলভূমিতে এবং শ্রীক্ষেত্রের সমুদ্র-তটে। চিত্রবিশেষে দেখি নীলোচ্ছল অনন্তবারিরাশি কত সহজে, তুলির কয়টি পোঁচে এতটুকু কাগজের বুকে উছলে উঠেছে।

হঠাৎ মনে হল, গগনেন্দ্রনাথের চৈতন্যচিত্রমালায় আর কিছু কি নেই? বাঙালির মন, বাঙালির জীবন আর বাংলা-উড়িষ্যার আকাশ আলোক ও ভূপ্রকৃতি? তা হয়তো নয়। সময়ে সময়ে এত নিবিড় গভীর তার আবেদন দরদী হৃদয়ে! মূল চিত্র কয়খানি ধ্যানতন্ময়চিত্তে দেখবার। দেখা যাবে— সত্যই আপনার দুঃসহ পুত্রশোকের সান্ত্বনা সৃষ্টি করেছেন শিল্পী ছবির পর ছবিতে। ক্ষেত্রকথক বা শিবু-কীর্তনীয়া তাঁকে কতই বা সান্ত্বনা দেবে? শচী-মায়ের বেদনা তাঁর মতো কে বুঝবে? সেই বেদনায় গগনেন্দ্রনাথ রূপ দিয়েছেন নিজেরই বেদনার। তাই তো

সান্ত্বনা পেয়েছেন। যে ছেলে কাল ছিল, আজ নেই, তারই জীবনালেখ্য স্মৃতিতে উন্মোচন করেছেন জন্মমুহূর্ত থেকে বিদায়কাল পর্যন্ত। বিদায়ের পরেও সে নেই এ কথা তো মন বলে না, এক রূপে না হয় আর-এক রূপে আছে— চৈতন্যচরিত-কথাও তাই তো বলে। সান্ত্বনার উপর সেই তো পরম সান্ত্বনা। চৈতন্য তাঁর আত্মজ, ঔরসজাত পুত্র লীন হয়ে গিয়েছে তাঁরই মধ্যে।[১] চৈতন্য নিষ্ঠুর হয়ে পালিয়েছেন শচী-মায়ের আঙিনা-সীমা থেকে, 'গম্ভীরা'য় ডুব দিয়ে হয়েছেন দুর্লভ-দর্শন, অবশেষে টোটা গোপীনাথের বিগ্রহে লীন হয়ে হারিয়েছেন বিশ্বের তৃষিত চক্ষু হতে, অথচ এ সকলই ছলনা, গৌরগত হৃদয় বলে—

অদ্যাপিও সেই লীলা করে গৌররায়।
কোনো কোনো ভাগ্যবান্ দেখিবারে পায়॥

বঙ্গ কলিঙ্গের সমতল ছাড়া গগনেন্দ্রনাথের নিসর্গচিত্রে পাই বন-উপবন-শোভিত, নির্ঝরসেবিত, মেঘ ও কুয়াশা -আলিঙ্গিত, তুষারমৌলি হিমাদ্রির রূপ; পাহাড়ী মেয়েপুরুষের জীবন; মঠ ও মন্দিরের ছবি। দূর দূরান্তরের ব্যাপ্তি, আলোকের ম্লানোজ্জ্বল বিচিত্র পর্যায় এবং ঊর্ধ্বে প্রসারিত আকাশ বা সুগভীর অবকাশ স্বভাবতঃই এই-সব চিত্রের মুখ্য বিষয়। রেখার ব্যবহার এখানে বিরল বা অনুপস্থিত। পরিবর্তমান টোনের নিপুণ প্রয়োগে অঙ্কিতব্য বিষয় আকার ও বাস্তবতা পেয়েছে— সমুদয় চিত্রক্ষেত্র ব্যাপ্ত ক'রে আছে একটি পরিচ্ছন্ন স্বচ্ছতা, সেটি আকাশ এবং আলোকেরই গুণ, পৃথক্‌ভাবে তার কোনো নামরূপ পরিচয় না থাকলেও সমুদয় রূপকে তা সার্থক ও সুন্দর করে, পূর্ণ করে। বিভিন্ন রূপকে প্রগাঢ় সম্বন্ধে নির্মিত ও সংহত করে তোলার সিদ্ধি এইসব চিত্রে প্রায়শঃই নিখুঁত।

গগনেন্দ্রনাথের রূপসৃষ্টি যে ধরণের তাতে নির্মুক্ত আকাশের মূল্য ও মর্যাদা আছে যেমন, নির্মাণেরও প্রয়োজন আছে সন্দেহ নেই। কলিকাতা-নগরীর বিভিন্ন দৃশ্যচিত্রণে এই নির্মাণকার্যের বিশেষ সহায় হয়েছে স্থাপত্য। শহুরে বাড়ি ঘর রাস্তার জ্যামিতিক কাঠামোকে আশ্রয় ক'রে, এজন্য চিত্রক্ষেত্রকে সামনে পিছনে অধউর্ধ্বে বিভক্ত ক'রে, এক দিকে যেমন সুদৃঢ় স্থিতি পাওয়া গেছে, অন্য দিকে তার শিয়রে রয়েছে আকাশের অবাধ মুক্তি, তাকে ঘিরে ঘিরে সূক্ষ্ম আলো-ছায়ার আঁচল বুলিয়ে চলেছে দিনের প্রহরগুলি। নিশীথনগরীর কয়েকটি ছবিতে

[১] বৈষ্ণবের নামাবলীতে যেমন দেখা যায়, অনুরূপ দিব্যলক্ষণ চরণচিহ্ন ব্যবহার করেছেন শিল্পী বহু ছবিতে। চৈতন্যচিত্রেই বোধ হয় এর সূচনা। কী জানি কার সেই চিহ্নপ্রতীক!

আলোআঁধারী ওড়নার রহস্যগুণ্ঠনে কঠিনকেই কোমল এবং পরিচিতকেই অপরিচিত করে তুলেছে।

অন্ধকারভাবনাহীন আলোছায়ার প্রয়োগ, বিচিত্র টোনের বিন্যাস, গগনেন্দ্রনাথের চিত্রে অভ্রান্ত বলা চলে ; রূপসংহতি ও নির্মাণ হয়তো সব সময় যথোচিত নয়। এক কালে নগর বা পল্লীর অট্টালিকা অথবা কুটীর দিয়ে যেমন তিনি চিত্রের রূপসংস্থিতিকে দৃঢ় করে তুলেছেন, উত্তরকালে জ্যামিতিক ছকের মধ্যে ফেলে শিল্পীর সেই প্রয়োজনই সহজে সিদ্ধ হয়েছে।[২] ছকের ভিতরে ভিতরে দেখা না-দেখায় হারানো আবার খুঁজে-পাওয়া নানা পরিচিত রূপেরই স্থান আছে। মনে হতে পারে, চিত্রে রূপসন্নিবেশকে দৃঢ় ও সংহত করবার প্রয়োজনেই শুধু, অপরূপ-রাজ্যে গগনেন্দ্রনাথের প্রয়াণ। তা অবশ্য নয়। আমাদের ধারণা এই যে, অন্য কারণও আছে।

পূর্বেই হয়তো বলেছি, গগনেন্দ্রনাথের ছবিতে অন্যতম প্রধান বিষয়, এমন-কি মুখ্যতম বিষয় মনে হয় আকাশ এবং আলোক। আজকালকার জড়বিজ্ঞানী বলেন অভিন্ন দেশকাল, মনোবিজ্ঞানী বলেন অভিন্ন দেহমন, অনুরূপ 'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ' স্বীকার করে আমরা হয়তো বলতে পারি— আকাশআলো। আকাশআলোই গগনেন্দ্রনাথের উদার উন্মুক্ত সৌহৃদ্য ও সামাজিকতার যোগ্য প্রতীক, মন ও মেজাজের স্বচ্ছন্দ প্রকাশ। চিত্ররচনার অপরূপ পন্থা কেন তিনি অবলম্বন করলেন— পাশ্চাত্য কিউবিজ্‌ম্ চিত্ররীতির চাক্ষুষ পরিচয় বাদ দিয়ে অন্য ব্যাখ্যা তার দেওয়া যায় না কি ? উল্লিখিত পরিচয়লাভ একটি বাস্তব ঘটনা সন্দেহ নেই। এবং গগনেন্দ্রনাথ খেয়ালখুশি-প্রেরিত স্বাধীন স্ব-তন্ত্র চিত্রকর, পরীক্ষাপ্রবণতা ও নূতনের সম্পর্কে আগ্রহ বা কৌতূহল তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সেও আমরা জানি। পুরাতন বা প্রচলিত কোনো পরম্পরার গণ্ডীতে তিনি আবদ্ধ নন। সত্য কথা। কিন্তু বাইরের এইমাত্র ঘটনা বা এরূপ প্রবণতা ছাড়াও অন্তরতর এবং প্রবলতর হেতু থাকা অসম্ভব নয়।

ভারতের ধ্রুব চিত্ররীতি ছন্দের প্রবাহে ঢেউ খেলিয়ে চলে। অরূপ সেই

[২] এ পর্যন্ত গগনেন্দ্রনাথের আঁকা যেসব নিসর্গচিত্রের আলোচনা আমরা করেছি সেগুলি ছাড়াও আর এক প্রকার দৃশ্যচিত্র তিনি এঁকেছিলেন, সম্ভবতঃ অপরূপচিত্রপর্যায়ের সমকালে বা পরে। নগাধিরাজ হিমালয়ই এখানে আঁকবার বিষয়বস্তু— প্রায়শঃই নিরাবরণ, নিরাভরণ, মেঘ বা কুহেলি -বিমুক্ত খাঁজে খাঁজে প্রত্যক্ষ সুগোচর, তুষারসংহত, সুনির্দিষ্ট এবং কঠিন আকারের কারাগারে বাঁধা। রঙের তুলিতে ফুটে ওঠে নি শুধু, যেন ছেনি দিয়ে কেটে কেটে বার করা হয়েছে রূপ। রূপের ব্যঞ্জনা অবশ্য আছে, তবে স্থাপত্যোচিত নির্মাণেই শিল্পীর বিশেষ লক্ষ বা প্রবণতা তা বোঝা যায়।

স্রোতে রূপের খেয়া যে বায় আয়াস তার অল্প ; পাল তুলে দিয়ে বা তালে তালে দাঁড় ফেলে, দৃঢ়হস্তে হাল ধরে রাখলেই এক কূল থেকে অন্য কূলে পৌঁছুনো যায়। জলের নাম জীবন অকারণ নয়। প্রবাহিত তার গতি। তরুলতায়, পশুপাখিতে, মানুষে, জীবদেহের গঠনে, ঐ জীবনভঙ্গীই লক্ষ্য করা যায়। বীজ থেকেই বিশালতায় পরিণতি ঘটে। নির্মাণকার্য আর-এক জাতের। স্থাপত্যে তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। সেখানে সমগ্রের স্বচ্ছন্দ-বোধ একটি অন্তরে থাকলেও, বুদ্ধিবিচারপূর্বক মেপেজুপে ইটের সঙ্গে ইট গেঁথে তুলতে হয়। সজাগ হিসাবের ভুল হলে চলে না। আকারকে এই ভাবে নির্মাণ করে তোলার প্রয়োজন ছিল বাস্তব-ঘেঁষা পাশ্চাত্য চিত্ররীতিতে। (বাস্তবের সঙ্গে আড়ি করেও অন্য কোনো কর্মকৌশল সে উদ্ভাবন করতে পারে নি আজও ; কারণ, আসলে সেটি সচেষ্ট উদ্ভাবনার বিষয়ই নয়।) গগনেন্দ্রনাথের চিত্রেও এই সজাগ নির্মাণ-কৌশলের কম-বেশি প্রয়োজন বা সার্থকতা আছে। আকাশ এবং আলোক, দেশ ও কাল, যখন তাঁর চিত্রের আসল বিষয়, গাছপালা সরিৎসিন্ধু পর্বতের কতকটা আবাঁধা বিন্যাসেই তা পরিস্ফুট ও সার্থক— অন্যান্য বস্তুরূপ বা মনুষ্যরূপ তাতে আলগাভাবে আরোপ করা মাত্র। বস্তুরূপ বা মনুষ্যরূপকেই অঙ্কনের মুখ্য বিষয় করতে হলে, হয় হৃদয়বেদ্য ছন্দ নয় তো সচেষ্ট নির্মাণের প্রয়োজন আছে। গগনেন্দ্রনাথের উত্তরকালীন চিত্রকৃতিতে ঘনমিতি বা জ্যামিতির ছকে ফেলে, প্রথমেই ত্রিভুজ চতুর্ভুজ আর ক্রমশই বৃত্তাভাসের বহুল প্রয়োগ ক'রে (আলো-আঁধারী মায়ার আবরণে সবটা রহস্যময় ক'রে) এই নির্মাণচেষ্টার বিশেষ একটি পরিণতি লক্ষ্য করা যায়। সরল ও বক্ররেখায়, স্তরবিন্যস্ত সাদায় কালোয়, চিত্রের এই সুগঠিত কাঠামোটি— প্রাচীরে-ছাদে দরোজায়-জানলায় গুম্বজে-খিলানে সোপানে-অলিন্দে সুড়ঙ্গে-স্তম্ভে রন্ধ্রে-ও-নীরন্ধ্রতায়-বিচিত্র স্থাপত্যেরই প্রতিনিধিস্থানীয়। পুরাতন বনেদী বাড়ির আকার ও আবহাওয়া, যেন কোন্ সন্ধানী রঞ্জনরশ্মি-ক্ষেপে এই তার বিশ্লিষ্ট স্বরূপ বাড়ির ছেলের কাছে ধরে দিয়েছে। দুর্জ্ঞেয়তা অথচ ঘনীভূত হয়েই এসেছে। তা হোক, সবটাই জোড়াসাঁকো-ঠাকুরবাড়ির অন্তর-প্রতিকৃতি যে নয়, প্রথম দিকের ছবি দেখে কেউ তা বলবে না। এ বাড়িতে শিল্পীর বহু ভালোবাসা সিঞ্চিত ছিল, প্রত্যেক ইষ্টকখণ্ডে, প্রত্যেক বর্গইঞ্চিতে। তার উপাদানভূত হয়ে আছে আবাল্যস্মৃতি— সে যে কী রহস্যময়, বিস্মৃতির তল থেকে সহসা জেগে ওঠায় ক্ষণে ক্ষণে কী সুন্দর মধুর বা চমকপ্রদ, কিছু তার বাঙ্ময় রূপ আছে অবনীন্দ্রনাথের 'আপন কথা'য় ও 'মাসি'তে, তেমনি অগ্রজের ভোঁদড় বাহাদুরের আজগুবি গল্পে। যা হোক, ছবির পরে ছবিতে দেখা যায় ঐ বাস্তবরূপকল্পেরই

অবাস্তবে বিবর্তন। ঘরের ভিতর ঘর, সেখানে পিঠওলা কেদারায় পিছন ফিরে বসে আছে কে, পায়ের কাছে ও বুঝি 'টেবি' কুকুর, তাকের অন্ধকারে বুঝি নিদ্রিত কাকাতুয়া, দুটি দ্বারের ফাঁকে পরী দাসী অথবা বড়ো চীনে পুতুল— আর, ঋজু ও তির্যক্, চৌকো এবং তেকোণা, দীর্ঘায়িত ও ঘনিষ্ঠ, নানাভাবে আলো-অন্ধকারের নানাবিধ ছক। এ হল প্রথম দিকের একটি ছবি। বাস্তবতা এর আদ্যন্তে, যতই না সাদা-কালো নক্সা কাটা হয়ে থাক্। পরের ছবিতে এতগুলি জীবনের চিহ্ন হয়তো পাওয়া যাবে না, অন্তরালবর্তিনী যে মূর্তি দেখা যায় হয়তো সাকার স্বপ্ন হতেও পারে। আরও পরের ছবিতে সে স্বপ্নও মিলিয়ে গেল। এই-যে পর পর পরিণতি, ছবিগুলি দেখলেই শুধু স্পষ্ট হবে; বর্ণনা দিয়ে বোঝাতে পারব না। পদে পদে বিস্ময়। বিস্ময়ের চরমে পৌঁছে একটু কৌতুক করে হয়তো বলতে পারি, 'যা ছিল তোমার পিতা পিতামহ প্রপিতামহের ভিটা, ঘনিষ্ঠ, কঠিন, জ্যামিতি বা ঘনমিতির মৌল প্রতিপাদ্যে, ত্রিভুজে চতুর্ভুজে বৃত্তে অথবা বৃত্তাভাসে একি করেছ শিল্পী, বিশ্বময় দিয়েছ তায় ছড়ায়ে!' ···শিল্পী কী বলবেন জানি। অন্তত কী বলতে পারতেন ম্লান হাসি হেসে, সে বাড়ির আধখানা যখন নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। প্রবন্ধলেখকের ঘরের বাতাসেও তাঁর নিঃশ্বাস পড়েছিল, এখানকার জানলায় কপাটে তাঁর করের স্পর্শ রয়েছে —এ কথা তো মনে করা যেতে পারে।

কিন্তু, বাড়ির বিশ্বরূপ —এ কথাই সব নয়। যদি মনে করা যায় গগনেন্দ্রনাথের অন্তঃপ্রকৃতির বাস্তব প্রতীক হল আকাশআলো, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সে আজ বন্দী হতে বসেছে জড়ের খাঁচায়। বহুদূরগত (?) মৃত্যুবিচ্ছেদের বিষাদ-অন্ধকারও আবার বুঝি ঘনিয়ে আসছে। আশাভরসা স্নেহপ্রীতির আধার অষ্টাদশবর্ষীয়, নয়নানন্দ, জ্যেষ্ঠপুত্রের মৃত্যুতে[৩] গগনেন্দ্রনাথের মতো বাপের প্রাণে কতটা লেগেছিল অনুমান করাও যায় না; বর্ণনা করা অসম্ভব। বন্ধু দীনেশচন্দ্রকে বলেছিলেন, 'দীনেশবাবু, আমি যে পাগল হয়ে যাব। মনের শান্তি কী করে পাই!' দীনেশবাবুর কথায় ক্ষেত্রকথকের পুরাণপাঠ শুরু হয়। শিবু কীর্তনীয়ার পদাবলীগানও বাড়ির সকলে মিলে শুনেছিলেন। অদ্ভুত ভালো লেগেছিল সকলের। গগনেন্দ্রনাথ মানসিক শান্তি ও সমতা ফিরে পেয়েছিলেন। অন্তত, শোক ও বিষাদ জাগ্রত মনোলোক থেকে অবচেতনার অনাবিষ্কৃত অনালোকে সরে গিয়েছিল এবং তার পর বহুদিন ধরেই গগনেন্দ্রনাথের অক্লান্ত রূপসৃষ্টি অবিচ্ছেদেই চলেছিল। (সুনির্দিষ্ট তথ্যের অসন্ধানে বলা যায় না এই শোকের কারণেই গগনেন্দ্রনাথের শিল্পী-সত্তা ধীরে ধীরে উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল কি না।) এমনিই হয়।

[৩] বিবাহের এক বৎসর পরে।

বারে বারেই দেখা গিয়েছে প্রতিভার আধারে সুখদুঃখ উভয়ই প্রকাশরূপী আনন্দ হয়ে ওঠে এবং গরলও অমৃত হয়। আমাদের দেশে ও কালে বিভিন্নভাবে তা হয়েছে রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের জীবনে। এঁদের প্রতিভার তুলনা হয় না। এঁদের শোকের সান্ত্বনাও হয়তো সেজন্যই আমাদের ধারণাতীত। এক দিকে রক্তমাংসের সাধারণ মানুষ থেকেও, হয়তো এই দুই মহাপুরুষ আর-এক দিকে সকল মরতার ঊর্ধ্বে একটা নিশ্চিত স্থিতি পেয়েছিলেন। গগনেন্দ্রনাথের জীবনের অনেক কথাই আমাদের জানা নেই। মোটের উপর জানি, গার্হস্থ্য জীবনে অনিবার্য বহু দুঃখ, নিদারুণ মনোবেদনা, তাঁকে সহ্য করতে হয়েছিল। শেষ বয়সে[৪] আংশিক পক্ষাঘাতগ্রস্ত হওয়ার পরিণামে তিনি বাক্‌শক্তি হারিয়েছিলেন। যে দুঃখ বাক্যে প্রকাশ করা যায় না, চিন্তা থেকে তাড়ালেও মনের অনাবিষ্কৃত গহনে ওৎ পেতে থাকে এবং একদিন শেষে পাতাল-জোড়া সুড়ঙ্গপথে নিঃশব্দে ফিরে এসে দেহকেই আঘাত করে—এ সেই দুঃখ। মৃত্যুস্তম্ভিত অমৃতের অভিমান। অন্ধকারের রাজ্যে আলোকের স্ফুরণচেষ্টা আর সজ্ঞানে হোক বা অজ্ঞানে হোক আকাশ-ইচ্ছুক অবিশ্রান্ত সংগ্রাম। মানুষেরই এই নিয়তি। জোড়াসাঁকোর বাড়িতে অন্তঃপুরের তিনতলায় নিঃস্পন্দ নির্বাক্ গগনেন্দ্রনাথকে নির্লক্ষ্য দৃষ্টিতে বসে থাকতে দেখে কে তা বুঝেছিল! সকল প্রকাশক্ষমতা হারাবার আগে তবু, গগনেন্দ্রনাথের অন্তিম চিত্ররীতিতে এই বেদনা, এই পথসন্ধান এবং এই আলো আঁধারের অন্তহীন সংগ্রামই বহু স্থলে স্পষ্টরূপে ফুটে উঠেছে ব'লে আমাদের বিশ্বাস।

একটি কৌটো খুলতেই তার ভিতর থেকে আর-একটি বেরিয়ে পড়ে, কত উপাদানের কত গড়নের কৌটো— শেষ ক্ষুদ্রতম কৌটোটিতে পাওয়া যেতেও পারে এক ফোঁটা অশ্রু সুখের বা দুঃখের, এক কণা সিঁদুর কে জানে কার সীমন্ত থেকে, নয়তো শত শত যুগ ধ'রে মূর্ছাহত শাপভ্রষ্ট যে দেবী বা অপ্সরী তারই অদৃশ্য প্রাণটুকু। সমান দুর্জ্ঞেয় নয় কি শিল্পরূপ? তারও একটি অর্থ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা যায় না। অন্য কথায় বলা চলে, আর্টের মায়ামুকুরে জীবনের যে প্রকাশ— প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষ, মুখ্য এবং গৌণ, জ্ঞাত এবং অজ্ঞাত, ভূতভবিষ্যৎ এবং বর্তমান, এ-সবের অনেক দূরান্বয় করেই তার কতকটা তাৎপর্যবোধ হতে পারে।

সুতরাং, গগনেন্দ্রনাথের এজাতীয় অপরূপ রূপকল্পনায় তাঁর নাগরিক জীবনের রূপস্মৃতি রয়েছে, ভিটেবাড়ি-জড়ানো নিবিড় ও গভীর প্রীতি রয়েছে, অনতিসংহত

৪ জীবনকাল: ১৮ সেপ্টেম্বর ১৮৬৭ — ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৮। জীবনের শেষ দশ বৎসর অসুস্থ অক্ষম ছিলেন।

চিত্ররীতিকে সংহৃত এবং নির্মিত করে তোলবার প্রয়াস ও প্রয়োজন আছে, আরও আছে— বন্দিনী আলোর বেদনা, কখনো মূর্ছা, কখনো আত্মস্মৃতি, কখনো স্বপ্নবিহ্বলতা, কখনো জাগরণের জন্যই দিশাহারা আকুলি-ব্যাকুলি, আর সব নিয়েই আর-এক আকাশে আর-এক অনন্ত মুক্তির কামনা ও প্রকাশের ইচ্ছা।

আকাশবিধৃত আলোকপ্লাবিত বিপুলপ্রসারিত ভূপ্রকৃতির মনোহারী চিত্রপর্যায়ে যাকে জীবনের পূজা ও প্রাণের প্রীতি নিবেদন করেছেন, শিল্পী-জীবনের প্রথম যাত্রাকালে, তাকেই আর-এক ভাবে খুঁজেছেন ও বুঝেছেন গগনেন্দ্রনাথ জীবন-শেষের সব সাধনায়। যে আলো দেখেছেন আকাশে আকাশে তাকেই দেখতে চেয়েছেন পাতালেও।

গগনেন্দ্রনাথের একটি মাত্র বাংলা রচনা সাময়িক পত্রে প্রকাশ পেয়েছিল, সম্প্রতি পুস্তকাকারে প্রচারিত হয়েছে— 'ভোঁদড় বাহাদুর'। এ লেখা যেন সুকুমার রায়ই লিখতে পারতেন। ছেলে-চোর দুমুখো রাক্ষসে বুড়ো ভোঁদড়ের স্নেহের নিচুয়াকে ধরে নিয়ে আকাশে পাতালে কোথায় পালালো! সেই দুষ্ট-দমনের ও হারাধন-উদ্ধারের অতিদীর্ঘ অভিযানের পরিণামে, বহু দুর্ঘটনা ও দুঃখপাথার উত্তীর্ণ হয়ে, অবশেষে এক মণিমানিক্যপীঠে জোটেবুড়িমা'র দেখা পাওয়া গেল— 'তাঁর পরনে একখানি জুঁইফুলের শাড়ি, তাতে চন্দ্রমল্লিকার পাড় বসানো, গলায় শিউলি ফুলের সাত লহর, মাথায় নবদূর্বাদলের চমৎকার একটি মুকুট, তাতে ফোঁটা ফোঁটা শিশির পড়ে হীরের মতো চিক্ চিক্ করছে, তাঁর দুই কানে সদাসোহাগিনী কানবালা, আর কপালে জ্বল্ জ্বল্ করছিল সন্ধ্যাতারার একটি টিপ'— তিনি বললেন, ভোঁদড়-কুমার নিচুয়া ভালোই আছে, সাত দিন সাত রাতের সংগ্রামে রাক্ষসকে বধ করেছে, তার সাহস দেখে চুটুপালু বনের একচ্ছত্র রাজা করা হয়েছে তাকে, সোনার সিংহাসনে বসে রাজত্ব করছে।

আজগুবি এবং অদ্ভুত গল্প। রাত দুপুরের দুঃস্বপ্ন। হায়, পুত্রহারা শোকাতুর পিতাকে জাগ্রতে এ সান্ত্বনা কেউ দিতে পারে না।

গগনেন্দ্রনাথের অপরূপ চিত্রমালার অনেকগুলিতে দেখা যাবে একটি বালক বা শিশু। সে স্বপ্নখেয়ার মাঝি বা পক্ষীরাজ ঘোড়ার সওয়ার হতে পারে, অথবা অপরূপ রাজ্যে বিহ্বল হয়ে একা বসে আছে আলাদীন। কখনো ছায়াময়ী রমণীরা ওকে ঘিরে বা আড়াল করে রয়েছে, কখনো বা ঈষৎ আলোয় ধরে দেখছে— এত ছোটো যেন হাঁটতে শেখে নি বা কথাও ফোটে নি। একটি ছবিতে তার

কালীয়দমন দিগম্বর বেশ, কাল-সাপ যদিও অদৃষ্টগোচর।

অবশ্য, কাহিনীতে বা চিত্রে এ-সমস্ত রূপ-কল্পনার কিছুই হয়তো সচেতনভাবে প্রয়োগ করেন নি শিল্পী— আর, সেজন্যই এমন আশ্চর্যজনক হয়েছে। আলো-আঁধারের মায়াজালে কেন যে এমন মুগ্ধতা, কী রহস্যনিবিড় তাৎপর্য, সে প্রশ্নের জবাব হয়তো তাঁর কাছে সুস্পষ্ট বাক্যে জানা যেত না। ছিন্নবিচ্ছিন্ন তথ্য থেকে এবং সামগ্রিক চিত্রস্মৃতি থেকে তবু যা অনুভূত এবং অনুমিত হল, আশা করি, রূপরসিক সুধীজন ভেবে দেখবেন।

কলিকাতা
১৬ জানুয়ারি, ১৯৫৮

অবনীন্দ্রনাথ

অবনীন্দ্র-প্রতিভার বিচার ও ব্যাখ্যা নানা দিক থেকে নানা জনে করেছেন। এই ক্ষণজন্মা শিল্পীর বিচিত্র ও বিশিষ্ট রূপসৃষ্টির আদ্যন্ত বিস্ময়করতা রসজ্ঞ ধীমান ব্যক্তির অজ্ঞাত বা অপরিচিত নয়। তবু হয়তো সব কথা বলা হয় নি, অথবা মুখ্য কথাটি নানাবিধ গৌণ, এমন-কি অবান্তর অপ্রাসঙ্গিক আলোচনার ডাল-পালায়, ফুলে-পল্লবে —হোক-না কেন ভক্তিপ্রীতির অর্ঘ্য— আবৃত হয়েছে। এই উচিত বা অনুচিত ঘটনার অনিবার্য হেতু অনেক আছে স্বীকার করি। এক তো, প্রাচীনের ভাষায় বলতে গেলে, স্বে মহিম্নি, আপনার মহিমায়, আপনাকে গোপন করে বিশাল প্রতিভা। সমকালীন সুধীজন অদূরে দাঁড়িয়ে, আল্‌গোছে, একটি সঙ্গত ধারণায় পৌঁছুতে পারেন না— তার কারণ তার অ-পূর্বতা। পূর্বপরিচিত কোন্ সৃষ্টির সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে প্রত্যাশিত রসাস্বাদে তৃপ্ত হবেন রসিক? তিনি তো স্রষ্টা নন। নিত্যনবীন রূপকে বরণ করবার উপযোগী নব-নবোন্মেষশীল দৃষ্টির অধিকারী নন। কাছাকাছি এলেও অন্য এক অসুবিধা। বিশেষতঃ অবনীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে। ব্যক্তিত্ব তাঁর এমন প্রবল প্রচুর, এত বিচিত্র যে, অভিভূত না হয়ে উপায় ছিল না। সেই প্রাচুর্য আর বৈচিত্র্যের মধ্যে বহু স্ববিরোধী আচরণের, বিশেষতঃ উক্তির, স্বচ্ছন্দ অবকাশ ছিল। যা বৃহৎ, যা প্রাণবান্, তার মধ্যে স্ববিরোধ থাকেই— সেটা কিছু একান্ত নয়। সমস্ত বিরুদ্ধ মতি প্রবৃত্তি ও শক্তির ঘাতপ্রতিঘাতে সৃষ্টিকার্য এগিয়ে চলে, ক্ষণে ক্ষণে এক-একটি সুরসমন্বয়ের বা রূপসমন্বয়ের উদ্ভব হয়— সেই হল এক-একটি ছবি বা কবিতা বা গান। আবার, কোনো অসামান্য প্রতিভার সমুদয় জীবনের কৃতকার্যকে যদি মনোনেত্রে একত্র দেখি, সেও দেখতে পাই ছন্দোময় অখণ্ড অপূর্ব একটি সংগতি, নির্দিষ্ট স্থলে নিরূপিত একটি শমে এসে শেষ হয়েছে— আর, আসলে কোনোদিন শেষ হবেও না।

অবনীন্দ্র-প্রতিভার দিগ্‌ভ্রষ্ট ভ্রান্ত বিচারের বিশেষ কারণ হল ঐতিহাসিক। তাঁর জন্ম এবং কর্ম যে ইতিহাসবিধাতার অলক্ষ্য ইঙ্গিতে, তাঁরই প্রবর্তনায়— তাঁরই নির্দেশে— সেদিন এই ভারতভূমিতে, বিশেষতঃ বাংলায়, দেশীয় এবং বিদেশীয়, প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য, ব্যবহার বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির প্রচণ্ড সংঘর্ষে বীতনিদ্র দেশানুরাগ ও জাতিপ্রীতির আবেগ উত্তাল হয়ে উঠেছিল। আঘাত মাত্রই আনে বেদনা। আবেগ একান্ত অন্ধ না হলেও তার দৃষ্টি হয় না স্বচ্ছ, নিরঞ্জন। দীর্ঘকাল সেই দৃষ্টিতে দেখা হয়েছে ব'লেই, পুরাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত

দেখেছেন অবনীন্দ্র-চিত্রকৃতিতে শিল্পসাঙ্কর্য, বিজাতীয় প্রভাব, ভারতীয় রূপরুচিতে অভারতীয়ের প্রাদুর্ভাব। এ দিকে স্বদেশভক্ত রূপরসিক উল্লসিত হয়েছেন এই ব'লে যে, অবনীন্দ্রনাথের তথা অবনীন্দ্র-গোষ্ঠীর এ সৃষ্টি জাতীয়, ভারতীয়— অজন্তা-বাগে, রাজস্থানে কাংড়ায়, দিল্লি-আগ্রায় যে রূপসৃষ্টি হয়ে গেছে পূর্ব পূর্ব শতাব্দীতে তারই অনুকারী না হোক, ধারাবাহী তো বটেই, অতএব সার্থক ও আদরণীয়। আদর-অনাদরের এই বহু বিরুদ্ধ ভাষণের মধ্যে, তাঁদের কথাও অবশ্য ভুললে চলবে না যাঁরা একমাত্র 'সহজ বুদ্ধি'তে বুঝে নিয়েছিলেন, ছবির আবার দেশী বিদেশী কী— প্রাচীন, অপটু, অপরিণত এক দিকে— আর, অন্য দিকে আধুনিক[১] পাশ্চাত্য চিত্রকলা, যা প্রৌঢ়পরিণত, যা ইন্দ্রিয়গোচর ও প্রাণের উদ্‌বোধক[১] ভাবভঙ্গী ও রূপের বিস্ময়কর অনুকৃতি। শেষোক্ত অভিমতের আজকের বাজারে কোনোই মূল্য নেই সত্য; সেদিন ওরই সঙ্গে সঙ্গে ছিল স্বভাববিজ্ঞের অন্ধ অভিমান আর দ্বিধাহীন উচ্চ কণ্ঠ।

আশা হয়, অবনীন্দ্রনাথের সৃষ্ট চিত্রকলা আজ এমন এক সংগত পরিপ্রেক্ষিতে স্থান পেয়েছে যে, স্বভাবে ও স্বধর্মেই গোচর হতে পারে আর মনোহরণ করতে পারে রসিকের। যেমন দূরেও নয় তেমনি খুব কাছেও নয়। পাশ্চাত্য রূপকলার সাম্প্রতিক প্রমত্ততা ও লক্ষ্যহীন ঘূর্ণাবর্তগতি— তারই প্রবল টানে তাবৎ রসিক-সমাজ আত্মহারা চেতনাহারা হন নি। তবু অসুবিধা এই যে, সূক্ষ্ম-বর্ণ-সুষমাময় ব্যঞ্জনাময় চিত্রালি চোখে যে না দেখেছে, মন দিয়ে বারম্বার না দেখেছে, প্রতিচিত্র দেখে সে তার স্বভাবের ও সৌন্দর্যের বিশেষ ধারণা করতে পারবে না। অবনীন্দ্রনাথের অধিকাংশ ছবির প্রতিচ্ছবি হয় না— অথবা, সে একই কথা, আমাদের দেশে এ পর্যন্ত হতে পারে নি।

অবনীন্দ্রনাথ ক্ষণজন্মা শিল্পী, অ-পূর্ব চিত্ররূপের স্রষ্টা, অলৌকিক প্রতিভার অধিকারী, জগতে শ্রেষ্ঠ রূপকার কালে কালে যাঁরা জন্মেছেন তাঁদেরই একজন। অবনীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এই হল সার কথা। অবনীন্দ্রনাথের সময়ে বাহ্যতঃ পরাধীন ছিল দেশ। পরাধীনতার নাগপাশ আজও হয়তো সম্পূর্ণ ঘোচে নি দেশের মন থেকে। বাহ্য পরাধীনতার চেয়ে আন্তরিক সেই 'পরপ্রীতি', পরানুবৃত্তি, আরও ভয়ংকর। আর, সেই কারণেই ঘরের ঠাকুর ফেলে বিদেশের মাটির ঢেলাকে যদি বা বেশি সম্মান দিই, অস্বাভাবিক অবস্থাতে সেটাই 'স্বাভাবিক' জানি।

১ আজকের 'আধুনিক' নয়। এই অশিক্ষিতপটু সমালোচকেরা চোখ দিয়েই দেখেছিলেন বিলাতি চিত্রকলা; প্রাণের উদ্‌বোধক কোনো গুণের কোনো আভাস পেয়েছিলেন কি না নিশ্চিত বলা যায় না।

সে ক্ষেত্রে রূপস্রষ্টা হিসাবে অবনীন্দ্রনাথের যে শ্রেষ্ঠতা আমাদের বিচারে, আমাদের বোধে, স্বতঃই প্রতিভাত হয়েছে, সেটি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ব্যক্ত করাই আমাদের মুখ্য কর্তব্য বলে মনে করি।

অবনীন্দ্রনাথের চিত্রকৃতির একটি ঐতিহাসিক মূল্য ও মর্যাদা আছে সত্য। কিন্তু, সেটিও প'ড়ে-পাওয়া সামান্য জিনিস নয় বা আকস্মিক নয়। নিতান্ত ঘটনাক্রমে দেশকালের বিশেষ এক সন্ধিস্থলে এসে পড়েছে ব'লেই নয়। **ভারতীয় চিত্রকলার একটি অনিবার্য পরিণাম তাঁরই কাজের ভিতরে সার্থক হয়েছে, পূর্ণ হয়েছে।** সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, যুগ-যুগ-প্রবাহিত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দুটি ধারা এসে তাঁর বিশাল প্রতিভায়, মৌলিক রূপরুচিতে মিলে মিশে এক হয়ে গিয়েছে। বাংলা সাহিত্যের বেলায় যেটি হয়েছে বঙ্কিমচন্দ্রে, বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথে। (এ বিষয়ে বাংলা সাহিত্য নিখিল ভারতীয় সাহিত্যেরই প্রতিনিধিত্ব করেছে, পথিকৃৎ হয়েছে।) এটি তো সামান্য ঘটনা নয়। সভা আহ্বান ক'রে, সংকল্প গ্রহণ ক'রে, প্রাণান্ত পরিশ্রমে বা চেষ্টায়, সম্ভব ছিল না এটিকে ঘটিয়ে তোলা বা রোধ করা। এ এক আশ্চর্য রহস্য।

প্রসঙ্গান্তরে আলোচিত হয়েছে অজন্তার ধ্রুবরীতির সঙ্গে উৎকৃষ্ট মোগল-চিত্ররীতির সজাতীয়তা। আশ্চর্য এই যে, আকবর-জহাঙ্গীরের শাহী দরবারে কে জানত অজন্তা-বাগের গুহাহিত ঐশ্বর্য! তবুও যোগসূত্র নষ্ট হয় নি। এই মোগল-চিত্ররীতি কিভাবে নষ্ট হল আমাদের জানা আছে। মুখ্যতঃ এজন্য নয় যে, মোগল-সাম্রাজ্য রইল না, 'নিশার স্বপন-সম' মিলিয়ে গেল তার রাজৈশ্বর্য ও প্রতাপ। স্বভাবের ছন্দোময় অনুবৃত্তি অজন্তা-চিত্ররীতিতে ছিল না এমন নয়, মোগল-চিত্ররীতিতেও অবশ্যই ছিল। এই অবস্থায় দিল্লি-আগ্রার দরবারে এল যখন নবজাগ্রত য়ুরোপের নূতন চিত্রকলা, তার প্রবল প্রচুর অলজ্জ বাস্তবতা, সে যে অপ্রত্যাশিত চমক লাগালো না অধিকাংশের চক্ষে তাও নয় এবং দিনে দিনে অতিপ্রাচীন প্রাচ্য সভ্যতার অবসাদ যতই বেড়ে চলল, ধূলিস্তর সঞ্চিত হতে থাকল বোধে এবং বুদ্ধিতে, প্রথমে যা চোখ ভুলিয়েছিল ক্রমে তা মন ভুলিয়ে নিল, নবাব-বাদশা আমীর-ওমরাহের আদেশ হল আর অল্পমতি শিল্পীদেরও আগ্রহ হল— বাস্তবানুকারী য়ুরোপীয় চিত্রকলার অনুকরণে। ভিতর থেকেই মৃত্যু হল। যে রসের উৎস ছিল প্রাণের ভিতর ক্রমে তা শুকিয়ে গেল। একান্তভাবে পরধর্ম আশ্রয় করেই বাঁচবে যে, সে সুযোগ আর সম্ভাবনাও থাকল না মোগল-চিত্রকলায়। একটা দিকে আকস্মিক ছেদ পড়ল ভারতীয় চিত্রকলায়। এ ধারে, ও ধারে, কিছুকাল টিকে রইল সত্য পাটা এবং পট, রাজস্থান ও কাংড়া কলমের ছবি, বিশেষতঃ ব্যবহারিক কারুকলা। সে আর কত

দিন? মনে হল, ভীমরতি-ধরা প্রাচীন প্রাচীকে নবীন য়ুরোপের পাদপ্রান্তে বসে প্রথম থেকেই শিখতে হবে চিত্রকলা, মূর্তিকলা— আসবাবপত্রে বসনে-ভূষণে শয্যাসনে দেশীয় কারুকর্ম, অর্থাৎ অলংকরণ ও বর্ণরুচি, নিন্দনীয় যে তা নয়, তবে বৈচিত্র্যের ও নূতনত্বের খাতিরে সেখানেও অনেক-কিছু আমাদের নেবার আছে নূতন গুরুকুল থেকে। অবনীন্দ্রনাথের আবির্ভাব, তাঁর জন্ম ও কর্ম, এদেশীয় শিল্প ও সংস্কৃতির এই নিদারুণ ক্রান্তিকালে। ভারত-শিল্পসাধনার যে সূত্র ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল তাতেই আবার জোড়া লাগাতে হবে, পুরাতন অক্ষগুটিগুলি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মুখস্থ বীজমন্ত্র উচ্চারণ করলেই চলবে না, নব নব মণিমানিক্যে হার গেঁথে ললাটে পরাতে হবে, কণ্ঠে দুলিয়ে দিতে হবে ভারত-ভারতীর— নূতন বন্দনাগানে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হবে নিঃশব্দ দেবীমন্দির— এ নির্দেশ তাঁকে কে দিয়েছিল! রাষ্ট্র বা সমাজ, রাজা বা মহারাজা, সামন্ত বা শ্রেষ্ঠী, এরা কেউ নয়।

পাঠশালা-পলাতক ছেলে নিজেরই খেয়ালে নিবিষ্টচিত্তে আঁকেন চিত্র-বিচিত্র। পরে বিলাতি আর্ট্ শিখলেন বিলাতি গুরুর কাছে— আর্ট্‌স্কুলের বাঁধাধরা কার্যক্রমের মধ্যে নয় যদিও— নিজেরই ইচ্ছাসুখে। সেই শিক্ষার প্রথম গুরু হলেন তাঁর কলিকাতা আর্ট্‌স্কুলের উপাধ্যক্ষ, ইটালিয়ান শিল্পী ও. গিলার্ডি। তেলরঙের কাজে ও প্রতিকৃতি-অঙ্কনে হাত তৈরি হল কিছুদূর। পরে আবার শেখেন ইংরেজ আর্টিস্ট্ সি. এল. পামারের কাছে। সেই তেল-রঙের কাজ ও প্যাস্টেল (কিট্টলেখনী), বিলাতী কায়দায় ভাড়া-করা মডেল বা আদর্শ সামনে দাঁড় করিয়ে রেখে পেশী ও অঙ্গ -সংস্থানের তন্ন তন্ন সন্ধান। এই সময়ের একটি ঘটনায় অবনীন্দ্র-চরিত্রের বিশেষ সৌকুমার্য এবং এই প্রতিভার নিজস্ব প্রকৃতি সুন্দর প্রকাশ পেয়েছে।

অবনীন্দ্রনাথের নিজের ভাষা তুলে দেওয়া যাক্।—

সাহেব বললেন, 'আমার যা শেখাবার তা আমি তোমায় শিখিয়ে দিয়েছি। এবারে তোমার অ্যানাটমি স্টাডি করা দরকার।' এই বলে একটা মড়ার মাথা আঁকতে দিলেন। সেটা দেখেই আমার মনে হল যেন কী একটা রোগের বীজ আমার দিকে হাওয়ায় ভেসে আসছে। সাহেবকে বললুম, 'আমার যেন কী রকম মনে হচ্ছে।' সাহেব বললেন 'No, you must do it! তোমাকে এটা করতেই হবে!' ···কোনোরকমে শেষ করে দিয়ে যখন ফিরলুম তখন ১০৬° ডিগ্রি জ্বর।[২]

[২] জোড়াসাঁকোর ধারে। এই প্রসঙ্গে 'জীবনস্মৃতি'তে বর্ণিত বালক রবীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতা স্মরণীয়। নিজেদের 'ইস্কুল-ঘরে' আস্ত একটি নরকঙ্কাল গা-সওয়া হয়ে যাওয়ার পরেও, বিচ্ছিন্ন

কী জানি এরই আগে অথবা পরে[৩] আশ্রয় নিলেন অবনীন্দ্রনাথ মা-গঙ্গার কোলটিতে, মুঙ্গেরে কষ্টহারিণীর ঘাটে বা বিশ্রাম ঘাটে। (মনশ্চক্ষে দেখা যায়, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী থেকে আরও অনেকে অনেক দিন আপনার ধ্যানের ধনকে চেয়েছেন এই কষ্টহারিণীর ভাঙা পৈঁঠেয় ব'সে। সে কথা থাক্।) শিল্পী তেল-রঙ ছেড়ে জল-রঙে আঁকতে লাগলেন মুগ্ধ-চোখ-দিয়ে-দেখা মন-দিয়ে-ছোঁওয়া বিবিধ রূপ। কোলকাতায় ফিরে এসে আরো কিছুদিন শিক্ষা নিলেন জল-রঙের। দিন যায়, বৎসর যায়, স্বেচ্ছাবৃত তপস্যায় বিশ্রাম বা বিরতি নেই। কিন্তু, কবির ভাষায় বলতে গেলে, 'তবু ভরিল না চিত্ত'। প্রতিভার এই বয়ঃসন্ধিসময়ে, এক দিকে বুড়ি মার্টিন্‌ডেল, ছোট্‌দাদা-মহাশয়ের বন্ধু, বিলেত থেকে পাঠালেন স্বহস্তে-চিত্রে-করা 'আইরিশ মেলডিজ'এর দশ-বারোখানি পাতা; অন্য দিকে ভগ্নীপতি শেষেন্দ্র পাঠালেন দিল্লি থেকে 'পার্শিয়ান ছবির বই'[৪], যার কবিত্বময় চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন বলেন্দ্রনাথ 'দিল্লীর চিত্রশালিকা' প্রবন্ধে। অবনীন্দ্রনাথ বলছেন—

এক দিকে আমার পুরাতন ইউরোপীয়ান আর্টের নিদর্শন ও আর-এক দিকে এ দেশের পুরাতন চিত্রের নিদর্শন। দুই দিকের দুই পুরাতন চিত্রকলার গোড়াকার কথা একই। সে যে আমার কী আনন্দ ···

ভারতশিল্পের তো একটা উদ্দিশ পেলুম। এখন শুরু করা যাবে কী ক'রে কাজ? ··· দেশের শিল্পের রাস্তা তো পেয়ে গেছি, এখন আঁকব কী?··· রবিকাকা আমাকে এই পর্যন্ত বাৎলে দিলেন যে চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির কবিতাকে রূপ দিতে হবে।[৫]

তখন যে আনন্দে ও উৎসাহে সুরস্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছিলেন বাল্মীকি-প্রতিভা ও কালমৃগয়া, ঠিক তেমনি আনন্দে ও উৎসাহে রূপস্রষ্টা অবনীন্দ্রনাথ আঁকতে লাগলেন 'কৃষ্ণলীলা'। আশ্চর্য এই যে, একই 'আইরিশ মেলডিজ' যেমন কবিকে তেমনি শিল্পীকেও প্রভূত প্রেরণা জোগাবার কারণ ঘটেছিল। কৃষ্ণলীলার

একটি মনুষ্যকণ্ঠনলী দেখে, তরুণ মাস্টার মশায়ের বহু উচ্ছ্বাস-সত্ত্বেও পুলকিত হতে পারেন নি, আর মেডিকাল কলেজের শবব্যবচ্ছেদের ঘরে গিয়েও বালকের ইন্দ্রিয় এবং মন পীড়া বোধ করেছিল। রবীন্দ্রনাথের চরিত্রে ছিল একই সৌকুমার্য। জ্ঞানপিপাসা হয়তো বেশি ছিল, সেই সঙ্গে মনোবল ও স্নায়বিক সহনশীলতা। তবে গোটা মানুষের তত্ত্ব যে, আংশিক অনুপাতেও, তার কোনো অঙ্গপ্রত্যঙ্গে নেই— সজীব সৌন্দর্য ও প্রাণ যে সকল রকম ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের অতীত— প্রতিভাবান বালকের পক্ষে সেটি বুঝতে ক্ষণমাত্র বিলম্ব হয় নি।

[৩] খৃস্টীয় ১৯০০ সাল। মুকুল দে: Visva-Bharati Quarterly, May-Oct. 1942

[৪] আসলে পাটনা কলমের ছবি। [৫] জোড়াসাঁকোর ধারে।

'যমুনা'

শ্রী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই বর্ণাঢ্য দৃশ্যকবিতাগুলির সাক্ষাৎ পরিচয়ে পামার বললেন, 'নিজের রাস্তা তুমি পেয়ে গেছ। আর ঢুঁড়ে বেড়াতে হবে না বাইরে।'[৬]

পরে এই 'কৃষ্ণলীলা'র পরিচয়েই ভারত-প্রেমিক ই. বি. হ্যাভেল নিমেষে চিনে নিয়েছিলেন অবনীন্দ্রনাথকে অলক্ষ্য ভাবীকালের আসনে কলালক্ষ্মীর নিজের হাতে বরণ করা শিল্পী ব'লে, সযত্নে মোগল-চিত্রকলার সূক্ষ্ম সুকুমার শৈলীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটিয়ে দিয়েছিলেন, এবং ম্রিয়মাণ মুমূর্ষু পরম্পরায় নবজীবনসঞ্চারের দুরূহ ব্রতে তাঁকে চেয়েছিলেন সমর্থ সহযোগীরূপে।

ক্ষুদ্র প্রবন্ধে অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভা-বিকাশের আনুপূর্বিক বিবরণ দেওয়া যাবে না, আর তার প্রয়োজনও নেই। সে দায় যোগ্যতর ব্যক্তি হাতে তুলে নেবেন। (কবে, সে অবশ্য জানি নে।) অবনীন্দ্রনাথের স্মৃতিকথা-রূপ রূপকথায় নির্ভেজাল তথ্য না থাক্, শিল্পীর জীবনের ও মনের সত্য ছবি একটি সুন্দর ফুটে উঠেছে সন্দেহ নেই— সেই সঙ্গে পাওয়া যায় সমকালীন নানা জনের নানা খণ্ডবিখণ্ড আলোচনা। যেটুকু বিবরণ এখানে সংকলন করা গেল তার বিশেষ তাৎপর্য এই যে—

শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ নিজের রাস্তা নিজেই এক রকম খুঁজে বার করেছেন, অন্তরের আবেগে আর অনুকূল ঘটনা-সমাবেশে।

তা ছাড়া, পাঠশালা-পালানো জেদী মনোবৃত্তি যতই থাক্ (মৌলিক প্রতিভার সঙ্গে এ যেন না থেকেই পারে না) তৎকালপ্রচলিত বিলাতি করণকৌশল তিনি অতিযত্নেই আয়ত্ত করেছিলেন। অবশ্য, 'দ্বাদশবর্ষাণি' ব্যাকরণ পড়তে হয় শতকরা নিরানব্বই জনকে, এতটা সময় তাঁর লাগে নি, যেহেতু তিনি ছিলেন এক শো'র মধ্যে একজন— হয়তো লক্ষের মধ্যেও অদ্বিতীয়।

মনে পড়ে চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসরের ও পারে বিস্মৃতপ্রায় একটি শীতের সকালে, পাঁচ-নম্বর দ্বারকানাথ ঠাকুর গলির অধুনাবিলুপ্ত দক্ষিণের বারান্দায়, স্মিত-কৌতুকে কী বলেছিলেন শিল্পীগুরু তরুণ এক শিল্পশিক্ষার্থীকে — 'এ পথ জেনো, হয় বাদশার নয়তো ফকিরের।' শুনতে পাই তরুণ নন্দলালকেও তিনি এই কথাই বলেছিলেন। আজ ধারণা হয়েছে, এ পথ বিশেষ ক'রে তারই যে একাধারে বাদশা আর ফকির, জ্ঞানগম্ভীর আর শিশু। এই দুর্লভ দ্বৈতের অপূর্ব সমাবেশ দেখেছি অবনীন্দ্রনাথে সে কথা ভোলা যায় না, আর ভুলি যদি তা হলে এই রূপস্রষ্টাকে ও তাঁর সৃষ্টিকে বুঝব কী উপায়ে। বাদশা আর ফকির উভয়েই স্বতন্ত্র, স্বাধীন।

[৬] Charles Palmer : I should strongly advise you to procceed in this line ... these pictures have a character of their own. You require no studies from life any more.

—যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় : V. B. Q. May-Oct. 1942.

কারও মন রাখার কোনো দায় নেই তাঁদের। এ কথা তাঁরাই বলতে পারেন : তদ্‌রম্যং যত্র লগ্নং হি যস্য হৃৎ। আর, একাধারে যে বাদশা ও ফকির, এক সঙ্গে তারই তো ত্যাগ এবং ভোগ। কেননা, অতুল ঐশ্বর্য থাক্‌ বাইরে—

অন্তরে তার বৈরাগী গায়
তাইরে নাইরে নাইরে না।

আবার এর বিপরীতও দেখো, যখন রিক্ততাতেই তার আসন তখনও অন্তরের ঐশ্বর্য তার কল্পনা করতে পারে না লক্ষপতি কোটিপতি ধনী— রূপের ঐশ্বর্য, রসের অফুরন্ত ফোয়ারা, চেতনা, বেদনা, আনন্দ। নিষ্কাম নিরভিমান সে শিশু। জীবন যদি সত্যই রঙ্গমঞ্চ হয়, স্বভাবতঃই সে নট — আয়াস বা অভ্যাসের প্রয়োজন নেই, তাই কৃত্রিমতাও নেই। রূপরসিক পরমহংস বলতে পারো। মহান্‌ শিল্পীর এই-যে রূপ কল্পনা করা গেল বস্তুতঃ এটি কল্পনা নয়। এ আমাদের প্রত্যক্ষ। এইটিই আসল অবনীন্দ্রনাথ। চোখে যে দেখেছে, হৃদয় দিয়ে বুঝেছে, সেই ধন্য হয়েছে এবং জেনেছে যে, এই অতুলনীয় ব্যক্তিসত্তারই কী-একটা বিশ্লেষণাতীত স্পর্শ রয়েছে অবনীন্দ্রনাথের সকল রূপসৃষ্টিতে। বিশ্লেষণ হয় না এমন রসাত্মার কথা না হয় থাক্‌, এই অভিনব সৃষ্টির দেহগঠন ও প্রাণধর্মের কিছু পরিচয় যদি পাই তা হলেও বিশেষ সৌভাগ্য বলতে হবে।

আর্ট কী নিঃশেষে বলা যায় না, কিন্তু আর্টিস্টের আঁকা ছবিকে নানা দিক থেকেই বিচার করা যায়। বিভিন্ন আর্টিস্ট্‌ও সে কাজ করেছেন। শিল্পকথা গ্রন্থে 'শিল্পপরিচয়' প্রবন্ধে শিল্পী নন্দলাল বিচার করেছেন ছন্দের দিক থেকে, গতির দিক থেকে, অর্থাৎ আপাতস্থির রূপের রেখায়-রেখায়-গতিশীল ভঙ্গীর দিক থেকে। বলেছেন, স্বগত, শ্রেণীগত, সার্বজনীন, ত্রিবিধ ছন্দের আশ্রয়ে তিন ধরণের ছবি দেখা যায়— অনুকারক, ব্যঞ্জক, ছান্দসিক। একদা অবনীন্দ্রনাথ ব্যাখ্যা করেছিলেন রূপের দিক থেকে। ঘূর্ণমান ছায়াতপপুঞ্জের ভিতর থেকে রঙের নীহারিকালোকে থেকে থেকে এক একটি রূপ কিভাবে জেগে উঠছে, শিল্পীর— তেমনি রসিকের— মুখের দিকে চেয়ে থাকছে সুস্মিত স্থিরলাবণ্যে। মুখে বলেছিলেন আর প্রবন্ধেও লিখেছেন, ছবিতে থাকে রূপসাদৃশ্য, কল্পনাসাদৃশ্য, ভাবসাদৃশ্য। একটি থাকলেই অন্য দুটি থাকবে না এমন নয়। তিনটিই থাকবে, তবে মুখ্য লক্ষণটি দেখেই চিত্রের ঠিকুজি-কোষ্ঠী রচনা করা সম্ভব হবে।

রূপের সদৃশ রূপ— কল্পনার প্রেরণে ও ভাবের আবেশে তার মধ্যেও থাকতে পারে বহুবিধ স্বগত ভেদ। কতখানি চোখের দেখা আর কতটা মনের রচনা। মন যখন সজ্ঞানেই সৃষ্টিকর্তা হয়ে বসে, কোনো রূপের সঙ্গে কোনো রূপ মেলাবার বায়না সে নেয় না, ইচ্ছাসুখে কল্পবৃক্ষতলে কল্পিত বা স্বপ্নে-দেখা দেবদেবী অপ্সরকিন্নরের

আনন্দ-উৎসবও উন্মোচিত ক'রে বসে— দেখে দেখে রসিকের মুগ্ধ দৃষ্টি বলতে পারে না চেনা বা অচেনা। ভাবসাদৃশ্যে শিল্পী রচনা করে ভাবেরই রূপ, নিবিড় ও গভীর উপলব্ধির আধার, সুখদুঃখ রাগবিরাগ বিষাদ শোক ও শান্তির অপূর্ব প্রত্যক্ষতা। কত ঋতুর কত ভাব, প্রভাতসন্ধ্যার, দিবসরাত্রির। অরণ্য পর্বত সরিৎ সিন্ধুর, হয়তো বা গানের, গন্ধের। কেননা, ভাব থেকে রূপে, তেমনি রূপ থেকে ভাবে 'অবিরাম যাওয়া-আসা'। আবার তো অবনীন্দ্রনাথের মুখের কথাই সংকলন করতে হয়। শিল্পী মুসৌরি পাহাড়ে যখন ছিলেন—

সে যেন কিন্নরের গান, শুনে এসেছি রোজ দুবেলা। গান তো নয়, যেন চন্দ্র-সূর্যকে বন্দনা করত তারা। ··· বহুদিন পরে কোলকাতায় তারাই সব এক এক করে ফুটে বের হল আমার একরাশ পাখির ছবিতে। দেখে নিয়ো, তার ভিতরে সুর আছে কিছু কিছু ··· সে কত পাখি, সব চোখেও দেখি নি, কানে শুনেছি তাদের গান।[৭]

আবার বলছেন—

সন্ধ্যে হচ্ছে, বসে আছি বারান্দায়, বাংলা দেশে সেদিন বিজয়া। হঠাৎ দেখি চেয়ে লাল আলো পর পর পাহাড়গুলির উপর দিয়ে চলে গেল। সেই আলোয় পাহাড়গুলির উপরে ঘাস পাতা ঝিল্‌মিল্‌ করে উঠল। মনে হল যেন ভগবতী আজ ফিরে গেলেন কৈলাসে, আঁচল থেকে খসা সোনার কুচি সব দিকে দিকে ছড়াতে ছড়াতে। রঙ, আলোর ঝিল্‌মিল্‌, তার সঙ্গে একটু ভাব— 'উমা ফিরে আসছেন কৈলাসে'। তখনি ধরে রাখল মন। কোলকাতায় এসে এই ছবি আঁকতে বসলুম। ঠিকঠাক সেই ভাবেই কি বের হল ছবি? তা তো নয়, মনের কোণ থেকে বেরিয়ে এল সোনালিরুপালি রঙ নিয়ে সুন্দরী একটি সন্ধ্যার পাখি— সে বাসায় ফিরছে। মনের এ কারখানা বুঝতে পারি নে।··· অনেক ছবিই আমার তাই— মনের তলা থেকে উঠে-আসা বস্তু।[৭]

এই-যে বহুরূপী পাখিগুলি, কখনো গানের, কখনো ধূপছায়ার, কখনো 'বিজয়া'র করুণ বিষাদের বিচিত্র প্রতীক বা প্রতিমা, এগুলি সবই শিহরিত শিল্পীহৃদয়ের বিভিন্ন ভাবেরই সদৃশ। রূপসাদৃশ্য এখানে থেকেও নেই, খুবই গৌণ বলা যেতে পারে। করামলকবৎ রূপসাদৃশ্য, শিল্পীর আরও অজস্র ছবিতে এমনি অপ্রধান ভূমিকাতেই বর্তে আছে, প্রধান হয়ে উঠেছে কল্পনাসাদৃশ্য, অথবা ভাবসাদৃশ্য—

[৭] জোড়াসাঁকোর ধারে। 'শ্রুতিধরী' শ্রীমতী রানী চন্দের নিকটে আমাদের কৃতজ্ঞতার সীমা নেই। তাঁর এই শ্রুতিলিখন বা স্মৃতিলিখন বিহনে অবনীন্দ্রনাথের কথাতেই অবনীন্দ্রনাথকে বোঝবার প্রযত্ন অনেকাংশেই অসম্ভব হয়ে পড়ত।

অবনীন্দ্রনাথের নিখিল চিত্রকৃতি পর্যালোচনা করলে এ বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। 'ফাল্গুনী'র চিত্রপর্যায়, কাজরী-উৎসব, যাত্রাশেষ, বসন্তসেনা, শিবসদাগর, শিব-সীমন্তিনী, সমুদ্রসৈকতের সঙ্কীর্তনে শ্রীচৈতন্য, শ্বেতময়ূর, উতলা নীলকণ্ঠ ময়ূর, সাজাদপুরের প্রায় সবগুলি দৃশ্যপট— কোথাও রূপ পরিস্ফুট, কোথাও রঙ-কুয়াশায় ঈষৎ-গুণ্ঠিত— সর্বত্রই যেন অবনীন্দ্র-প্রতিভার ঐ বিশেষ স্বভাব, বিশেষ দৃষ্টি সহজেই ধরা পড়েছে। অথচ বাস্তব রূপকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখা, তার প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গটি সাক্ষাৎপরিচয়ে ভালো ভাবে জানা— সে বিষয়ে কোনো ত্রুটি বা শৈথিল্য নেই সেও আমরা জানি। বিলাতি গুরুকুলে শিক্ষাগ্রহণ মিথ্যা হয় নি। বস্তুরূপ জানা নেই ব'লেই অনুমানে বা কল্পনায় আত্মগোপন, প্রথাসিদ্ধ প্রাচীন রূপকল্পে দাগা বুলিয়ে কাজ সারা, কোনোরূপে কিছু এড়িয়ে যাওয়া বা গোঁজামিল চালানো— অবনীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে এ-সবই কল্পনাতীত।

বস্তুতঃ, বাস্তবের সুদৃঢ় এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞানের দৃঢ় ভিত্তির উপরেই চিত্রকর অবনীন্দ্রনাথের ভাব ও কল্পনার অপরূপ মায়াপুরী বিরচিত। অবাস্তব আবেগে এবং অলৌকিক মন্ত্রবলে নয়। পাশ্চাত্য বস্তুজ্ঞান তিনি সংগ্রহ করেছেন সন্দেহ নেই, প্রাচ্যের ধ্যানমগ্নতাও কিছুমাত্র বর্জন করেন নি, উভয়কেই যে ভাবে ব্যবহার করেছেন তাতেই তাঁর বিশিষ্ট প্রতিভার পূর্ণ পরিচয় এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিত্র-রীতির সংগত একটি সমন্বয় ঘটিয়ে তোলার আশ্চর্য সিদ্ধি।

শিক্ষানবিশির পালা শেষ করার পর, বস্তুরূপের সাধ্যসাধনায় আর তিনি অধিক কালক্ষেপ করেন নি সত্য, করার বিশেষ প্রয়োজনও হয় নি, তা ব'লে চোখ বন্ধ রাখেন নি একমুহূর্ত, সন্ধানী স্বচ্ছ দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে যা-কিছু চোখে দেখা যায়। তার উপরেই কাজ করেছে হৃদয় এবং মন ভাবনা ও কল্পনা -যোগে। যে অগোচর প্রক্রিয়ার বর্ণনায় বলা হয়েছে শাস্ত্রে— আদানে ক্ষিপ্রকারিতা চৈব প্রদানে চিরায়ুতা। গ্রহণ করবে নিমেষেই, প্রতিদানে যা দেবে সে হবে চিরস্থায়ী। ফলতঃ, অবনীন্দ্রনাথের আঁকা অধিকাংশ চিত্ররূপের বিশ্লেষণেই ধরা পড়ে তাঁর বস্তুরূপ সম্পর্কে আশ্চর্য দখল। ভাবব্যঞ্জনা অবশ্য বিশ্লেষণ করা যায় না, অনুভব করা যায় মাত্র। শিল্পীর সংকলিত উক্তি থেকে অনুমান করতে পারি, ধ্যানতন্ময় চিত্তে কিভাবে অনুভব করেছেন শিল্পী বিশ্বসংসার। সেই মুহূর্তে আর সেই স্থানেই নয়— কিভাবে দূরগত স্মৃতি আর তলিয়ে-যাওয়া অনুভূতি ধীরে ধীরে জেগে উঠেছে আর-এক দিন শান্ত সমাহিত চিত্তে, ছবি হয়েছে, আর তিনি যদি গীতকবি হতেন গানও হত। দেখতে পাচ্ছি অবনীন্দ্রনাথের এই কর্মকৌশলে প্রাচ্য আর পাশ্চাত্য উভয়প্রকার জ্ঞান ও অনুভূতির, উভয়বিধ প্রক্রিয়া-পদ্ধতির, সুন্দর একটি সমন্বয় হয়েছে। ছবিতেই তার সকল লক্ষণ ফুটে ওঠে নি কি? দেখা যাক্

অবনীন্দ্র-সৃষ্ট উৎকৃষ্ট চিত্ররূপে কী কী গুণ বর্তমান।—

প্রথমেই দেখি পাশ্চাত্যরীতির স্বভাবসংগত পরিপ্রেক্ষিত।

অনুকারী না হলেও, রূপের স্বাভাবিক সাদৃশ্য ও প্রমাণ।

প্রাচ্যচিত্ররীতি-সংগত রেখাও আছে, কিন্তু প্রায়শঃই তা গড়নের রেখা,[৮] বাস্তব-ঘেঁষা মোগল-চিত্রে যার যথেষ্ট ব্যবহার দেখা যায়। আলংকারিক রেখা বা লেখাঙ্কনের রেখা নয়। এই রেখা মুছে দিলেও যেন রূপ হারিয়ে যেত না। বস্তুতঃ বিচিত্র বর্ণের দ্বন্দ্বে ও উজ্জ্বল-অনুজ্জ্বলের বিবিধ পর্দায় রূপসমুদয় ফুটে উঠেছে, চোখের দেখার সঙ্গে মিল রেখে যে ভাবে ফুটে ওঠে বনেদী পাশ্চাত্য চিত্রকলায়।

কৃষ্ণলীলা এবং বিরল কতকগুলি ছবি বাদে, সচরাচর বর্ণবিলেপনে এই বিশেষত্বই দেখা যায় যে, রঙগুলি উজ্জ্বল অমিশ্র অথবা পর পর পৃথগ্‌ভাবে বিন্যস্ত নয়। এদেশীয় লিপ্ত বা টেম্পারা ছবিতে বর্ণসংগীতি-সৃজনের যে কৌশল দেখা যায় তাতে সম্পূর্ণ তৃপ্তি পান নি ব'লেই দেশী বিদেশী নানা রীতির মিশ্রণে শিল্পী উদ্ভাবন করেছেন ধোওয়াট রঙ ধরানোর নিজস্ব পদ্ধতি,[৯] যেটিতে সুন্দরভাবে সমন্বিত হয়েছে তাঁর প্রাচ্য রুচি এবং পাশ্চাত্য চিত্রবিজ্ঞান— তারই ফলে মোলায়েম রঙের মীড়ে মূর্ছনায় এই জাতের চিত্রে রচিত হয়েছে সর্বদাই বিশেষ দেশকালের বিশেষ একটি আমেজ ও আবহাওয়া। এ দেশে এ জিনিস তো একেবারেই নূতন। অভিজাত পাশ্চাত্য রীতির সঙ্গেই এর মিল খুঁজে পাওয়া যাবে।

আমাদের জানা ছিল, প্রাচ্য চিত্রের বাহ্যতঃস্থির প্রসন্ন রূপকল্পনায় রেখাই সৃজন করে ছন্দ এবং সঞ্চার করে গতি। সচরাচর নন্দলালের চিত্রকৃতিতেও তা দেখা যায়; সেইখানেই তাঁর প্রাণবান্ নৈপুণ্য ও বিশেষ শক্তি। এ রেখা দেখা যায় না গুরু অবনীন্দ্রনাথের রচনায়, সে কথা আমরা পূর্বেই বলেছি। রেখানির্ভর বেগ ও ব্যঞ্জনার দায়িত্ব নিয়েছে এখানে রহস্যস্মিতমুখী বর্ণমায়া। অবর্ণনীয়ের আভাস বা আভা ফুটে উঠবে বর্ণে বর্ণে সে তো আশ্চর্য নয়। কেননা, আনন্দবিষাদ রাগদ্বেষের দুই-কূল-ছোঁওয়া মনের সকল ভাব অনুভূতি আলো-অন্ধকারের অসংখ্য পর্দার সমতানে বাঁধা; নিঃসাড় অচেতনায় চেতনার জাগরণ আর অন্ধকারে আলোকের ক্রমিক ফুটে ওঠা, একটি আর-একটির তুলনা শুধু নয়, একই, ভিতরে

[৮] শ্রীনন্দলাল বসুর 'শিল্পচর্চা' গ্রন্থে দ্রষ্টব্য প্রবন্ধ : রেখা।

[৯] দ্রষ্টব্য শিল্পচর্চা গ্রন্থে : 'ওয়াশ' বা ধোওয়াট রঙের ছবি। অবনীন্দ্রনাথ ওয়াশের বিশেষ একটি ধরণে লিপ্ত ছবিরও ভাব ফুটিয়ে তুলেছেন কয়েকবার— প্রথম দিকে 'ওমার খৈয়াম' কাব্যের ছবিগুলিতে, আর বিশেষভাবে শেষ দিকের 'আরব্য উপাখ্যান' চিত্রপর্যায়ে।

আর বাইরে। তাই, যে ভাব ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না আলো-আঁধারের মীড়ে মূর্ছনায় স্বতঃই আভাসিত, প্রতিবিম্বিত। আলোক বিশ্লিষ্ট হয়েই অনন্ত বর্ণালি ; মূলতঃ আলোকের যে শক্তি, যে গুণ, বর্ণেরও তাই। অনুভবী শিল্পীর তুলিকাপাতে একতান বর্ণের সমাবেশে তাই চিত্রের অপূর্ব ব্যঞ্জনা। কিন্তু, বেগ বা গতি ? বলা ভালো, বেগ এ ক্ষেত্রে রূপে তেমন সঞ্চারিত হচ্ছে না যেমন রূপরসিকের চিত্তে। আনন্দে চঞ্চল হয়ে উঠেছে বর্ণমায়ামুগ্ধ দ্রষ্টা। শিল্পী অবনীন্দ্রনাথকে রঙের জাদুকর বললে কিছুমাত্র বেশি বলা হয় না। সেই রসনিষিক্ত রঞ্জনকে, নিঃশব্দ পটে, নেত্রপ্রীতিকর এবং মর্মস্পর্শী নানা বর্ণের আশ্চর্য তানালাপ বললেও চলে।

অবনীন্দ্রনাথ তাঁর দীর্ঘ জীবনে কখনো বা অলংকরণ-ঘেঁষা প্রাচীন রীতিতে ছবি আঁকেন নি তা নয়, যখন রেখা ফুটে উঠেছে আর গড়ন লীন হয়ে গিয়েছে, বর্ণ-সমাবেশ হয়েছে অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল এবং পরিচ্ছিন্ন। কিন্তু যখন দেশকালের বিশেষ আবহাওয়ার মণ্ডলে, গড়ন নিয়ে, আপন চরিত্র নিয়ে, ফুটে উঠেছে বিশেষ একটি বস্তুরূপ, সেই সঙ্গে স্পর্শগম্য (আসলে চোখে দেখার অনুমান -গম্য) ত্বকের বিশেষত্বটিও ফুটে উঠেছে তার— টেক্‌শ্‌চার ব'লে যার অশেষ সমাদর য়ুরোপীয় চিত্রকলায়, আর মোগল-চিত্রেও যার তেমন অসদ্ভাব নেই। মনুষ্যত্বকের স্পর্শ স্বাদ শিহরণ যদি চোখে দেখেও অনুভবের বিষয় হয়, টেক্‌শ্‌চার নামে নির্দিষ্ট হয়, তবে অজন্তাগুহার কোনো কোনো ছবিতেও এর দর্শন পেয়েছি মনে পড়ে। রাজস্থানী এবং কাংড়া কলমের ছবিতে, পটে এবং পাটায়, এর কোনো সম্ভাবনা মাত্র নেই।

পশ্চিমদেশীয় শিল্পীদের মতো অবনীন্দ্রনাথ যেমন আগ্রহশীল ও কুশলী ছিলেন বিশেষ দেশকাল এবং আবহাওয়া -সৃজনে, বিশেষ চরিত্র-চিত্রণেও তাঁর কর্মকৌশল ছিল অতুলনীয়। যুগে যুগে তাবৎ ভারতশিল্পীরা, মূর্তিকার এবং চিত্রকার, প্রধানতঃ বিচিত্র টাইপ সৃষ্টি করেই সন্তুষ্ট ছিলেন ; যুগের প্রেরণায় অবনীন্দ্রনাথ এসে প্রথম রচনা করলেন সার্থক প্রতিকৃতি। তাতে ভারতশিল্পের জাতিপাত হল না, অথচ য়ুরোপীয় শিল্পের অভিনব গুণাবলি আয়ত্ত এবং অঙ্গীকৃত হল। ফলতঃ, অবনীন্দ্রনাথের অনেক ছবিতে অনেক মনুষ্যমুখই জানা-চেনা নরনারীর মুখাকৃতি বৈ নয়— রোমের প্রতিদ্বন্দ্বী[১০] যীশুখৃস্টও শুনেছি ছিন্ন মলিন বসনে ফিরতেন কর্পোরেশন স্ট্রীট অঞ্চলে দৃপ্ত ধীর পদক্ষেপে ; 'কথকঠাকুর' তো উৎকলদেশীয় ভাস্কর প্রৌঢ় গিরিধারী ; আর উমা অথবা বসন্তসেনা, নুরজহান কিম্বা জেবুন্নিষা,

[১০] ছবিখানির ইংরেজিতে নামকরণ হয়েছিল : Rival of Rome.

অবশ্য, মাইকেল এঞ্জেলো 'রোজ কিয়ামৎ'এর ছবিতে খৃস্টের যে রূপ এঁকেছেন, কেন জানি নে, সেটিও আমাদের মনে পড়ে।

এঁরা ছিলেন না শিল্পীর কন্যা ভগিনী অথবা বিশেষ কোনো কুটুম্বিনী এ কথাও নিঃসন্দেহে বলা চলে না। কিট্রলেখনী -যোগে এবং জল-রঙের, কদাচিৎ তেল-রঙেরও তুলিতে, অপূর্ব প্রতিকৃতি এঁকেছেন শিল্পী অনেকগুলি। প্রতিকৃতি ব'লে ঘোষণা নেই যে-সকল স্থলে, সেখানেও বহু বালবৃদ্ধ নরনারীর মুখাবয়বে নাম-মুছে-ফেলা প্রতিকৃতির অভাব নেই। সহস্রাধিক আরব্যরজনীর আখ্যান -কথনেও গগন অবন সমরেন্দ্র তিন ভাই ধরা দিয়েছেন কে না জানে— শিল্পীর বড়ো স্নেহের 'বাদশা' বা 'টোটো'কেও খুঁজে পাওয়া যাবে না কি ? মুখ ফিরিয়ে চলা বিশেষ থেকে অবিশেষের দিকে, ব্যক্তি থেকে 'জাতি'র দিকে, স্থূল থেকে সূক্ষ্মে— ভারতীয় মনোবৃত্তির ও ভারতের রূপরীতির এই হল সহজ প্রবণতা। এত দিনে তার একটি সার্থক ও সুন্দর ব্যতিক্রম দেখা গেল। এটিও যুগোপযোগী বিশেষ ঘটনাই বলতে হবে ?

শিল্পী খেয়ালে-খুশির বশে মুখ থেকে মুখোষের কল্পনা করেছিলেন অনেক-গুলি— অবনীন্দ্রনাথ যে কত বড়ো প্রতিকৃতি-চিত্রকর ঐ মুখোষগুলিও তার অভ্রান্ত প্রমাণ। আসলকে খুব ভালোভাবে না জানলে তার এমন আশ্চর্য 'নকল' করা যায় না, অতিকৃতি ঊনকৃতি অথবা বিকৃতি সম্ভবপর হয় না।

জরায় এবং শোকে জড়োসড়ো বুড়ি, কদমকেশরের মতো এক-মাথা চুল, উদ্দেশ-হারানো চোখ দুটি যেন চোখের জলের সায়রে ভাসছে, হারা নাতির খেলনা ক'টি সামনে করে বসে আছে— এই ছবির অতিসাধারণ প্রতিচিত্র দেখেই একজন প্রবীণ জাপানি আর্টিস্ট্ বলেছিলেন, 'নাম শুনি নি বটে। মনে হয়, ইনিই এশিয়া মহাদেশের শ্রেষ্ঠ প্রতিকৃতিশিল্পী।'[১১]

প্রতিকৃতিরচনার বিশেষ প্রতিভা হল প্রতীচ্য জাতির।

হয়তো মিথ্যা নয়, 'কৃষ্ণলীলা'র ছবিগুলি এঁকে শিল্পী পরিহার করলেন প্রাচ্যদেশীয় টিশিয়ান হওয়ার সযত্নপোষিত আশা।[১২] তবু আশ্চর্য এই যে, স্বাধীনভাবে পুষ্ট ও পরিণত হওয়ার পর, অবনীন্দ্র-প্রতিভার সুন্দর সৃষ্টিতে কখনো কখনো টিশিয়ানের কথাও মনে পড়ে। অর্থাৎ, সূক্ষ্মধূপছায়াময় গড়ন, রঙের মীড় ও মূর্ছনা, স্থানকালের ঘনীভূত আবহাওয়া, বস্তুগাত্রের কোমল-কঠিন রুক্ষ-মসৃণ নানারূপ স্পর্শ— এই গুণগুলির পরিস্ফুটনে সকল প্রকারেই নিগূঢ় মিল আছে উভয়ের মধ্যে। পার্থক্য আছে সন্দেহ নেই। মিডিয়াম বা উপকরণের পার্থক্য-হেতুও একটির থেকে আর-একটি বিশেষ হয়েছে।

১১ শিল্পী শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের কাছে শোনা গল্প, তাঁরই অভিজ্ঞতার বিবরণ।

১২ বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লির অবনীন্দ্রসংখ্যায়, শ্রীমুকুল দে'র প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

পূর্ব পশ্চিমের মধ্যে দেওয়া নেওয়ার সকল প্রসঙ্গের পরে অবনীন্দ্র-সৃষ্টির এই গুণটিও স্মরণ করতে চাই যে, সেই রূপ স্বভাবতঃই সহজ, আর সহজ ব'লেই সুন্দর। প্রত্যেক সহজ সুন্দর সম্পূর্ণতার পিছনে রয়েছে কত তপস্যা না জানি, কিন্তু তার ভাবে ভঙ্গীতে ও প্রসাধনে আয়াসের বা ক্লিষ্টতার চিহ্নমাত্র নেই, মনে হয় না আর্টিস্ট্ এ ছবি চেষ্টা করে এঁকেছেন— মনে হয়, ও যেন আপনি ফুটে উঠেছে কাগজে, কাপড়ে। একটি পাখির ওড়ার ব্যাপারে জটিল কত কল-কব্জার কত বিধিবিহিত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া থাকে; অথচ সে-সব কিছুই চোখে পড়ে না, মনেও ওঠে না, আকাশে বাতাসে অপূর্ব ছন্দে ঢেউ খেলিয়ে যায় শুধু সহজ সুষমা —এই দৃষ্টান্তে অবনীন্দ্রনাথ নিজে বুঝিয়েছেন উৎকৃষ্ট শিল্প-সৃষ্টির সহজতা, স্বাভাবিকতা। অবনীন্দ্রনাথের নিজের রূপসৃষ্টি সম্পর্কেও এ কথা সত্য। পরিপূর্ণ কলসের মতো যে মন, এতটুকু নাড়া পেলেই তার অক্ষয় রসানুভূতি ও রূপপ্রীতি ছল্‌কে পড়ে হয় — নৃত্য, গীত, কবিতা, মূর্তি, ছবি।[১৩]

অবনীন্দ্রনাথের চিত্রে সূক্ষ্মতা ও অলক্ষচারিতা যেমন আঙ্গিকে বা করণকৌশলে, তেমনি ভাবব্যক্তিতে বা রসের দিকে। ভাবব্যক্তির এই সূক্ষ্মতা, চারুতা, এই ব্যঞ্জনা— একেই বলা হয় তাঁর চিত্রের নিহিত কবিত্ব। নিঃশব্দে চোরের মতো রসিকের হৃদয়ে প্রবেশ করে, পরে কখন দেখা যায় মহিমান্বিত সম্রাটের মতো সিংহাসনে বসে আছে, অথবা অনুভব হয় শিশিরস্নিগ্ধ পেলব সুগন্ধি মালাগাছির মতো বুকে দুলছে।

মোটের উপর বলা চলে, এইগুলি অবনীন্দ্র-চিত্রকলার সর্বসামান্য গুণাবলি। যেখানে যতটা ব্যতিক্রম দেখি তাতেও তার সাধারণ চরিত্র চাপা পড়ে না।[১৪]

কখনো বা ভাসা-ভাসা জ্ঞানে কেউ বলেছেন, সাহিত্যের প্রভাবে তাঁর শিল্পের সৃষ্টি হয়েছে। অর্থাৎ, অন্যের-হাত-ফের্তা (সেকেণ্ড্-হ্যাণ্ড্) জগৎসংসার নিয়েই শিল্পী বুঝি কাজ করেছেন।[১৫] চিত্রাঙ্গদা স্বপ্নপ্রয়াণ এবং বিম্ববতীর চিত্র-রচনাকালে

১৩ শিল্পকথায় শ্রীনন্দলাল বসুর উক্তি।

১৪ একটি দৃষ্টান্ত দিলেই হবে। 'বঙ্গমাতা' (পরে নাম দেওয়া হয় 'ভারতমাতা') এরূপ একটি ব্যতিক্রম। এই ছবিতে গড়ন বিশেষ প্রাধান্য পায় নি, প্রত্যেকটি বর্ণ সমুজ্জ্বল স্বাতন্ত্র্যে ফুটে উঠেছে। রেখারও যথেষ্ট প্রাধান্য আছে। অথচ কাপড়ে, কেশে, পদতললীন ভূমণ্ডলে, দূরত্বসূচক পশ্চাৎপটে বা আকাশে, অবনীন্দ্র-চিত্রের অন্যান্য গুণেরও অনেক আভাস ইশারা দেখা যায় না এমন নয়।

১৫ ব্যাপার বরং তার বিপরীত। এ সম্পর্কে পূজনীয় শ্রীনন্দলাল বসু একটি গল্প বললেন। তাঁরা বাগগুহার ছবি নকল করতে গিয়েছেন। গুরু অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁদের মধ্যে

জতুগৃহদাহ

শ্রী নন্দলাল বসু
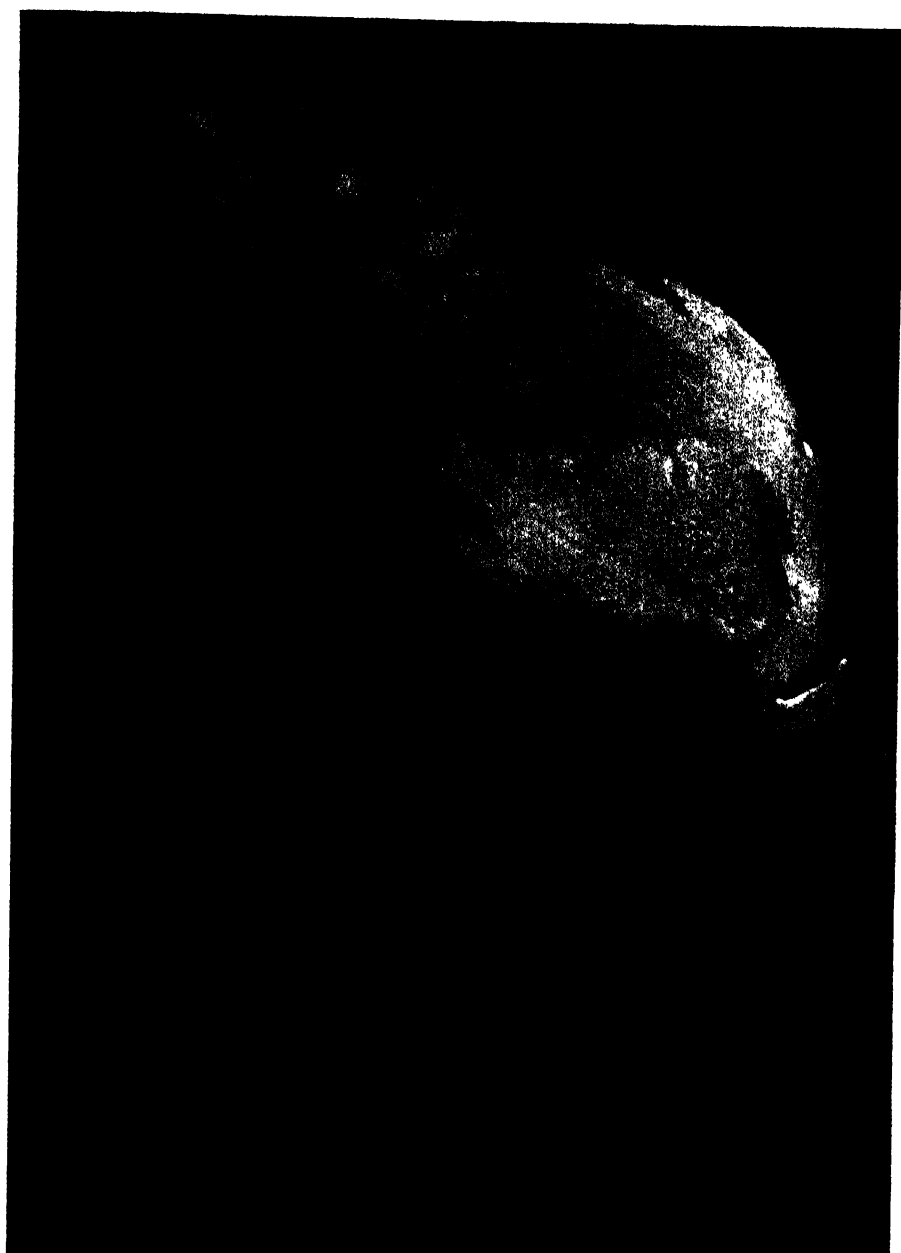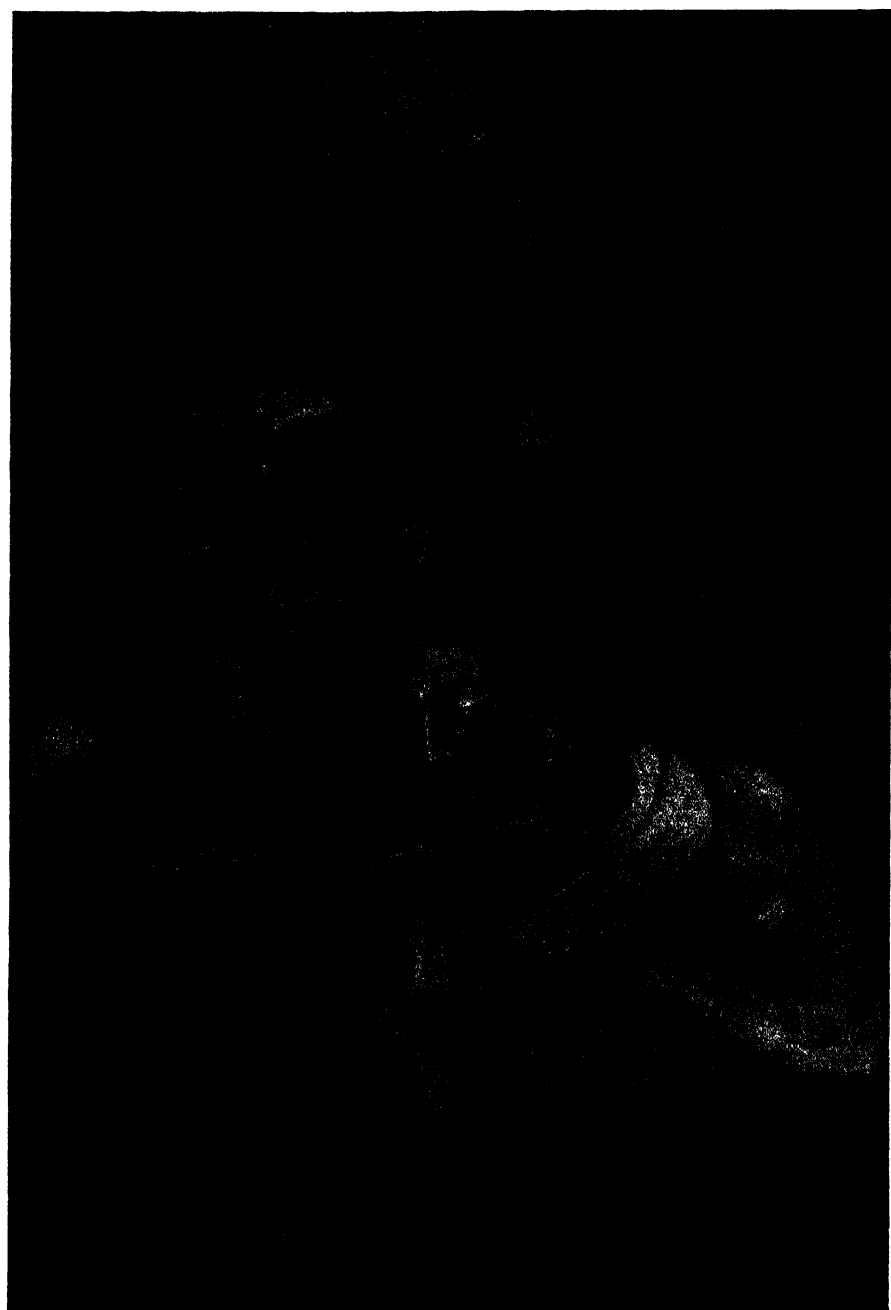
শিক্ষানবিশ পথসন্ধানী শিল্পী সেই অবস্থায় ছিলেন বৈকি। পরে আর নয়। প্রতিভাবান্ শিল্পীর খেলাচ্ছলে যদি কোনো ব্যতিক্রম হয়ে থাকে কখনো, সে হল স্বতন্ত্র কথা।

যুক্তিশাস্ত্রে শুনতে পাই কার্যকারণের নানারূপ সম্বন্ধবিচার আছে। 'কলের গান' শুনব ব'লে আওয়াজবন্দী ঘূর্ণ্যমান চাকৃতিতে পিন ছোঁওয়ানো হল, মনোজ্ঞ সুরে তালে লয়ে যে সঙ্গীত জেগে উঠল গ্রামোফোন পিন তার স্রষ্টা নয়। তুব্ড়ির মুখে জ্বলন্ত দেশলাই-কাঠি ঠেকাতেই তড়্বড়িয়ে অজস্র আগুনের ফুল-কাটা ফোয়ারা উঠে পড়ল আকাশে, সেও বুঝি আর-একরকম হেতু-পরিণাম। নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় ও প্রমাণে হাইড্রোজেন অক্সিজেন মিলিয়ে জলবিন্দুর সৃজন হল, সে ক্ষেত্রেও বায়বে আর জলে গুণ এবং কর্ম-গত তেমন কোনো মিল রইল না। কেনা কাপড় কেটে জামা তৈরি, পুরোনো বুটজুতো ছেঁটে চলনসই চটিজুতো— সেখানেই একের কাছে অন্যের ঋণ, ঐ যাকে সাহেবী বাংলায় বলে, অনস্বীকার্য। রবীন্দ্রনাথ পুরোনো কর্ণাটি বা হিন্দী গানের অনুরণনে গান বেঁধেছেন জানি, সর্বদাই তাতে রবীন্দ্র-প্রতিভার তুলনাতীত বিশিষ্টতার ছাপ আছে। অনেক সময় সূচনামাত্র পূর্ববর্তী গানের প্রভাবে, নইলে শেষ পর্যন্ত কোনো সাদৃশ্যই খুঁজে পাওয়া যাবে না। অবনীন্দ্রনাথের সাহিত্য 'ভেঙে' ছবি রচনাও[১৬] ঐ প্রকারই, অথবা ওর চেয়ে বিচিত্র। প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নূতন সৃষ্টি। তার প্রক্রিয়া শিল্পীর নিজের কাছেই রহস্যময়— রসিকের চোখে না হবে কেন? সেই স্বতঃসৃষ্টির সীমান্তে আছে ঐ সোনালি-রূপালি সন্ধ্যার পাখিটি যে হল বিজয়ার দিনে মায়ের কৈলাসে ফিরে যাওয়ার রূপ। মৌলিক প্রতিভার ক্ষেত্রে দেখতে পাই অজ্ঞেয় আশ্চর্য প্রক্রিয়ায় কেবলই এক সৃষ্টির জিনিস অন্য সৃষ্টিতে উত্তীর্ণ হয়ে চলেছে— একেই বলতে পারি **রূপান্তর**। কদাচিৎ এ কথা বলবারও কারণ ঘটতে পারে: বিশ্বপ্রকৃতি যার পরিণাম, কবিতা মূর্তি চিত্রও তারই পরিণাম, তারই রূপ।

সপ্তাহে কয়েকবার চিঠি-চলাচল হচ্ছে। একবার উল্লসিত হয়ে শিষ্য লিখলেন: রোজই নতুন নতুন রূপ ও কল্পনার আবিষ্কারে বিস্মিত হচ্ছি। তৎক্ষণাৎ গুরুর কাছ থেকে জবাব এল এই মর্মে: সুখের কথা! তোমার পিছনে যিনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন তাঁকেও দেখতে ভুলো না। পূজনীয় নন্দলাল বলেন: আমার চেতনা হল। জীবধাত্রী প্রকৃতির অনন্তরূপের কিছুটা পূর্বশিল্পীরা অঙ্কিত করেছেন, আমরাও কিছু করব। এই বিশ্বরূপ না দেখলে, কিছু দেখাই হল না।

১৬ রবীন্দ্রনাথ সর্বদাই 'গান ভেঙে' গান রচনা করেন নি। আর, অবনীন্দ্রনাথ সর্বদাই যে 'সাহিত্য ভেঙে' ছবি করেছেন তাও নয়।

কখন কী এসে কবি বা শিল্পীর প্রতিভাকে সচেতন সক্রিয় করে তুলল কিছুই বলা চলে না। উদ্রেককারী বস্তুই যে কার্যভূত পরিণাম, অবনীন্দ্রনাথের ছবির বিচারে অন্তত সে কথা প্রায়ই সত্য নয়।

চোখের দেখা আর চিত্তের নিবিষ্ট উপলব্ধির স্থান নিতে পারে না মুখের কথা বা মুদ্রিত বাক্যাবলি। এ কথাও বলা হয়েছে, অবনীন্দ্রনাথের মূল চিত্র না দেখে অবনীন্দ্র-প্রতিভার ধারণা হতে পারে না। সে যাই হোক, আর-একটি বিষয়ের উল্লেখেই আমাদের এই আংশিক অপটু আলোচনা এবং অসাধ্যসাধনের চেষ্টা শেষ করা যাবে।

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।

তরুণ বয়সে এ কথা যখন উচ্চারণ করেছিলেন কবি, তিনি নিজেও জানতেন না, নূতন যুগের কী মহতী বাণী এই অতিপ্রাচীন ভারতভূমিতে আদরে বরণ করে আনলেন। এ বাণী পাশ্চাত্যের। এ বাণীর সংগতি ও সংস্থিতি আছে ঔপনিষদিক বাণীতে, ঋষি যখন বলছেন : জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ। যে স্বর শাঙ্করভাষ্যে অশ্রুত ছিল বহুশতাব্দকাল। অবশ্য, অবনীন্দ্রনাথের মন নয় শ্রুতি-স্মৃতির-আঁচল-ধরা। স্বভাবের শিশু অনায়াসে অন্তরে পেয়েছেন সংসার সম্পর্কে, বিশ্বপ্রকৃতি সম্পর্কে, সহজ সচ্ছন্দ অনুরাগ। যেখানে তিনি আর্টিস্ট্, যেখানে কবি, সেখানে ঐটিই হয়ে উঠেছে অনাসক্ত অনুরাগ।

অবনীন্দ্রনাথের চিত্রসৃষ্টিতে তাই স্বভাবের স্থান, মানুষের স্থান, সব থেকে বেশি। তিনি জানতেন, আমরাও জানি, হিন্দু দেবদেবী, বুদ্ধ বা শিব, তেমন করে তাঁর মন ভোলাতে পারেন নি বা তূলিতে ধরা দেন নি। গঙ্গাবতরণের দৃশ্যে দেবদেবী, আনন্দে আত্মহারা শিব ও গণপতি, সকলেই আছেন সত্য— তাঁরা কিন্তু মানুষেরই রূপ। তুলনারহিত রূপে ও লাবণ্যে উদ্ভাসিত 'শিবসীমন্তিনী'ও শেষ স্পর্শটুকু মুছে ফেলেন নি মানবতার, তাই এত সুন্দর— চন্দ্রের শেষ কলাটি আছে যেমন ধ্যাননিমগ্ন শিবের জটাজালে, সে আর কিছুতেই পূরণ হয় না। রাজস্থানী অথবা কাংড়া কলমেও দেখা যায় ঐ একই ব্যাপার। শান্ত অন্তঃসমাহিত দেবদেবীর মূর্তি আছে এ দেশের ধাতুতে, প্রস্তরে, কখনো বা মৃণ্ময়ী প্রতিমায়। অজন্তা-ভিত্তিচিত্রেও মানব বুদ্ধ বিরাজমান অতিমানব মহিমায়। ভারতশিল্পের এই সুস্থির ঐতিহ্যকেই এ কালে ধারণ করেছেন এবং নানাভাবে রূপান্তরিত করেছেন অবনীন্দ্র-শিষ্য নন্দলাল। অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলাল আপন আপন প্রকৃতি

ও প্রতিভার বশে বিভিন্ন পথে এগিয়ে গিয়ে পরস্পরের পরিপূরক হয়েছেন এবং এ কালের শিল্পসংস্কৃতিকে অপরূপ-ঐশ্বর্য-শালী করেছেন— সে হল স্বতন্ত্র আলোচনার বিষয়।

পূর্বপ্রসঙ্গে ফিরে যাই। অবনীন্দ্র-সৃষ্টিতে মানুষেরই প্রাধান্য, তাই অতীতে ও বর্তমানে, কল্পনায় ও প্রত্যক্ষে সচ্ছন্দ মেশামিশি। সহস্র রজনীর আরব্য উপাখ্যান, আজগুবি কথা, সেও অঘটন-ঘটানো কৌতুকী প্রতিভার হাতে পড়ে হল একান্তই মানবীয় রূপ-কথা। ব্যাপার এমনি যে, তাড়াতাড়ি গাছে চড়তে গিয়ে যে ছেলেটার পাজামার পিছন ছিঁড়েছে তূলি তাকে অচ্ছুৎ বলল না, তা ছাড়া আল্‌গোছে সম্ভব-অসম্ভবের বেড়া ডিঙিয়ে ঢুকে পড়ল কোলকাতা শহরের সাহেবী হোটেল, হিঙ্ক্‌সের লণ্ঠন আর কার-ঠাকুর-কোং— কেউ বারণ করল না, কোথাও ছন্দোভঙ্গ হল না।

যেমন মধুসূদন বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে তেমনি অবনীন্দ্রনাথের চিত্রে (নন্দলালের শেষের দিকের বহু ছবিতে ও অজস্র স্কেচে) এই মানুষের রূপ, মানবিক স্পর্শ, মানবতার আস্বাদ— এটি হল এ যুগেরই জিনিস, এবং অভিনব। মোগল-চিত্রের প্রাণমূলেও এই প্রেরণাই ছিল। কিন্তু দেখা গেল, অন্তত অবসাদমুখী সমাজে ও সভ্যতায়, রাজা-বাদশার আদেশে বা আব্‌দারে, বাহিরের থেকে আনুকূল্য যতই হোক, ভিতরের দিকে নিগড়ে বাঁধে। সাম্‌না-সাম্‌নি অথবা মনে মনে মনিবকে সেলাম ঠুকতে ঠুকতে আর্ট্‌ হয় না, কবিতা হয় না— অন্তরে রসের উৎস শুকিয়ে যায় দুদিনে। এও দেখা গেছে, বহির্জগতের অনুকরণে অথবা অন্য জাতির রূপকৃতির অনুকরণ করেও আর্ট্‌ হয় না। কাজেই যুগের অভিপ্রায়কে সংসিদ্ধ করতে, জাতির শিল্পসংস্কৃতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সার্থক মিলন ঘটাতেও বটে, সেই প্রতিভাধর মানুষেরই পথ চেয়ে এসেছিল ইতিহাস যিনি হবেন একাধারে বাদশা এবং ফকির। সেই মানুষ অবনীন্দ্রনাথ। কখনো কখনো তাঁকে মোগল-রীতির শেষ শক্তিমান চিত্রকরও বলা হয়েছে। বর্তমান লেখকের জ্ঞান ও বুদ্ধি অত্যন্ত সীমাবদ্ধ, তবু না বলে উপায় নেই— শেষ নয়, অবনীন্দ্রনাথেই নূতন সূচনা। তার আশ্চর্য সম্ভাবনা দূর সুদূর শতাব্দকে অতিক্রম করে যাবে। কোলের কাছের সময়টুকুতে যদিবা বিভ্রান্তির ঝড় ওঠে অথবা রূপ-রঙ-মুছে-ফেলা নিবিড় কুয়াশা ঘনায়, তবু স্থায়ী হবে না কিছুই, আকাশ পরিষ্কার হয়ে যাবে যথাকালে— এই বিশ্বাসই থাক্‌।

চীনা-জাপানীদের ধারণা এই যে, পাঁচ শত বৎসরে একটি প্রতিভার বিকাশ হওয়াই যথেষ্ট। এ কথায় হয়তো অত্যুক্তি রয়েছে, হয়তো এক প্রতিভার ধারা অন্য শত জন শত দিকে প্রবাহিত করে দিত ওঁদের দেশে আর ওঁদের কালে— সে

সম্ভাবনা আজ নেই। তবু, এদেশীয় চিত্রকলার ক্ষেত্রে-যে যুগপৎ দুটি বিস্ময়কর প্রতিভার বিকাশ হয়েছে এই বিংশ শতকে, এতেও কি আশার কথা নেই? এমন অহেতু পরাজয়েচ্ছু চিত্তদৌর্বল্যকে কোনোক্রমেই প্রশ্রয় দেওয়া চলে না।

শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আর কিছু বলতে চাই নে। সাহিত্যিক অবনীন্দ্রনাথ সম্পর্কেও অন্যে আলোচনা করুন্। ব্যক্তি অবনীন্দ্রনাথের বিশেষ পরিচয় সম্পর্কেও একটু ছুঁয়ে গেছি মাত্র। অধিক আলোচনা করি তার শক্তি বা সুযোগ কোথায়? অথচ শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ একটি অনন্য স্টাইলের স্রষ্টা— আর, স্টাইল বলতেই সেই জিনিস যা স্রষ্টার ব্যক্তিসত্তার দ্বারা ওতপ্রোত। অবনীন্দ্রনাথ স্বভাবতঃই শিশু, নট এবং কবি; তেমনি আর-একটি পরিচয় তাঁর এই যে, নিজের সৃষ্টিকে তিনি প্রতি পদেই অতিক্রম করতে চেয়েছেন। তাই এত বৈচিত্র্য যা রূপরসিকমাত্রেরই চোখে ধরা পড়বে, তাই এক দৈবী অতৃপ্তি যা তিনি আলাপে ও বাগেশ্বরী বক্তৃতায় বার বার ব্যক্ত করেছেন। সেই চিরসন্ধানের চির-অসন্তোষ স্মরণ ক'রেই আধুনিক কোনো কবি তাঁর মুখ দিয়ে বলিয়েছেন—

প্রাণের বাহিরে এই অনিন্দ্য আলোকে
মূর্তিমন্ত করিলাম যত প্রাণনিধি,
[আবেগগদগদ হায় হৃদি]
বাগর্থমণ্ডিত করি গীতিমূর্ছনায়
স্বপ্ন সাধ অনুরাগ যত কেন সাধিলাম হায়,
রয়ে গেল চিরন্তন রূপের আকৃতি—
মর্মে মর্মরিত চির বোবা-অনুভূতি—
প্রাণ ভরে নিয়ে যাব এই।

অথবা—

যে ভাষা দিয়েছি, আজও, কিছু হয় নাই।
কী রূপ রচিনু, ছাই,
প্রাণ-অনুরাগে।[১৭]

এই চির-অসন্তোষ (গোপন ক'রে লাভ কী) এটিও চিরচলিষ্ণু, প্রাণবান, বেগবান পাশ্চাত্য সভ্যতারই বিশেষ লক্ষণ। কবিশ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথেও দেখা যায়।

[১৭] 'উৰসী' কাব্যগ্রন্থে: শিল্পীর সন্ধ্যা।

বেদে 'চরৈবেতি' 'চরৈবেতি' মন্ত্র-আহ্বান ধ্বনিত হয়েছে সত্য ; অর্থ একই, সুরের একটু পার্থক্য তবু কানে লাগে। জানি না অশীতিবর্ষের দেউড়ির কাছে এসে চিরচঞ্চল প্রাণের চিরন্তন আবেগ শান্ত হয়েছিল কিনা।

শিল্পী নিজের পরিণত প্রতিভার নানা গুণ একত্র সংহত করে আরব্য উপাখ্যানের ছবি এঁকেছিলেন জানি। তার পর চণ্ডীমঙ্গল এবং কৃষ্ণমঙ্গল আলেখ্যমালা— আরও কিছু কিছু ছবি যা অল্প লোকেই দেখেছেন। এগুলি সবই খেলাচ্ছলে আঁকা। অথবা এ-সব ক্ষেত্রে 'ছবি আঁকা' না ব'লে 'ছবি লেখা' বলাই হয়তো ঠিক। বেজেছে সরল বাঁশির সুর, শততার যন্ত্রে সমৃদ্ধ রাগ-রাগিণীর আলাপন নয়। কিন্তু, সারা জীবনের সাধনা ও সিদ্ধি আছে পিছনে, তাই সহজেই সুন্দর হয়েছে এবং এতটুকু ইঙ্গিতেও অনেক কথাই বলা চলেছে।

চিত্ররচনার পালা শেষ ক'রে, ফেলা-ছড়া কাঠ-কুটো ন্যাকড়া-চট নুড়ি-পেরেক খুঁজে-পেতে একমনে কাটুম-কুটুম বানিয়ে একা-একা খেলায় মেতেছিলেন শিল্পী শেষ বয়সে। (আসলে, রসোত্তীর্ণ শিল্প মাত্রই একার সঙ্গে একাকীর খেলা, পরে প্রসাদ পায় অথবা ভোগ করে অন্য দশজন।) আরাম-কেদারাটিতে ব'সে, রঙতুলি-যোগে ও একাগ্র মনোযোগে বিশ্বভুবন নিয়ে দেখা-দেখা খেলা দূরে থাক্, বরানগরের বাগানে ঘুরে ফিরে একটু দেখবেন, এটা-ওটা কুড়ুবেন, অবশেষে সে ক্ষমতাও ছিল না। সেইটেই বড়ো দুঃখ দিয়েছিল চিরশিশুর প্রাণে, এ কথা মনে পড়ে।

মনে পড়ে, রবীন্দ্রনাথের দেহত্যাগের পরে, আচার্যরূপে অবনীন্দ্রনাথ এসে-ছিলেন শান্তিনিকেতন-আশ্রমে। ভিড় জমে যেত তাঁকে নিয়ে আম্রকুঞ্জে, ঘণ্টাতলায়, উত্তরায়ণে আর কলাভবনের প্রাঙ্গণে ও ঘরে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ'রে ঝরে চলেছে অশ্রান্ত রসনির্ঝর। কত তত্ত্ব, কত কবিত্ব, কত কাহিনী। অনেক কথার মধ্যে আভাসে মনে রয়েছে শিল্পী বলেছিলেন, তাঁর স্নেহময়ী জননীর তিন-মহলা বাড়ি। বার-বাড়িতে কেবল দাস-দাসী লোক-লস্কর গাড়ি-জুড়ি লেন-দেন কাজ-কর্ম হিসাব-বেহিসাব তাড়াহুড়া নিয়ে রাতদিন হৈহৈ রৈরৈ কাণ্ড কারখানা। তলে তলে শৃঙ্খলা অবশ্য আছে। আর্টের যা-কিছু উপায়-উপকরণ রীতি-পদ্ধতি নিয়ে ঝাড়াই-বাছাই চলছে অবিরত। জীবন-ভোর এখানকারই চাকরি বা কুলিগিরি ক'রে কেউ কেউ কাল কাটালো। এর পরে হল বৈঠকখানা। সেখানে সাজানো-গোছানো রাজৈশ্বর্য, রাজ-মছলন্দ, ঝাড়-লণ্ঠনে নানা রঙের আলোর ঝল্‌মলানি, জ্ঞানী গুণী রসিক ও শৌখিন সজ্জনের আনাগোনা, নাচ-গান, আনন্দ-উৎসব — কারও ইচ্ছা হয় না 'এখান থেকে উঠি', কারও মনে হয় না এ-সব ছেড়ে আরও কিছু চাওয়া যায় বা পাওয়া যাবে। ভিতর-মহল একটি কিন্তু আছে, মায়ের

অন্দর-মহল। সেখানে লোক-দেখানো ঐশ্বর্য কিছু নেই, ভিড় নেই। গড়ের বাদ্য তো নেই-ই, পিয়ানোর টুংটাং পর্যন্ত শোনা যায় না— অলক্ষ্য পাখির কাকলি শুধু, ঝিল্লির অতি মিহিন সুর। মুঠো মুঠো আলোর ফুল ছড়িয়ে কে যে কৌতুক করে সন্ধ্যারাত্রে, তাই জ্বলে নেভে জোনাকির পাঁতি। মা, আর মায়ের দুলাল, শুধু দুজনের খেলার জায়গা সেই। হঠাৎ দেখি সেখানে—

হেসে হেসে চাঁদ জেগেছে,
দুলতে দুলতে বান এসেছে।
জলে কত চাঁদ ভেসেছে,
ঢেউয়ে ঢেউয়ে চাঁদ হেসেছে।
সোনার বরন সোনার চাঁদ,
আ—হা, কুড়িয়ে পেলে কে?
না,
অনেক ভাগ্য যার।···

দীর্ঘজীবনব্যাপী শিল্পসাধনার শেষে, মায়ের এই অন্দরমহলে, মা ও মাতৃ-দুলালের মিলিত এই খেলাঘরে, অবনীন্দ্রনাথ পৌঁছুতে চেয়েছিলেন জানি, হয় তো পৌঁছেও ছিলেন। সেখানে আমাদের প্রবেশ নেই।

শ্রীনিকেতন
৬ অক্টোবর ১৯৫৭

নারিকেলবনের উচ্ছ্রিত শিহরিত সবুজ পল্লবে রবিরশ্মির অস্থির ঝিকিমিকি। অন্তরসঞ্চিত রূপের স্মরণে তেমনি সুখ, তেমনি শিহরণ। মুগ্ধ চোখ তেমনি চেয়ে থাকতে চায় অনিমেষে। দেখে দেখে দেখা শেষ হয় না। সব যেন ধারণাতেও আসে না। এমনি শিল্পী নন্দলালের অজস্র রূপকৃতি। দেশ কাল উভয়তঃই এত কাছে থেকে সে সম্পর্কে কিছু বলতে যাওয়া দুঃসাহস বলা চলে। অথচ, কী দেখেছি, কী পেয়েছি আমরা, আমাদেরই তা বলতে হবে।

একটির পর আরেকটি ছবি চোখের সামনে আঁকা হতে দেখেছি। রূপপূজারির আচার আচরণ পূজাপদ্ধতি, পূজার আসনে আর পথে প্রান্তরে, সজনে নির্জনে, দিনের পর দিন লক্ষ্য করেছি। প্রাচীনেরা সত্যই বলেছেন মানবসংসারে আর মানসভুবনে যিনি কবি, যিনি শিল্পী, তিনিই প্রজাপতি। আদিকবি আদিশিল্পীর দোহার্কি'তে কবি বা সিদ্ধশিল্পীর এই-যে দৈনন্দিন সাধনা, তার নিত্যনূতন চমৎকার হয়তো চিত্তের অসাড়তা-বশতঃই ক্রমশ ম্লান হয়ে এসেছে। মুখস্থ কথার মতো যেমন বলেছি রবীন্দ্রনাথ বড়ো কবি, তেমনি ভাবেই ধরে রেখেছি— নন্দলাল বড়ো শিল্পী।

কত বড়ো শিল্পী তিনি, কী অনিঃশেষ সাধনা, কী বিপুল বিশাল বিচিত্র রূপকৃতি, তারই কথঞ্চিৎ আভাস এক মুহূর্তে এক নজরে ঝলকিত হয়ে উঠে বিস্ময়ে অভিভূত করেছিল, মনে পড়ে, হঠাৎ একদিন। বাংলা ১৩৬৩ সনের পৌষে, কলিকাতা শিল্প-মহাবিদ্যালয়ে নন্দলালের চিত্রপ্রদর্শনী। সারা জীবন ধরে যে রূপসৃষ্টি করে এসেছেন তার এক-চতুর্থাংশও হবে কিনা বলতে পারি নে। অনেক বহুখ্যাত বিস্ময়কর সৃষ্টি সংগ্রহ হয় নি। আর, প্রদর্শনভূমি যতই প্রশস্ত হোক, স্থানও ছিল না। নাই থাক্। মনে হল, এ কোথায় এলাম! শুনেছি নর ও নারায়ণ মিলে একদা খাণ্ডবদহন ঘটিয়েছিলেন। রাতের আকাশ দিনের দীপ্তি পেয়েছিল। অভ্রংলিহ অনলমণ্ডলে তাঁদের ভাস্বর রূপ ও বিদ্যুচ্চকিত সঞ্চরণ দেখে, অন্তরীক্ষপথে আবির্ভূত দেবগণ দেবর্ষিগণ বিস্মিত হয়েছিলেন। তবু, সে হল বিনাশের শত-সহস্র শিখা। এ যে চারি দিকে জ্বলছে জীবনব্যাপী সৃজনযজ্ঞের আগুন, রূপের অসংখ্য শিখা— সৌম্যাতিসৌম্য, সুস্থির, স্নিগ্ধ। মর্তমানবকেই অমরতার আশ্বাস দিচ্ছে।

রবীন্দ্রনাথ একটি রচনায় বলেছেন, বর্ষ বর্ষ ধরে ঋতুর পর ঋতুতে অরণ্যে অরণ্যে যে রৌদ্রপায়ী জীবন অজস্র ফুলে পল্লবে নিঃশব্দে বিকশিত হচ্ছে, কচি

পাতার উদ্‌গমে পাকা পাতা ঝরে যাচ্ছে, আরণ্য জীবনের সেই নিরন্তর উদ্‌গতি যদি কোনো যাদুকর এক কালে এক পলকের চকিত দ্রুতিতেই দেখিয়ে দিতেন, দেখা যেত— অকূল আকুল এক সবুজের ঝর্ণা, চূর্ণ-চূর্ণ-জ্যোতির্-বিচ্ছুরিত, বিদ্যুদ্‌গতিশীল। অনুরূপ আমাদের এই অপ্রত্যাশিত অভিজ্ঞতা।

অলক্ষ্য সৌন্দর্যলক্ষ্মীর বরে, রসরূপের আবিষ্কারে, যেমন কবি বা শিল্পী তেমনি রসিকও এক দিব্য আবেশে আত্মহারা হন— এক অলৌকিক আনন্দময় ছন্দোময় ভুবনে প্রবেশ করেন। তাই ইংরাজ কবি কীট্‌স্‌ অখ্যাত একটি কলাকৃতি লক্ষ্য করে বলেন—

Thou silent Form ! dost tease us out of thought
as doth eternity !

যে সূর্য প্রতিদিন ওঠে একদিন তারই অরুণরশ্মিপাতে তরুণ রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ের 'স্তরে স্তরে যে একটা বিষাদের আচ্ছাদন ছিল' তা নিমেষে বিদূরিত হয়ে 'একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্বসংসার সমাচ্ছন্ন' মনে হয়, 'আনন্দে এবং সৌন্দর্যে সর্বত্রই তরঙ্গিত'— রবীন্দ্র-প্রতিভানির্ঝরের যথার্থ স্বপ্নভঙ্গ হয়। আর, কামারপুকুর পল্লীর মাঠে দিগন্তজোড়া কাজল-কালো মেঘের বুকে হঠাৎ চকিত বলাকাপংক্তির প্রয়াণে বালক গদাধরের কোঁচড়ের মুড়ি ছড়িয়ে যায়, সে মূর্ছিত হয়ে পড়ে। অপূর্ব রূপের আকস্মিক উদ্ভাসে একই দিব্য উপলব্ধির বিচিত্র বিস্ময়, বিবিধ প্রেরণা।

রূপরাগের কবি নন্দলালের জীবনেও অনুরূপ ঘটনা ঘটেছিল, তারই বিবরণ পূর্বপ্রকাশিত একটি রচনা থেকে এখানে সংকলন করে দিই—

১৩২১ সালের পুণ্য বৈশাখে শ্রীনন্দলাল বসু প্রথম এসেছেন সেই আশ্রমপদে যেখানে একদিন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এসেছিলেন, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এলেন, এসেছে বহু মানবের ধারা, বহু সাধনার, আসবে কালে কালে। ··· গ্রীষ্মাবকাশের পূর্বে গুরু-শিষ্য মিলে অভিনয়-অনুষ্ঠান ছিল অচলায়তন নাটকের। কাঙ্ক্ষিত অতিথি নন্দলালকে পেয়ে অর্ঘ্য দিয়ে বরণ করলেন কবি, আশিস্‌ বর্ষণ করলেন তাঁর প্রণত শিরে। রবিকরপ্রোজ্জ্বল সকালবেলায় সেই অনুষ্ঠানটির শেষে— এখন যেখানে শিশুবিভাগ তার সম্মুখীন কালাচাঁদ বাবুর বাড়িতে নির্দিষ্ট হয়েছিল নন্দলালের বাসস্থান— শিল্পী এসে দাঁড়ালেন কুটীরদ্বারে, আশ্রমের প্রীতি-অর্ঘ্য তখনও রয়েছে তাঁর বদ্ধাঞ্জলিতে। হঠাৎ মনে হল, দেহ থেকেও তো নেই। জড়বাধা কোথায় অপসৃত হল, আলো হাওয়া চলে যাচ্ছে শরীর ভেদ করে। অননুভূত আনন্দে আপ্লুত হল চেতনা। আচার্য বলেন, আজও তার রেশ বাজছে জীবনে।[১]

[১] রূপরাগের কবি নন্দলাল : দেশ : ২০ অগ্রহায়ণ ১৩৫৯
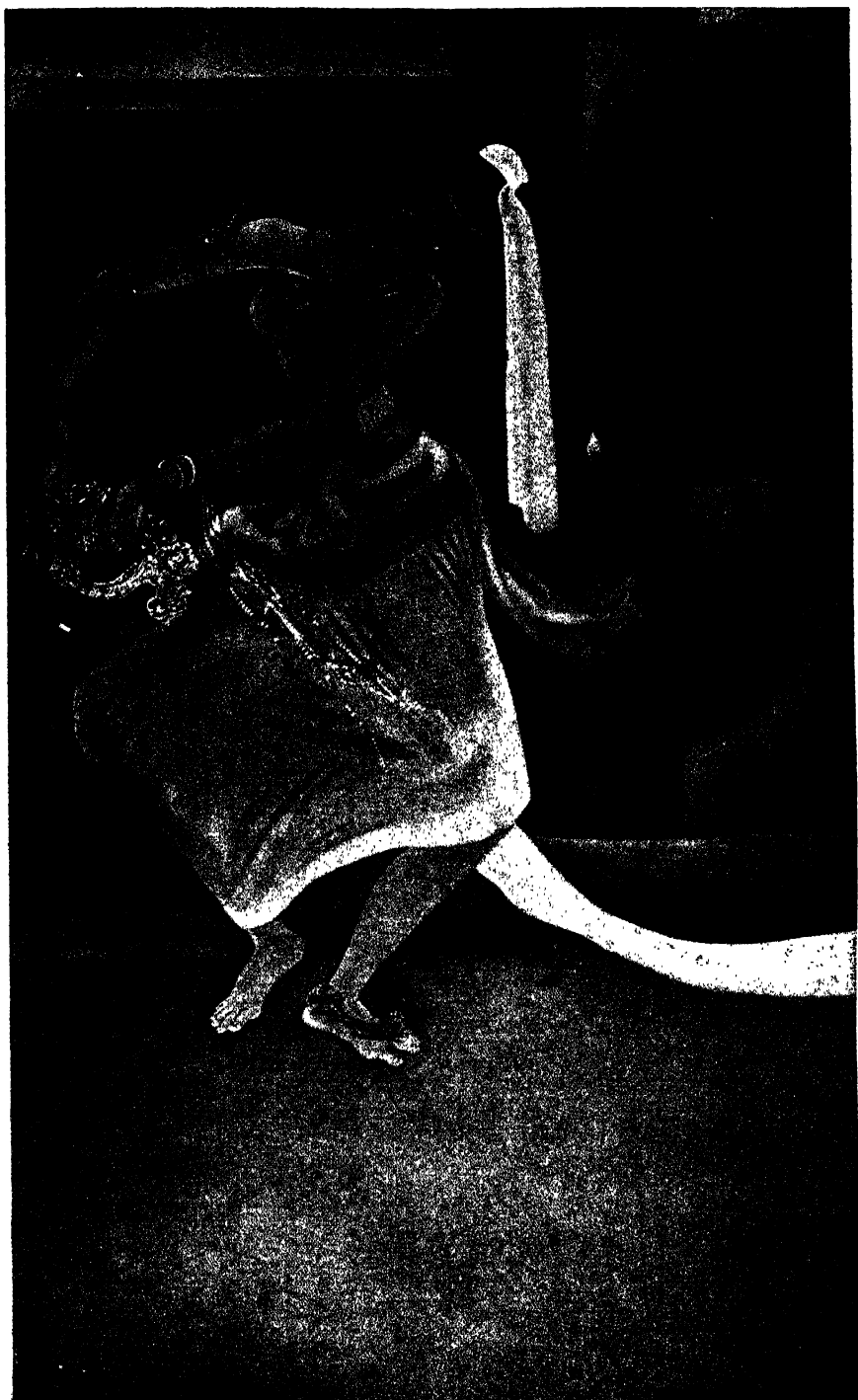
'তোমার বন্দনা মোর ভঙ্গীতে আজ সঙ্গীতে বিরাজে'

শ্রীনন্দলাল বসু । জানুয়ারি ১৯২৭

স্বপ্নসম্ভবা

শ্রীনন্দলাল বসু । ফেব্রুয়ারি ১৯৩৭

আমরা জানি শ্রেষ্ঠ শিল্পীর জীবনেও এমন দিব্যমুহূর্ত অবিরল নয়। গদাধর যদি ঠাকুর রামকৃষ্ণ না হতেন, মূর্তি তৈরি করতেন, ছবি আঁকতেন, তাঁর জীবনেও হয়তো বার বার আসত না। কবি বা শিল্পীর সৃষ্টি যখন অপরূপ হয়ে উঠেছে, রসরূপ হয়েছে, সেই পরমাশ্চর্য ঘটনার পিছনে, সৃজনতৎপর জাগ্রত মানসের নেপথ্য-ভূমিতে, কী অজ্ঞাত অভূতপূর্ব আয়োজন চলেছিল, কী আনন্দ কী চেতনা কী অঘটন-ঘটানো মায়া বা শক্তি সক্রিয় ছিল, নিত্যই আছে, তারই আভাস বা অভিজ্ঞা -রূপেও এরূপ ঘটনার অশেষ মূল্য, বিশেষ তাৎপর্য —এটুকু মনে রাখা ভালো। রঙ তুলি আনন্দ বেদনা ভাব ভাষা নিয়ে আমাদের চোখের সামনে সৃজন করছেন একজন শিল্পী ; চকিতে দেখা গেল, সঙ্গে সঙ্গে আর-একজন শিল্পী গোপনে কাজ করছেন অতিসূক্ষ্ম মনোযবনিকার ওধারে— তাঁর নাম নেই, কোনো পরিচয়ই জানা যায় না। শিল্পীর রূপসৃষ্টি তাই এত সুন্দর, এমন অলৌকিক, অনির্বচনীয় আনন্দ-বেদনায় নিত্য তাই আকর্ষণ করে। থাক্ সে কথা।

স্বভাবসিদ্ধ যোগী বা ভক্ত না হলেও বালক গদাধরের সঙ্গে বালক নন্দলালের চমৎকার মিল দেখা যায়, যেখানে উভয়েই তাঁরা স্বভাবসিদ্ধ শিল্পী। সমবয়সী শিশুদের সর্দার হয়ে মাঠে ঘাটে বনে বাদাড়ে যথেচ্ছ ক্রীড়াকৌতুকে একই-প্রকার পল্লীপ্রকৃতির পরিবেশে উভয়ে মানুষ হয়েছেন। স্থানীয় প্রতিমাকার কুমোরের ঘরে প্রহরের পর বিমুগ্ধ প্রহর কেটেছে। প্রবীণ কারিগরের দেখাদেখি প্রস্তুত কাদা-মাটি নিয়ে টিপেটুপে, গ'ড়েপিটে, যখন খেলতে খেলতেই মাটি হয়ে উঠেছে মূর্তি, বালক নন্দলালের বিস্ময়ের ও সুখের অবধি থাকে নি। এইভাবে একাকারে আকার-সৃজনের যে শিক্ষা পেয়েছেন— অন্তরে থেকে দীক্ষা দিয়েছেন আনন্দময় অন্তর্যামী— তাইতেই সমস্ত জীবনের গতিপথ নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছে।

মুক্তপ্রকৃতির পরিবেশে লালিত নন্দলালের এই সুখের শৈশব, আর নন্দলালের প্রাথমিক রূপকলা-অনুশীলনের বিশেষ প্রকৃতি, উভয়ই আমাদের মনে রাখতে হবে। প্রধানতঃ রঙ তুলি নিয়ে কাজ করলেও স্বভাবতঃই তিনি মূর্তিকার। মূর্তিকৃতিতেই এ দেশের পরম বৈশিষ্ট্য। অজন্তা-বাগ-বাদামী গুহার অজ্ঞাতনামা সিদ্ধশিল্পী-সমাজ, তেমনি কালীঘাটের প্রাচীন পটুয়ারা, পুরাতন পুঁথি ও পাটার বংশানুগামী চিত্রীগণ— অনেকেই এঁরা-যে আসলে মূর্তিকার ছিলেন না এ কথাও নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। হয়তো চিত্রকর ও মূর্তিনির্মাতা উভয়ই তাঁরা ছিলেন। কালধর্মে আজ এক-একটি শিল্পের অনুশীলনই বিহিত হয়েছে। আন্তরিক প্রবৃত্তি থাকলেও একই ব্যক্তির একাধিক বৃত্তি-গ্রহণের সময় সুযোগ বা প্রয়োজন অল্প। নন্দলাল তাই বিশেষভাবে চিত্রস্রষ্টা। কিন্তু চৈনিক বা পাশ্চাত্য বহুসম্মত

চিত্ররীতির কথা বাদ দিলেও, সন্নিহিত দেশে কালে গুরু অবনীন্দ্রনাথ যে পথের পথিক, যে অর্থে চিত্রকর, নন্দলালের শিল্পসাধনা শুরু হয় নি সেই পথে আর সেই মতে। প্রকারান্তরে পূর্বেই বলেছি, এ বিষয়ে তিনি স্বভাবতঃই ভারতীয় ধ্রুবচিত্ররীতির অনুগামী।

কিন্তু নন্দলাল তাঁর একনিষ্ঠ সাধনার সরণীতে কোথাও এসে থামেন নি কোনোদিন, একটি কোনো প্রকৃষ্ট শিল্পসিদ্ধিতে উত্তীর্ণ হয়ে বলেন নি 'বেশ হয়েছে, আর কেন', তাই সৃজনপ্রতিভার মূলপ্রকৃতি প্রায় অপরিবর্তনীয় হলেও— অবনীন্দ্রনাথের অজস্র চিত্রকৃতিতে যেমন বৈচিত্র্যের শেষ নেই, তেমনি অজস্রতা আর তেমনি বৈচিত্র্য লক্ষ্য করি নন্দলালের শিল্পসৃষ্টিতে। জীবনের ঘটনা, বিশেষতঃ মহৎপ্রতিভার বিকাশব্যাপার, অতি জটিল হলেও সহজ সরল সূত্রে যদি বলি— বেচারা বাক্‌পটু লেখকের পক্ষে আর কী উপায় আছে— বলা যায় :

অবনীন্দ্রনাথ পূর্বপ্রচলিত পাশ্চাত্য চিত্ররীতির থেকে প্রাচ্যরীতির সন্ধানে যাত্রা করেছেন, তারই বিপরীত মুখে নন্দলাল ভারতীয় ধ্রুবচিত্ররীতির সহজ অধিকার থেকে পা বাড়িয়ে, চীনা জাপানী বিলাতী চিত্ররীতির বিশেষ বিশেষ গুণ অঙ্গীভূত ক'রে, স্বকীয় রূপসৃষ্টিকে কেবলই ঐশ্বর্যশালী ও বিচিত্র করে তুলেছেন।—

একজন রূপের বিমূর্ত ব্যঞ্জনা ও লাবণ্য থেকে যাত্রা ক'রে রূপের পরিস্ফুট গোচরতার দিকে চলেছেন, অন্যজন মূর্তিসগোত্র রূপায়ণ ত্যাগ না ক'রেও রূপের অরূপ ভাবলাবণ্য, বিমূর্ততা ও বর্ণব্যঞ্জনা উত্তরোত্তর সেধে চলেছেন আপন শিল্পসাধনায়।—

অবনীন্দ্রনাথের পদক্ষেপ রঙ থেকে রূপে আর নন্দলালের অভিসার বুঝি রূপ থেকে রঙের অভিমুখে, যে রঙ বিশ্লিষ্ট আলোকের অরূপ হাতছানি মাত্র আকাশ-পৃথিবীর দিগ্‌বিদিকে।—

বলা বাহুল্য, সহজ সরল সূত্র-নির্দেশ হলেও, এই উভয় গুণীর মধ্যে কারও যাত্রাপথই ঋজুরেখায় অগ্রসর হয় নি এবং বিপরীত মুখে প্রসৃত হয়েও বারে বারেই পরস্পরকে ছুঁয়ে গেছে, পরিণামে হয়তো দুটি কম্বুরেখায়িত উত্তরণসরণী জেগে উঠেছে— তার এক দিকে দেখি মূর্তিসগোত্র রূপ, আর অন্য দিকে মুখ ফেরালে দেখা যায় পাশ্চাত্য বিদ্বজ্জন যাকে বলেছেন painterly painting, স্বভাব-স্বধর্ম-নিষ্ঠ চিত্র।

প্রতিভার প্রৌঢ় পরিণতিতে অবনীন্দ্রনাথ রূপের মায়াপুরী উদ্‌ঘাটন করে দেখতে দিয়েছেন আরব্য যামিনীর সাকার স্বপ্নমালা, আর নন্দলালও আমাদের নয়নগোচর করেছেন একটি দোলন-চাঁপা ফুলের একটু পেলব স্পর্শ ও সৌরভ,

শিশিরিত-দূর্বাদল-ছোঁয়-নি বাতাসে-ভাসা সেই শিউলি ফুলের মতো পোয়ে-নাচের স্বপ্নসচল রূপ, কালো কালীতে কিম্বা বিচিত্র বর্ণক্ষর তুলির ছাপে ছোপে সমুদ্র পর্বত আকাশ আলোক মেঘ, দ্বিজেন্দ্রসেবিত 'নিচুবাংলা'র ধূপছায়া-চমকিত শ্যাম-সোনা-কাজলে-রচিত অপূর্ব এক মায়া, গোয়ালপাড়া যেতে ধূলিধূসর পথের উপর মূর্ছিতশ্রী প্রথম ফাল্গুনের একটি রৌদ্রদীপ্ত অপরাহ্লবেলা, পাঠনিবিষ্টা এ কালের পত্রলেখা— উটজদ্বারপথে দিনান্তের-প্রদীপ-ধারিণী— ধূ-ধু ডাঙায় কুল-পিয়ালের জঙ্গলে লোলগাত্রী অসিতাঙ্গী অশীতিপরা শবরী— দেখা না-দেখায় মেশা অপূর্বরূপে সুখজনক একটি চির-অতৃপ্তি রেখে দিয়ে যায় যারা চমৎকৃত অন্তরে।

একদা রূপ এবং রেখার অব্যর্থ ব্যঞ্জনা ছিল যে নন্দলালের চিত্রকৃতিতে, বর্ণের সুবিহিত বিন্যাস ও সমন্বয়, তাঁরই পরিণত প্রতিভার সৃজনে রসতায় উত্তীর্ণ হয়েছে রঙ, বিশেষভাবেই 'ধ্বনিত' হয়ে উঠেছে— থেকে থেকে হারিয়ে গিয়েছে রূপের রেখাবদ্ধভাব। (স্বভাবেও রূপের গোচরতা নয় রেখাশ্রিত।) বলা চলে, রূপ-সৃষ্টির নূতন এই শৈলীতে চিত্র হয়ে উঠেছে সংগীতের মতো।

বর্ণসংগীতের আলাপে অবনীন্দ্রনাথের ছিল জন্মান্তরীণ অধিকার, তিনি ছিলেন স্বভাবসিদ্ধ।

মূর্তিপ্রতিম রূপলেখন আর স্বধর্মনিষ্ঠ চিত্র এই উভয়ের অন্তর্বর্তী আর-এক প্রকার রচনার নামকরণ হতে পারে— পট। দুই আয়তনের ক্ষেত্রে দুই আয়তনেরই ছবি। চিত্রভূমির অথবা রূপের রেখাবদ্ধ বর্ণরঞ্জিত সমতলতায় নতোন্নতভাবের বিন্যাস বা বিভ্রান্তি নেই। এই পটেরই একান্ত উৎকর্ষ রাজস্থান অথবা কাংড়ার চিত্ররূপে আপনার শেষ সীমায় পৌঁছে কী যেন জাত্যন্তর পেয়েছে, অথচ এ দেশের বা বিদেশের ধ্রুবচিত্ররীতির সগোত্র হয় নি। আপাতত 'পট' নামে যে ছবির প্রচলিত পরিচয় তারই সম্পর্কে কথঞ্চিৎ আলোচনার দ্বারা শিল্পী নন্দলালের বিশেষ এক শ্রেণীর রূপকৃতির তাৎপর্য বুঝে নিতে চাই। কী জানি এই 'পট'কে চিত্রাভাস বলাও অসংগত হয় কি না। কারণ, মূর্তিতে এবং পুতুলে যে তফাত— বিলাতী ডল বা নকল-মূর্তির কথা বলছি না— চিত্রে এবং পটে সেই

[২] বড়ো ছবি। শিউলি ফুলের সার্থক উপমা দিয়েছেন স্বয়ং অবনীন্দ্রনাথ। মূল চিত্র না দেখে কিছুই বোঝা যাবে না। উপযুক্ত কোনো প্রতিচিত্র আজও মুদ্রিত হয় নি। মূল চিত্র স্বর্গীয় প্রফুল্লনাথ ঠাকুরের চিত্রশালায় সংগৃহীত। সংরক্ষিত কি না কে জানে।

পার্থক্যই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রধানতঃ আলংকারিক ছন্দে পরম্পরাগত[৩] অথবা মন-গড়া গড়ন ও মুদ্রা (motif) সাজিয়ে একটি কল্পরূপ বা কন্‌ভেন্‌শন -গত রূপায়ণ প্রকটিত করাই পটের বিশেষ চরিত্র। অর্থাৎ, রূপ রেখা রঙের সমাবেশে মণ্ডন বা শোভাসম্পাদনই এই পটের বিশেষ গুণ বলা যেতে পারে। অভ্যস্ত পুনরাবৃত্তি মাত্র না হলে, রসধ্বনি না জাগালেও, 'শব্দধ্বনি' বা 'অলংকারধ্বনি' অবশ্যই জাগাতে পারে।

নন্দলাল-প্রতিভার ভারতীয়তা যেখানে,[৪] বিশিষ্ট গুণ যেগুলি, তারই মধ্যে মণ্ডননৈপুণ্যের বিশেষ স্থান আছে। শিল্পসাধনার নানা পর্বে, নানাবিধ প্রেরণায়, শিল্পী তাই অনেকগুলি বিশুদ্ধ পটও এঁকেছেন। সেই পটগুলিকে তাঁর 'মূর্তি' এবং 'চিত্র' -সাধনার অন্তর্বর্তী-রূপে স্থাপন করে পরিষ্কার একটি ধারণায় পৌঁছানো যেতে পারে। তৎপূর্বে আমরা যাকে 'পট' বলছি তার স্বরূপ ও সংজ্ঞার্থ -নির্ণয়ে আর-কয়েকটি বিবেচ্য বিষয়ও আছে। স্বীকার করতে বাধা নেই, এ ক্ষেত্রে পূর্ব-প্রস্তুত মত বা বিশ্বাস আমাদের জানা নেই, মহাজনপদাঙ্কিত পথও অপরিচিত, কতকটা— 'পথ আমারে পথ দেখাবে এই জেনেছি সার'।

চিত্র এবং চিত্রাভাস (পট) পাশাপাশি রেখে দেখতে পাই— চিত্রের যেমন

৩ 'পরম্পরাগত' শব্দের বিভিন্ন অর্থ। ট্র্যাডিশন বা পরম্পরা থেকে আগত বা প্রসৃত যে রূপ, অথচ বর্তমানে স্থিত, ভবিষ্যতের অভিমুখী, তাকেও যেমন লক্ষ্য করা চলে, তেমনি অভিহিত করা হয়ে থাকে সেই চিত্ররূপকে যা পরম্পরা+গত, বিগত বা মৃত ট্র্যাডিশনের অভিমুখী, সমকালীন জীবনে বা অভিজ্ঞতায় যার মূল নেই। আপাতিক ফ্যাশনের বিভ্রমে এমন অমূল প্রসূনেরও যথেষ্ট বাজার-দর থাকতে পারে, কিন্তু তদনুপাতে যাথার্থ্য বা সত্যতা থাকে কি না সন্দেহ।

নন্দলালের পট অতীত ট্র্যাডিশন থেকে এসে বর্তমানের অভিজ্ঞতায় সজীব ও প্রাণচঞ্চল, ভবিষ্যতের দিকে তার মুখ ফেরানো— বর্তমান কালে অননুকৃত বা অনুকরণাতীত যদি বা হয়, ভাবীকালেও নূতনতার চমৎকারে শিল্পী ও রসিকদের নূতন প্রেরণা যোগাতে সক্ষম হবে। নন্দলালের প্রত্যেকটি পট নূতন। আপন পুরাতনের পুনরাবৃত্তিও সেখানে নেই, যেমন সাধারণ পটে থাকবার কথা। নিত্য নূতন সৃষ্টি -শীল সিদ্ধশিল্পী তিনি।

সুনয়নী দেবীর সহজসুন্দর পট সেও অতীতমুখী নয়— তাঁর পক্ষে যা সজীব বর্তমান, তাঁর যা নিজস্ব ভাব ভক্তি বিশ্বাস ও অভিজ্ঞতা তারই সঙ্গে সমন্বিত। নিছক প্রকরণ-কৌশলে তো শিল্পসৃষ্টি হয় না, তাই পরিদৃশ্যমান বস্তু ও ঘটনা শুধু নয়, শিল্পী-অন্তরের ভাবনা ও বিশ্বাস এগুলিরও প্রাণ আছে, মূল্য আছে— এগুলির ন্যূনতায় বা অভাবে, শতনৈপুণ্য সত্ত্বেও রূপরচনা অসার্থক না হয়ে পারে না, প্রাণহীন কাঠামো হয়ে দাঁড়ায়।

৪ অজন্তাগুহাবলীতে নিছক মণ্ডনেরও প্রাচুর্য দেখা যায়, আর চিত্রাবলীতেও সতত্তই মণ্ডনগুণ বর্তমান।

বিরহিণী শ্রীরাধা।

শ্রী নন্দলাল বসু
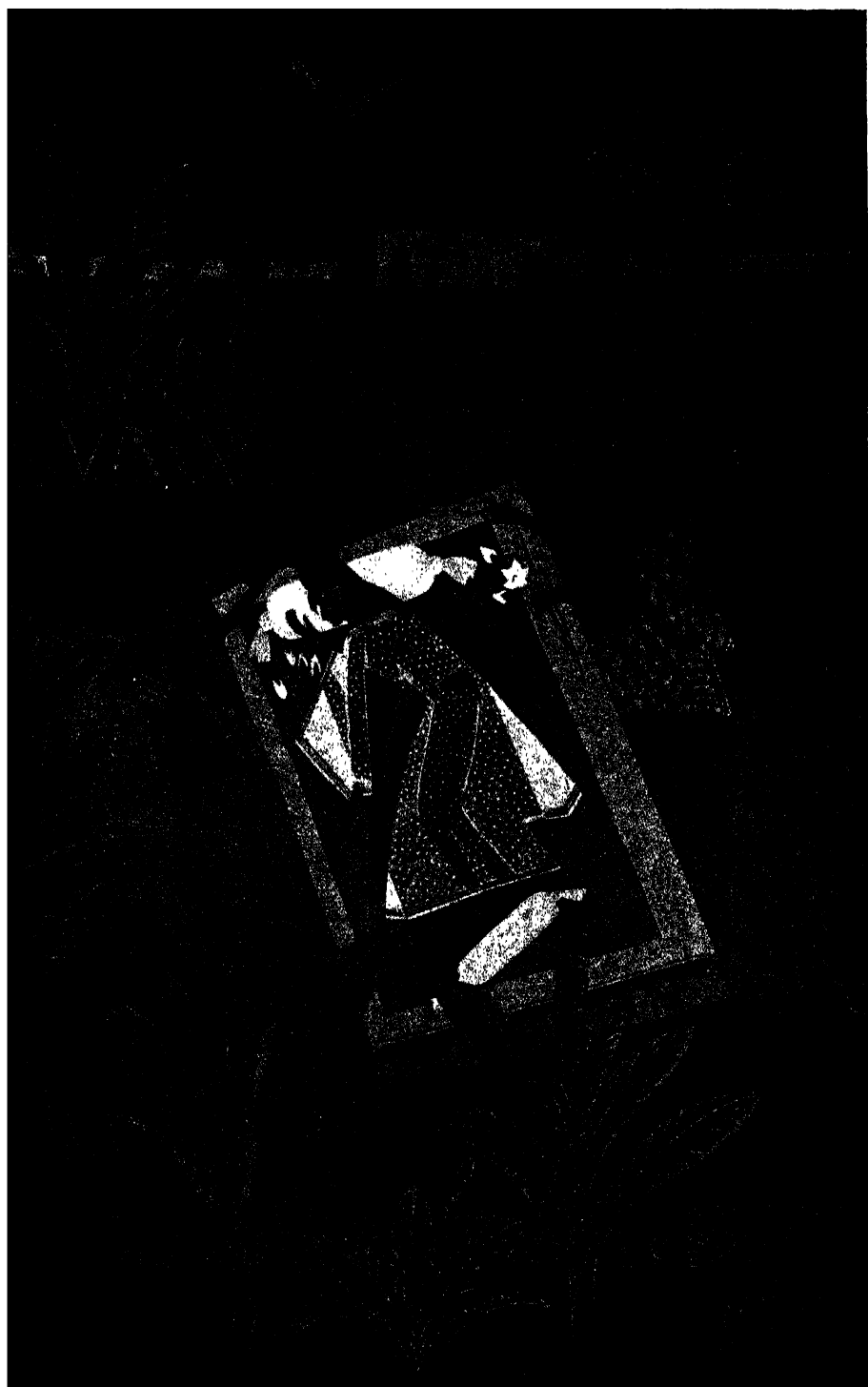
আছে কায়া তেমনি আছে আশ্চর্য একটি মায়া। কায়ার উপাদানভূত হয়ে আছে যেমন রেখা রঙ রূপ বা প্রতিরূপ বা রূপাভাস, মায়ার রহস্যগূঢ় রচনা হয়ে থাকে ভাব চরিত্র অনুষঙ্গ ও ব্যঞ্জনা দিয়ে। কায়ার আশ্রয়রূপে আছে যখন পাটা কাগজ কাপড় বা ভিত্তিতল, মায়া আশ্রয় লাভ করে দেশে কালে ঘটনায় বা কাহিনীতে। সুরচিত কায়ার আছে রূপশ্রী, আর যথাযথব্যঞ্জিত মায়ার পরিণামে জেগে ওঠে অনির্বচনীয় রস বা অ-লৌকিক আনন্দ। দেশ কাল ঘটনা কোনো একটি বা ছুটি বা সব ক'টি না থাকলেও সুন্দর পট হতে পারে। দেশ নেই, আছে রঞ্জিত বা নীরঞ্জন কাগজ পাটা বা ভিত্তিতল— বিভিন্ন রূপের অবকাশে। দিন বা রাত্রি, আলো বা অন্ধকার, বাদল বা কুয়াশা, সকাল-সন্ধ্যার বিশেষ কোনো ক্ষণের বিশেষ একটি আবহ বা ব্যঞ্জনা না থাকতে পারে পটে। আর, ক্রিয়া বা ঘটনা রইল না, অথবা সুস্থির ভঙ্গীমাত্র রইল, কাহিনী বাদ দিয়ে রইল জানা-শোনা কাহিনীর কয়েকটি লক্ষণ বা প্রতীক, তাতেও সুভূষিত পট হওয়ার বাধা নেই। অপর পক্ষে চিত্রে রসিক আশা করেন বিশেষ দেশ, বিশেষ কাল এবং বিশেষ ঘটনার স্পষ্ট রূপায়ণ না হলেও অন্তত একটু আভাস, একটু ইশারা— এবং তারই ফলে জীবনের সঞ্চিত নানা স্মৃতি ও অনুষঙ্গ জেগে উঠে মনকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করে রসের অভিমুখে।

বলা চলে, এক প্রকার রূপকল্পনা নানা দেশ কাল ঘটনা আশ্রয় করলেও মোটের উপর নির্বিশেষ চরিত্রের হয়ে থাকে, অন্য প্রকার রূপকল্পনা বিশেষের স্বয়ংবরা হয়ে, বিশ্বের মধ্যে বিশেষভাবে তাকেই সামনে ধ'রে সার্থক হয় এবং শিল্পী বা শিল্পরসিককে সার্থকতা দান করে।*

এই সংজ্ঞার্থ -অনুযায়ী শিল্পী নন্দলালের পরিণত বয়সের আঁকা হরিপুরা-পটগুলিকে সহজেই পট বলে চেনা যায়, কিন্তু তাঁরই যৌবনকালের সৃষ্টি শ্রীরাম-সীতা-আখ্যানের রূপরাজিকে কী বলব? সেখানে তো বন-উপবন সিন্ধু-সরিৎ প্রভাত-গোধূলি তারকিত-নিশা এ-সবই চিত্রিত হয়েছে, আর অপূর্বভাবে মুখর হয়ে উঠেছে রাম-সীতার মিলন বিরহ বিচ্ছেদের করুণমধুর কাহিনী। সে কথা সত্য। এগুলিকে পট বলতে চাই এজন্যই যে, এই-সব আলেখ্যে প্রতি পদে বিচিত্র দেশ কাল ঘটনার প্রতীক রচিত হয়েছে সত্য, ভঙ্গী সৃজিত হয়েছে, নেই তবু বিশেষ বাস্তবতা বা রিয়েলিজ্‌ম্। সীমাবদ্ধ পটভূমির মণ্ডন বা অলংকরণই যেন যা-কিছু আকার এবং আয়োজনের বিশেষ সার্থকতা।

অন্যভাবে বলা যায়— পট আঁকতে হলে রূপরচনায় যেমন, প্রয়োজনমত দেশ কাল ঘটনার বিন্যাসেও তেমনি, পরম্পরাগত কৌশল ও মন-গড়া ভঙ্গীই ব্যবহার

* নির্বিশেষ এবং বিশেষ : general and particular।

করা হয়ে থাকে। কেবল এ দেশের প্রাচীন বা আধুনিক পটে নয়, অন্য দেশেও। এমন না হলেই বিস্ময়ের বিষয় হত। দেশ কাল ঘটনার এমন প্রতীকরচনাচাতুর্যে বিশেষ খ্যাতি ও পরিচিতি অর্জন করেছে দূরপ্রাচ্যের বহুশতাব্দব্যাপী পটচিত্রের ধারা— হঠাৎ একদিন আবিষ্কৃত হয়ে প্রতীচ্যকেও মুগ্ধ করেছে এবং সে দেশের পূর্বপ্রচলিত চিত্ররীতিতে নূতন প্রাণ ও নূতন প্রেরণা -সঞ্চারের, হয়তো বা নূতন দেহ -গঠনেরও, অন্যতম হেতু হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শুনেছি পূর্বোক্ত রামচরিত লিখনগুলির কাছাকাছি কোনো সময়ে, বাণীপুর গ্রামে ব'সে, নন্দলাল কালীঘাট পটের রীতিতে কতকগুলি পট এঁকে দু-চার আনায় স্থানীয় মুদির দোকানে বিক্রয় করিয়েছিলেন, অবশেষে অনেকগুলি স্থান পেয়েছিল গুরু অবনীন্দ্রনাথের তৎকালীন চিত্রসংগ্রহে— এগুলির কোনো নিদর্শন আমাদের দেখবার সৌভাগ্য হয় নি।

আধুনিক কালে আর-একজন সার্থক সাবলীল পট এঁকেছেন প্রতিভার আন্তরিক প্রেরণায়, তিনি অবনীন্দ্রভগিনী শ্রীমতী সুনয়নীদেবী। অন্যের তুলনায়, সুচির-অনুশীলন-সাধ্য আঙ্গিকের নৈপুণ্য সেই পটে অল্প হলেও, প্রেরণার সত্যতা ও সজীবতা প্রচুর পরিমাণেই আছে। রূপরচনার ভাষা তাঁর অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র সীমায় বদ্ধ হলেও, রূপরসিক ব্যক্তির তবু আক্ষেপের কারণ নেই।

পট এঁকেছেন অবনীন্দ্রনাথ, কৃষ্ণমঙ্গল এবং চণ্ডীমঙ্গল আলেখ্যমালায়। জাত-পট বলতে একটু বাধে। কেননা, অবনীন্দ্রনাথের অন্যান্য শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিতে যে উন্নত স্বভাবসংগতি ও বাস্তবতা দেখা যায় সে তিনি এ ক্ষেত্রেও সম্পূর্ণ গোপন করতে পারেন নি, অন্তত রূপনির্মাণে মণ্ডনগুণ রয়েছে অল্পই।

উৎকৃষ্ট পট এঁকেছেন নন্দলালের কলাকৃতি -অনুগামী শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়— ভিত্তিগাত্রে, কাপড়ে, কাগজে ও পাটায়। বিশিষ্ট তাঁর রূপায়ণ, প্রত্যক্ষভাবে ছন্দের দ্বারা প্রেরিত ও প্রকটিত তেমন নয়, যতটা পুঙ্খানুপুঙ্খ গঠন -জ্ঞান ও নিবিষ্ট ভাবনার দ্বারা নির্মিত। কল্পরূপ তিনিও ব্যবহার করেছেন, না হলে 'পট' হত না, কিন্তু সেগুলি যেন তাঁর নিজেরই মন-গড়া এবং বিশেষভাবেই নূতন। অর্থাৎ, বিভিন্ন দেশ কালের পরম্পরা থেকে যা নিয়েছেন সেও নিজের করেই নিয়েছেন এবং এ দেশের সাম্প্রতিক চিত্রকলায় ফুটিয়ে তুলেছেন অপ্রত্যাশিত নূতনতার চমক।[৬]

৬ 'পট' বলা চলত বিমূর্ততার অভিসারী, এমন-কি অবচেতনার প্রেরণা -বাহী, বা তারই অন্ধ অনুকারী, নানা গুণীর নানা চিত্ররূপ'কে— মণ্ডনগুণের অভাব না থাকলে অথবা রূপসৃজন, রূপ রেখা রঙের 'ধ্বনি' -সৃজন ও মণ্ডন, এগুলিকে পরাভূত ক'রে অন্য গুণ বা অবগুণ একান্ত প্রাধান্য না পেলে।

রূপের রাজ্যে, রসের সীমানায়, জাতি-পাঁতির বিচার কাটা-ছাঁটা ভাবে করা যায় না। বিশেষ সাবধানে কতকগুলি বিশিষ্ট প্রবণতা মাত্র নির্দেশ করা চলে— সময়ে সময়ে সেও ভুল হতে পারে। নির্দিষ্ট কোনো জাতি-বিচারের সীমানায় ধরা দেবে না এমন সৃষ্টিও অবশ্যই দুর্লভ বা অসম্ভব নয়।

পট-গত দেশ কালের অভাব বা স্বভাব সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করা হল। পূর্বসূরীদের অনুসরণে অন্যত্র বলা হয়েছে— সজীব সচল অজন্তা-বাগ-চিত্রাবলীর দেশকাল বাহ্যিক দেশকাল নয়; সীমাহীন অন্তর্লোকের একটি যেন চিরকাল মাত্র। ধ্যানজ্ঞানের কোন্ শক্তিতে, কী আশ্চর্য জাতিগত প্রতিভায় এটি সম্ভবপর হয়েছিল, বিচার বিশ্লেষণ করে নিঃশেষে বলা যাবে না।

অবনীন্দ্রনাথের রচনায় রঙের মিড়ে মূর্ছনায় সংগীতের সজাতীয়তা ফুটে উঠেছে। মূর্ততার অনুরাগে নন্দলালের চিত্রকৃতির প্রধান একটি অংশে, শুধু যে ভারতীয় ধ্রুবচিত্ররীতির তথা ভাস্কর্য এবং ধাতুমূর্তির প্রভাব অনুস্যূত তাই নয়, ছন্দোবেগবান্ নৃত্যের অথবা নাট্যেরও সাজাত্য পরিলক্ষিত হয়। মানবরূপ, মানবাকার দেবতার রূপ, তাঁর চিত্রের অন্যতম প্রধান বিষয় ছিল। দেশ-বিদেশের একাল-সেকালের নানা শিল্পরীতির নানা গুণ আহরণ ক'রে, আত্মসাৎ ক'রে, ক্রমশই এ সংস্কার তিনি পার হয়ে গিয়েছেন। তাঁর চিত্রের বিষয়বস্তু, প্রকরণ এবং রস-ব্যঞ্জনা বহু এবং বিচিত্র হয়েছে। কালীতূলিতে আঁকা পঞ্চপাণ্ডবের মহাপ্রস্থানের বিশাল ছবি, ভারতের একাল-সেকালের কোনো ছবির সগোত্র ছিল না, চৈনিক রীতির সঙ্গেও হুবহু মেলানো যায় না— রূপকল্প এখানে দ্রড়িষ্ঠবিশাল অথচ সহজ, সরল, সাবলীল। উৎকৃষ্ট চীনাছবির মতোই লেখাঙ্কনের গুণোপেত অখণ্ড ছবিটি, অথচ তার খুঁটিনাটি অবয়বের পরিস্ফুটনে অপেক্ষাকৃত বাস্তবের ব্যঞ্জনা লক্ষ্য করা যায়। সীমাহীন প্রকৃতির দেখা- না-দেখা রূপকে প্রাধান্য দেবার জন্য মনুষ্য-রূপকে কিছুমাত্র অপ্রধান করা হয় নি— নিসর্গ ও নর (প্রকৃতি ও পুরুষ) এই দ্বৈতের সমাবেশে অ-পূর্ব এক রূপসংগীতি -সৃজনের গৌরব এবং সার্থকতা একা নন্দলালের।[৭]

বরোদা কীর্তিমন্দিরে 'নটীর পূজা'র ভিত্তিচিত্র এঁকেছেন নন্দলাল এ দেশের ধারাবাহী রীতিতে, তৎপূর্বে ঐ চিত্রই এঁকেছেন শান্তিনিকেতনের চীনাভবনে—

[৭] বর্তমানে এই ছবি শ্রীঅম্বালাল সারাভাইয়ের চিত্রসংগ্রহে রয়েছে। এই মহৎসৃষ্টির রূপ-রস-পর্যালোচনায়, সুহৃৎ শিল্পী শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের কয়েকটি মন্তব্য থেকে লেখক বিশেষ সাহায্য পেয়েছেন।

যথার্থ ফ্রেস্কো পদ্ধতিতে। কুণ্ডলীকৃত আখ্যানলিখন যেন প্রশস্ত ভিত্তিতলে ধীরে ধীরে খুলে ধরা হয়েছে। এজন্য কোনোরূপ পূর্বলেখ বা 'কার্‌টুন' তৈরি করেন নি। কিন্তু, শিল্পী কিছুদিন ধ'রে মনের ভিতরে সমুদয় চিত্রটি ধারণা করেছেন। ইচ্ছা ছিল, কালী তূলির কাজ যেমন স্বতঃ এবং দ্রুত প্রস্তুত হয়ে থাকে, কেবল রস এবং ছন্দের প্রেরণে বা আকর্ষণে ক্ষিপ্র [৮]তূলির টানটোনে এবং ছাপছোপে এও তেমনি হবে— তিন বেলার বেশি সময় লাগবে না। সংকল্প-অনুযায়ী কাজ হয়েছিল, অলক্ষ্য রূপচ্ছন্দের অনুসরণে ছুটেছিল শিল্পীর একাগ্র মনোযোগ আর মনোবশীকৃত তূলিচালনা। তিন বেলার বদলে তিন দিন লেগেছিল সে শুধু এজন্যই যে, বেকার বর্ণভাণ্ডবাহিনী 'কী করি' 'কী করি' ব'লে সবুজ একটু রঙ দিয়ে বসেছিল চিত্রভূমির পাড়ে। পূর্বে যাকে painterly painting আখ্যা দেওয়া হয়েছে এই অপূর্ব চিত্রধারা তারই এক আশ্চর্য নিদর্শন। রেখা ও রঙ, রূপ ও ছন্দ, দৃশ্য এবং অদৃশ্য মিলে মিশে আশ্চর্য এক রসের ঝলক। কোনো কোনো অংশের প্রতিচিত্র মুদ্রিত হয়েছে এখানে সেখানে— সে দেখে কিছুই বোঝা যাবে না, চীনাভবনে পৌঁছে স্বচক্ষে দেখে নেওয়াই ভালো।

এক কালে অবনীন্দ্র-গোষ্ঠীর শিল্পীদের সম্পর্কে নালিশ ছিল, তাঁরা পুরাণ-ইতিহাস-কাব্যের কাহিনী ঢুঁড়ে ঢুঁড়ে কল্পিত দেবদেবী মানবমানবীর ছবি করেন, প্রত্যক্ষের তাঁরা সম্মান দেন না, এবং চিত্রণপদ্ধতিতে বা প্রকরণেও অজন্তা রাজস্থান অথবা মোগল-দরবারের রীতিপদ্ধতির আচল-ধরা। এত বড়ো বিশাল বিচিত্র প্রকৃতি, সুখে দুঃখে দ্বন্দ্বে সংঘাতে আন্দোলিত উন্মথিত মানবসংসার— সে তাঁদের কাছে থেকেও নেই। এ অভিযোগ কিছুকালের মতো অনেক শিল্পীর ক্ষেত্রে মিথ্যা না হলেও, অবনীন্দ্রনাথ এবং নন্দলালের ক্ষেত্রে কবে সম্পূর্ণ সত্য ছিল ঠিক জানি নে— আর, নন্দলালের ছাত্রদশা-উত্তীর্ণ শিল্পসাধনায় তথা তাঁরও ছাত্রগণের কাজে কেবলই অপ্রমাণিত হয়।

রবীন্দ্রতীর্থ শান্তিনিকেতনে এসে শিল্পসাধনার নূতন একটি দীক্ষা পেলেন নন্দলাল আপনারই ভিতর থেকে। অথবা বলা যেতে পারে, দৃশ্যপ্রকৃতির অন্তরনিবাসিনী অন্য যে প্রকৃতি আনন্দময়ী, চৈতন্যময়ী, তাঁরই জ্যোতির্‌বিভাসিত প্রসাদে।

বৈরাগ্যের পথে একাধিক দীক্ষা আছে শুনি, অনুরাগের সাধনাতেই বা থাকবে না কেন? প্রথম গুরু পরমগুরুকেই দেখিয়ে দেন, একটি দীক্ষাকে সার্থক সম্পূর্ণ করে নিগূঢ়সঞ্চারী আরেকটি দীক্ষা এসে। ঠিক এই ভাবেই মুক্তদ্বার মানব-

[৮] সহজলভ্য এই তূলির বিবরণ শিল্পচর্চা গ্রন্থে সম্পাদকের নিবেদনে পাওয়া যাবে।

অজ্ঞাতবাসে অর্জুন

উৎকীর্ণ চিত্র । ধাতুফলক-[illegible] । জুলাই ১৯৩৬

শিল্পী শ্রীনন্দলাল বসু

বে শিবলোক

সংসারে ও নিখিল প্রকৃতিতে নন্দলালের প্রবেশ অবারিত হল। সব দুয়োরের অনন্ত একটি কুঞ্চিকা হাতে তাঁর দিয়ে দেওয়া হল বটে, তা ব'লে সাধনার প্রয়োজন শেষ হল না— হলেও তো কোনো সুখ বা সার্থকতা ছিল না— নূতনতর বিশালতর সাধনের সূচনা হল মাত্র। এত বিচিত্রপথাভিসারিণী সেই সাধনা, এমন নিত্য নূতন যে, এখানে তার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া চলে না, আর সে সাধ্যও আমাদের নেই।

কেবল এইটুকু স্মরণ করি যে, নন্দলালের সেই ছন্দ রূপ এবং রসের সাধনা যেমন তাঁর পূর্ণাঙ্গ চিত্রধারায় নিরন্তর বয়ে চলেছিল তেমনি চলত প্রস্তর বা ধাতু -ফলকে, কাঠে, লিনোলিয়ামে, কার্ডে এবং খসড়া-খাতায়। বিশেষতঃ কার্ডে। অল্পকালের অভ্যাস এবং অনুশীলনের ফলেই নন্দলাল এই স্কেচের কাজকে এমন এক পর্যায়ে উন্নীত করে নিয়েছেন যা অভিনব একটি চিত্ররীতি এবং এ দেশে অন্তত একেবারেই নূতন। মানবপ্রকৃতির ও বিশ্বপ্রকৃতির চলচ্চিত্রমালাকে চলতে চলতে ছুঁকে নেওয়ার মতো। প্রতীচ্যেও স্কেচ করার রীতি আছে— খসড়া প্রায়শঃই খসড়া থেকে যায়, হাত এবং হাতিয়ারের দক্ষতা অর্জিত হয়। তা ছাড়া পরবর্তী পূর্ণাঙ্গ চিত্র-রচনার কালে স্মৃতি উদ্দীপিত ক'রে যা উপাদান-রূপে ব্যবহৃত হতে পারে। প্রধানতঃ বিষয়টি দেখে দেখে আঁকা, রেখায় বা রঙে।

নন্দলালের কার্ড্‌স্কেচের প্রকৃতি একটু ভিন্ন। সেগুলি সম্ভবপর পূর্ণাঙ্গ চিত্রের আভাস এবং অভ্যাস হোক বা না হোক, নিজেরাও এক-একটি নিখুঁত ছবি। অবশ্য, কখনো রঙ, কখনো রেখা, কখনো ছাপছোপ, কখনো গড়ন, বিচিত্র উপায়-উপকরণে তাদের নির্মিতি— কাজেই বিচিত্র তাদের রূপ। যত রূপ শিল্পীর ছবিতে তত তাঁর স্কেচে, তবে আরও ক্ষণ-উদ্‌ভাসিত অপ্রস্তুত বেশে। সাধকেরা বলে থাকেন, যেমন নিত্যকার মাজাঘষায় ধাতুপাত্র ঝক্‌ ঝক্‌ করে তেমনি নিত্যনিয়মিত ধ্যানের অভ্যাসে চিত্ত থাকে অকলঙ্ক উজ্জ্বল। এই স্কেচের ছলে শিল্পীর চোখ-চাওয়া সেই ধ্যানের অভ্যাস। ধ্যানের যা বৈশিষ্ট্য সেও এখানে অনুপস্থিত নয়। স্কেচ করার সাধারণ প্রতীচ্যরীতি থেকে তাতেও তার পার্থক্য আছে। বহু স্কেচ করেন নন্দলাল স্মৃতি থেকে। ভোর রাত্রির নিষুপ্ত নির্জনতায় বাইরে যখন অন্ধকার, একটি আলো জ্বালেন মনের গহনে, আরেকটি জ্বালেন লণ্ঠন কোলের কাছটিতে, পরে একটির পর একটি কার্ড্‌ এঁকে চলেন— কত চকিত মুহূর্তের কতকিছু দেখা। এ তাঁর বহুদিনের অভ্যাস। (হাতে দেন বা ডাকে পাঠিয়ে দেন স্বজন বন্ধু এবং ছাত্রছাত্রীদের।) অবশ্য, সকাল সন্ধ্যা দুপুরেও আঁকেন, আর বিষয় সামনে রেখে কখনো আঁকেন না তাও বলতে পারি নে— তবে, হুবহু নকল করা তাঁর পক্ষে পরধর্ম। যেটি বিশেষভাবে অনুধাবনের যোগ্য

সেটি হল এই যে, শিল্পী নন্দলালের মনের আগারে চলতে ফিরতে, ঘরে বাইরে, দিনে রাত্রে, একটির পর একটি এমনি অসংখ্য রূপরাজি বা দৃশ্যশৃঙ্খলা কেবলই সঞ্চিত হয়ে চলে, পরে স্মৃতিতে স্বতঃই জেগে উঠে অথবা অনুধ্যানে উদ্‌বোধিত হয়ে এক-একটি ছবি হয় —কার্ড্‌স্কেচেও এই তাঁর প্রকৃষ্ট রীতি। একবার নিগূঢ় মানসে অবগাহন করানো চাই। ইংরেজ কবির প্রসিদ্ধ উক্তি একটু পরিবর্তিত ক'রে বলা যেতে পারে : *seeing and feeling recollected in tranquillity*। শান্তির অন্তরে সঞ্চিত, থিতিয়ে যাওয়া মানস হতে উদ্‌বোধিত, রূপের স্মৃতি ও সুখের শিহরণ।

অতুলনীয় ওয়ার্ড্‌সওয়ার্থের কাব্যলক্ষণ হলেও, নিঃসন্দেহ এটি পাশ্চাত্য চিত্র-প্রকৃতি নয়। চীনা বা জাপানী রীতি হলেও হতে পারে।

নন্দলালের জীবনব্যাপী শিল্পসাধনার আভাসসূচিত এই রেখাচিত্র।

রোগদুর্বল শরীরের শ্রান্তি ও অবসাদে শরীরনিবাসী শিল্পী আজ নিষ্ক্রিয়বৎ, স্তব্ধ। দৃষ্টি তাঁর কোন্ দূরে কোন্ অন্তরগহনে নিবদ্ধ কে বলতে পারে। মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বের কথা মনে পড়ে। কথাপ্রসঙ্গে একদিন বলেছিলেন, অভ্যস্ত কোনো রীতিতে নয়, এখন আঁকতে চাই সম্পূর্ণ নূতন রীতির নূতন ছবি। সেই নূতনকে দেখবার ভাগ্য আমাদের হয় নি। শিল্পী আপন অন্তরে অবশ্য দেখেছেন। অনাবিল তাঁর দৃষ্টি, পরিচ্ছন্ন তাঁর ধ্যান-ধারণা।

মহৎ জীবনের সাধনা বাহ্যতঃ শেষ হলেও, সেখানেই তার অবধি নয়। তাই তো জীবন-জীবনান্তরে আস্থা রাখার প্রয়োজন হয়। সে জীবন অন্য কালে যেমন, অন্য দেশেও হতে পারে, অন্য আধারে। যে রসরূপের সৃষ্টি হয়েছে তার প্রাণসঞ্চারী পরিণাম যেমন নিরন্তর ও বিচিত্র, যে ছবি আঁকা হয় নি সেও তো অনাগত কালের কোথাও না কোথাও বিশেষ একজন শিল্পীকে খুঁজে বেড়ায়। মানবলোকের অলক্ষ্য হৃদাকাশ অপূর্ব বৈদ্যুতীতে প্রাণময় হয়ে থাকে। কে জানে প্রাণসঞ্চারী ক্রিয়া তার বেশি বৈ কম নয়।

মহান্ শিল্পীর মনের কথাই কবির ছন্দোবদ্ধ ভাষায় এই ভাবে ধ্বনিত হয়েছে—

'অন্তরের অনির্বাণ অমৃতপ্রদীপ,
সে শিখায় দীপ্ত করি তুলি
রূপে রসে অনুরাগে আপনারে ভুলি
তোমারেই করিনু আরতি পথে পথে ভ্রমি—

নমি তব পদপ্রান্তে নমি আজ নমি
ওগো নরনারায়ণ!
এ পূজা কি করিলে গ্রহণ
এ আরতি!
লোকান্তরে পাঠাবে আবার, যদি
সেথায় তোমার পূজা হয়
আনন্দে আবেগে ছন্দে চিরমূর্তিময়!'

বরিষা-শান্তিনিকেতন
অক্টোবর-নভেম্বর ১৯৫৮

শিল্পী রবীন্দ্রনাথ

রূপ ও অরূপের সীমান্তপ্রদেশে, সৃজন ও প্রলয়ের অন্তর্বর্তী এক মুহূর্তে, জাগ্রত স্বপ্নের মোহময় কোন্ আবেশে দেখা গেল— নিশ্চেতনা সিন্ধুর কূলে কূলে আছাড় খেয়ে পড়ছে প্রতিনিয়তই উজ্জ্বলন তমিস্ররাশির অধীর তরঙ্গাভিঘাত। সেই চিরপ্রদোষের দিশাহারা লোকে হঠাৎ কুড়িয়ে পেলেন রবীন্দ্রনাথ অপরূপ তাঁর চিত্রকলা। রেখায় রেখায় বর্ণে বর্ণে তার চিত্রের পর চিত্রে দেখা যায় নিরাকারের উদগ্র আকারআকৃতি।

মনে রাখা দরকার, প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে আজ পর্যন্ত সকল দেশের সকল শিল্পচেষ্টায় প্রথমে ভাবনা, পরে আঙ্গিক, পরে উভয়ের ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ায় সুষ্ঠু-মিলনে সার্থক চিত্ররূপের প্রকাশ। অধুনা এই পারম্পর্যের বিপর্যয় কোথাও কোথাও দেখা গেলেও, সে শুধু দৃষ্টির বিভ্রম। প্রথমে আঙ্গিকের প্রকাশ, পরে ভাবনার সংযোজন— এ শুধু আপাতপ্রতীয়মান ঘটনা। আসলে এখানেও ভাবনা থাকে প্রচ্ছন্ন, জাগ্রত চেতনার নেপথ্যে— রঙ্গমঞ্চের সজন অথচ ছায়াবৃত সেই অংশ থেকে শিল্পীকে সূত্র ধরিয়ে দেয় সে, অব্যক্ত সুরও প্রেরণ করে, অলক্ষ্যে আলো-ছায়া-নিয়ন্ত্রণ আর পটের পরিবর্তন ঘটায়।

রবীন্দ্র-চিত্রকলার বিকাশের ইতিহাস অনুসন্ধান করে দেখি, বর্ণরেখাময়ী চিত্র-লেখার প্রতি কবির অন্তরের টান বহুদিনের। প্রথম যৌবনের স্মরণে নিজেই তিনি বলেছেন, 'দুপুরবেলায় জাজিম-বিছানো কোণের ঘরে একটা ছবি আঁকার খাতা লইয়া ছবি আঁকিতেছি। সে যে চিত্রকলার কঠোর সাধনা তাহা নহে— সে কেবল ছবি আঁকার ইচ্ছাটাকে লইয়া আপন-মনে খেলা করা। যেটুকু মনে থাকিয়া গেল, কিছুমাত্র আঁকা গেল না, সেইটুকুই তাহার প্রধান অংশ। ···কর্মহীন শরৎ-মধ্যাহ্নের একটি সোনালি রঙের মাদকতা দেয়াল ভেদ করিয়া··· ক্ষুদ্র ঘর পেয়ালার মতো আগাগোড়া ভরিয়া তুলিতেছে।'

কিন্তু, চিত্রকর রবীন্দ্রনাথের আত্ম-আবিষ্কার এখানে নয়।

সোনার তরীর যাত্রী মানসসুন্দরীর বন্দনা লিখেছেন পুঁথির যে পাতায় তারই অবসরে দেখা দিয়েছে নির্বিশেষ মানুষের রেখাবদ্ধ মুখচ্ছবি। এখনো কিন্তু বিশেষ কোনো রঙ্ ধরে নি কবির মনে।

আরও পরে দেখি, বঙ্গভঙ্গের কালে অগ্নিদীপ্ত ভাব ও ভাষার যে আখর

প্রাচীন পাটা : বীরভূম : অষ্টাদশ শতাব্দ

পট : শ্রীমতী সুনয়নী দেবী

এঁকেছেন বাউল কবি, তারই অনলমণ্ডলের অন্তরে-অন্তরালে বলয়িত রেখাবলীর অলৌকিক লতা অম্লান পুষ্প ফুটিয়েছে স্তবকে স্তবকে। রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট চিত্রকর্মের এখানেই সূচনা। পাণ্ডুলিপির বর্জনীয় ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন অংশগুলিকে নিরাবরণ নিষেধে অবমানিত না করে লিপিকুশল রবীন্দ্রনাথ তাদের পরস্পর যুক্ত ক'রে, ছন্দোবদ্ধ ক'রে, রেখার সুষমায় ও রূপের আভাসে উৎসুক ক'রে, অপ্রত্যাশিত এক সার্থকতা দিয়েছেন।

কবি যা বর্জন করেছেন লিপিকার তাতেই ঢেলে দিয়েছেন অপরিসীম যত্ন আর অকুণ্ঠ সময় ও শক্তি। লিপিশিল্পীর এই খেয়ালেই, রেখার অস্খলিত গতিতে ও সূক্ষ্ম কারুকার্যে, চিন্তাহীন চেষ্টাহীন মগ্নমনের ক্রিয়ায়, রবীন্দ্র-চিত্রকলার প্রথম আবির্ভাব। রবীন্দ্র-লিপিকুশলতার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত ও সমন্বিত রবীন্দ্র-চিত্রকলা।

শাস্ত্রে বলেছে, আত্মাকে ছন্দোময় করে শিল্প। জীবনব্যাপী কাব্য ও সঙ্গীতের সাধনায় সহজেই ছন্দোময় সুষমাময় হয়েছে রবীন্দ্রনাথের সকল সত্তা ও সমুদয় ক্রিয়া। তাই, কোনো গুরুগৃহে না শিখে, কোনো পূর্বপ্রথার অনুশীলন না ক'রে, কোনো সচেতন চেষ্টায় প্রবৃত্ত না হয়েও, কেবল প্রাণের আবেগে ও আবেশে, অচিন্তিতপূর্বের আবিষ্কারের নেশায়, যে ছবি আঁকা হয়েছে তার মুখ্য ও প্রায়-সর্বব্যাপী গুণ হল ওই ছন্দ এবং সেই ছন্দ-অনুগামী অব্যর্থ-সুন্দর অঙ্গন্যাস, ভাষান্তরে যাকে বলা হয় কম্পোজিশন। দুটি একই সৌন্দর্যসুষমার গতি আর স্থিতির দিক, পরস্পরের সহায় ও পরিপূরক।

গঙ্গা-যমুনার মতো যুক্তধারা কবিতা ও ছবির, রবীন্দ্রায়ুর বৎসরের পর বৎসর বয়ে চলেছে একাগ্র গতিতে, পাণ্ডুলিপির পর পাণ্ডুলিপি পার হয়ে। এর প্রায় চরম উৎকর্ষ দেখি পূরবীর পৃষ্ঠায় ; কবি তখন, কবির ভাষাতেই বলি, চৌষট্টি বৎসরের প্রবীণ যুবা। ইতিপূর্বেই কবির চিত্রকৃতি কিন্তু স্বাধীন সত্তাও পেয়েছে, এবং তার ফলে বিচিত্র হয়েছে, নব নব রূপগুণের বিকাশে হয়েছে বিশিষ্ট।

চিত্রের প্রায় সর্বসামান্য একটি গুণ হল সাদৃশ্য। সংসারে বা স্বভাবে যে রূপ দেখি চিত্রের রূপ অল্পবিস্তর তারই সদৃশ। প্রাগৈতিহাসিক গুহাবাসীর রচনায় আমাদের জানা ও চেনা আলোছায়া উচ্চনীচতা ও পরিপ্রেক্ষিতের সম্পূর্ণ অভাব থাকলেও, ঋজু ও বলিষ্ঠ সাদৃশ্যের গুণেই শিল্পী আর শিল্পপ্রাজ্ঞ মানুষের আজও তা বিস্ময়ের বস্তু। এই সাদৃশ্যের ঐকান্তিক অনুসরণ রেনেসাঁ এবং তৎপরবর্তী পাশ্চাত্ত্য চিত্রকলায়। এই সাদৃশ্যকেই অতিক্রম করবার দুরূহ প্রয়াসে আজ জন্ম নিয়েছে সেখানে অবচ্ছিন্ন আর অতিবাস্তব নানা চিত্ররীতি— কিউবিজ্‌ম্, সুররিয়ে-লিজ্‌ম্, ডাডাইজ্‌ম্ এবং আরও কত-কী। প্রয়াসের প্রাণপণ প্রত্যেক ক্ষেত্রেই প্রায়

অতিপ্রকট বলা চলে।

রবীন্দ্র-চিত্রকলা সাদৃশ্যহীন না হলেও সাদৃশ্যমুক্ত। অর্থাৎ, কোথাও সাদৃশ্য নেই, কোথাও যা আছে তা নামমাত্র, কোথাও বা এমনও হয়েছে— যতটা সাদৃশ্য দিতে চেয়েছেন চিত্রকর ততটা দেওয়া যায় নি। সাদৃশ্য-পরিহারের প্রয়াস নেই, আর সাদৃশ্য-আরোপের চেষ্টাতেও রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট চিত্রের উদ্ভব নয়। সাদৃশ্যভাবনা-হীন ছন্দের অব্যর্থ গতিতে ও আকারের অনিন্দ্য স্থাপত্যে রবীন্দ্র-চিত্রকলার বিশেষ উৎকর্ষ। এই সৃষ্টিতে প্রথম দিকে বিশেষ করে ছিল ছন্দ, পরে বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছে অঙ্গন্যাস বা নির্মাণ। যা ছিল গতিশীল তাই হয়েছে সংহত, স্থাণু, রূপকলা হিসাবে উভয়ই বিস্ময়জনক। সাদৃশ্য এগুলির কোনো স্থলেই বিশেষ গুণ বলা যায় না।

'বেণুবনচ্ছায়াঘন সন্ধ্যায় তোমার ছবি দূরে
মিলাইবে বাঁশরির সর্বশেষ সুরে'

পূরবীর পৃষ্ঠায় এই রচনা বক্ষে ধরে আছে যে ছবি সে কোনো অরণ্যের প্রতিচ্ছবি নয়, কিন্তু কালোর গহনে পুঞ্জ পুঞ্জ আলোককণিকার সচকিত সমাবেশে অরণ্যের কল্পরূপ বা স্বরূপ বলে মনে হয় সহজেই। পাণ্ডুলিপির ক্রোড়বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র সৃষ্টিক্ষেত্রে এমন জীবজন্তু, এমন গাছ-পাহাড় বাড়ি-ঘর আছে অগণ্য, যা বিশ্ববিধাতা বা মানুষ নির্মাতা আজও কোথাও রচনা করে নি। তবু তা সত্য হয়েছে ছন্দোবন্ধনে, কারণ ছন্দই রূপরচনার প্রাণ। আমাদের জানা ভাষায় কথা না কইতে পারে, আমাদের চেনাশোনা পরিচয়ে না দিক ধরা, প্রত্যেকটি তবু জেগে উঠেছে সৃষ্টির সেই আদিম মন্ত্রে: অয়মহং ভোঃ! 'এইযে আমি'। তাদের প্রত্যক্ষতাকে অস্বীকারের কোনো পথ নেই। মানুষের মূর্তি ও মুখচ্ছবি তাও রচনা করেছেন কবি; সে-সবই যেন স্বপ্নে দেখা। বিশেষ ব্যক্তি বা বিশেষ মুখ নয়, বিশেষ প্রকৃতির বিশেষত্বটাই অতিকৃত বা ঊনকৃত রূপে ভাষাশূন্য ভয় বিস্ময় সুখ— চেতনার প্রথম উন্মেষ ও আকৃতি— ফিরে ফিরে কত ভাবেই যেন জাগাতে চায়।

রবীন্দ্র-চিত্রকলার বিশিষ্ট গুণ কল্পরূপের ছন্দ, রেখাজালের নিবিড় বুনুনি, কালোয় আলোর অপূর্ব সমাবেশ। বর্ণের ব্যঞ্জনা ও বাহার রবীন্দ্র-চিত্রে অল্প নয়— প্রচুর ও অসাধারণ। সেও কিন্তু সাদৃশ্যমুক্ত, অর্থাৎ প্রাকৃতিক বর্ণবিন্যাসের কোনো অনুকৃতি সেখানে নেই। কালোর বিভিন্ন পর্দায় চঞ্চল চলিষ্ণু আলো মুহুর্মুহু বেজে বেজে উঠছে, এই তার যথার্থ তাৎপর্য। অন্ধকারে আলোকের ছটা। সুপ্তির গহনে চেতনার জাগরণ। যেমন রূপের তেমনি এই রঙেরও ভাষা অপরিস্ফুট, সীমা অস্পষ্ট, আবেগ ও প্রাণশক্তি প্রচুর, ব্যঞ্জনা কী বিস্ময়কর!

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বহু শিল্পপদ্ধতির রসিক সমজদার হয়েও আপন রচনায় কোনো প্রথা কোনো পদ্ধতিই গ্রহণ করেন নি কবি। তেমনি, রবীন্দ্রনাথের চিত্রকর্ম থেকেও আজ পর্যন্ত কোনো পদ্ধতির প্রবর্তন হয় নি। এই সৃষ্টির ক্ষেত্রে তিনি আত্মআবিষ্ট ও একা। এই অনন্যতাগুণেই অবনীন্দ্রনাথ গগনেন্দ্রনাথ নন্দলাল এই তিন নামের সঙ্গে তাঁর নামও প্রদীপ্ত অক্ষরে লেখা রইল ভারতীয় চিত্রকলার নিত্যকালীন ইতিহাসে।

কলিকাতা
২৫ বৈশাখ ১৩৫৮

শিল্পিত নেপাল

কবি বলেছেন, রাজ্য-সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের কালে মহাকালের তিমিরপট-সদৃশ মহাকাশে তারার অক্ষরে কোনো নূতন লেখা উদ্ভাসিত হতে দেখা যায় না, প্রকৃতি কোনো কথা কয় না। তা ব'লে আকাশে বা পৃথিবীতে পাঠোদ্ধারযোগ্য কোনো লেখাই লেখা নেই, যদি বা থাকে সে যে প্রত্নতাত্ত্বিকদের আলোচ্য বিস্মৃত ভাষার বিমূঢ় অক্ষরপংক্তির মতো ধাবমান জীবন্ত বর্তমানে নিরর্থক— এমনও নয়। প্রকৃতি কথা কয়, দিনে রাত্রে সব সময়েই কথা কয়, প্রকৃতির সে বাণী চিরপুরাতন বলেই চিরনূতন এবং প্রধানতঃ রূপময়। অর্থাৎ, প্রকৃতিকে যদি কবি বলা যায়, 'রূপক' কাব্যেই তাঁর বিশেষ বিলাস। সেই তাঁর রূপক কাব্যের ভাষান্তর-সাধন করেন কবি কথা দিয়ে, সুর দিয়ে। আর, চিত্রকর বা ভাস্কর যিনি তিনি ঐ রূপের প্রতিবিম্ব ধরেন আপন হৃদয়দর্পণে— দু-শো পাঁচ-শো অথবা পাঁচ-হাজার টাকা দামের ক্যামেরায় নয়, তা হলে তো কোনো ভাবনাই থাকত না।

রাজ্য-সাম্রাজ্যের রক্তক্ষয়কর সংগ্রামের মুহূর্তে আকাশ পৃথিবী থাকে নির্বিকার, নিরুৎসুক। কিন্তু, আনন্দবেদনায় উদ্‌বেল হৃদয় নিয়ে, নিরাসক্তিস্বচ্ছ দৃষ্টি নিয়ে, যথার্থ অনুরাগ নিয়ে, কবি বা আর্টিস্ট্ যখনই চেয়ে দেখে তখনই সমস্ত চরাচর স্পন্দিত, ক্রন্দিত, বাণীময়, ব্যঞ্জনাময় হয়ে ওঠে। তাই কবি আর আর্টিস্ট্‌দের দেবদূত বলা চলে, দেবভাষানিবদ্ধ বার্তা তিনি মানুষের গোচর করেন। যথার্থ রাজদূতও বলা চলে ; কারণ, মানুষের মধ্যে বিভিন্ন রাষ্ট্র, বিভিন্ন সংস্কৃতি, বিভিন্ন ভাষা, এ-সবের দুর্গম বাধা লঙ্ঘন করে এক সার্বজনীন ভাষায় তাঁরা দূরকে নিকট ও পরকে আপন করেন, জাতির সঙ্গে জাতিকে চিরন্তন আত্মীয়তাসূত্রে গ্রথিত করেন।

এই রাজদৌত্যের কাজে আর্টিস্ট্‌দের একটি বিশেষ সুবিধা এই যে— তাঁদের ভাষা সকলেই সহজে বোঝে। অথবা হয়তো বলা উচিত ছিল, ভুল শিক্ষায় ও ভুল সংস্কারে চিত্তের সহজ ভাবটি নষ্ট না হয়ে থাকলে সকলেরই সহজে বোঝা উচিত। সে দিক দিয়ে অনেক সময় শিক্ষিত হওয়ার চেয়ে অশিক্ষিত থাকাই ভালো— গ্রামবাসী শ্রমিক চাষীর মতো, শিশুর মতো।

কিন্তু, সর্বগ্রাসী সভ্যতার সর্বনাশা আকর্ষণ উপেক্ষা করে সহজ থাকাও বড়ো মুশকিল, কবিতা লেখা বা ছবি আঁকাও বড়ো বিড়ম্বনা, তেমনি সে লেখা বা সেই আঁকিবুঁকি বোঝাও অতি দুরূহ যখন চারি চক্ষে মিলনের লগ্ন খুঁজতে হয় পাঁজিপুঁথিতে, আর খুঁজে তো পাওয়াই দায়।

কোনারকের পথে

শ্রী রামকিঙ্কর বেইজ

তবু কবিতা লেখা হচ্ছে, ছবি আঁকা হচ্ছে, এবং সে জিনিস বোধে ও বুদ্ধিতে গ্রহণ করবার দায় রয়েইছে যদি মানুষকে বাঁচতে হয়, কেবল অন্নে না, অমৃতে। সহজে যদি নাই হয়, সাধনাতেও হওয়া চাই।

কাজেই ব্যস্ততাতাড়িত কোলকাতা শহরের এক টেরে কেবল মাত্র চারজন আর্টিস্ট্ মিলে যে ক্ষুদ্র একটি শিল্পপ্রদর্শনী সাজিয়েছেন সে ঘটনা তুচ্ছ নয়, বা সে প্রসঙ্গে এত কথা বলাও বাহুল্য না হতে পারে।

এই প্রদর্শনীর বিষয়— নেপালের অরণ্যপর্বত আর নেপালের জীবনযাত্রা। হিমমৌলি গিরিরাজের অঙ্কশায়ী নেপালের সঙ্গে ভারতের, বিশেষ ক'রে বাঙলার, সাংস্কৃতিক যোগ দূর ইতিহাসের বিস্মৃতকাল থেকে। অথচ যোগ যে ছিল সে স্মৃতিও আজ ঐতিহাসিক বা প্রত্নতাত্ত্বিকদের অধ্যয়ন অধ্যাপনার বিষয়। আজও মুষ্টিমেয় ভারতবাসী সেখানে চাকরির চেষ্টায় বা ব্যাবসার খাতিরে যাওয়া-আসা করেন সত্য, কিন্তু নেপালের মন ও নেপালের মর্ম তাঁদের কাছে ব্রাহ্মীলিপিতে-লেখা বা চিত্রলিপিতে-ক্ষোদিত শিলালেখের মতোই দুর্বোধ এবং নিরর্থক। হয়তো কয়েক শতাব্দী পরে এই প্রথম, বাঙলার চারজন আর্টিস্ট্ সেখানে গেছেন ও নেপালের সঙ্গে বাঙলার তথা ভারতের হার্দ সংযোগের নূতন সূত্রপাত করেছেন। তাঁদের চেষ্টা, তাঁদের সাধনা উত্তরোত্তর অধিকভাবে ফলপ্রসূ হবে— নূতন নূতন আর্টিস্ট্, তথা কবি ও সাহিত্যিক, তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে নেপালকে আমাদের নিকটে ও আমাদের নেপালের নিকট ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত করে তুলবেন —এই আমাদের আশা, আর আকাঙ্ক্ষাও বটে। ভারতীয় প্রাচীন সংস্কৃতির অনেক দিকের অনেক রূপ যা এ দেশের শহর থেকে তো বটেই, হয় তো গ্রামাঞ্চল থেকেও নষ্ট হয়ে গেছে বা অতি দ্রুত বিকার ও বিনাশের মুখেই আছে, তার জীবন্ত পরিচয় আজও নেপালে রয়েছে। সাম্যবাদ আসুক— ধনী-দরিদ্রের, 'শিক্ষিত'-অশিক্ষিতের, নিরতিশয় ভেদ দূর হোক বা সহনের সীমার মধ্যেই আসুক— এ আকাঙ্ক্ষা সহস্র সহস্র মানুষের মনে। কিন্তু অনিবার্য বিপ্লবের মুখে 'কালাতিক্রম'দোষে অতীতের যা-কিছু মন্দ তারই সঙ্গে যা-কিছু ভালো তাও যেন নষ্ট না হয়, এ চিন্তাও স্বাভাবিক। সেই অতীতকে, ভারতের বা প্রাচ্যের অতীতকে, অনেকটা জীবন্ত-ভাবে নেপালে দেখা যাবে, চেনা যাবে।

আলোচ্য প্রদর্শনী যে চারজন শিল্পীর কাজ নিয়ে, তাঁদের মধ্যে বিনোদবিহারী ও রামকিঙ্কর খ্যাতিমান্ ও শক্তিমান্। ঋতেন্দ্র মজুমদার ও লীলা মুখোপাধ্যায় নবীন আগন্তুক, এখনও তাঁদের শিক্ষার কাল। কিন্তু যেহেতু আর্টে সাধনা আর সিদ্ধি পদে পদে, পথে পথে— শেষ একটা কোনো তীর্থ নেই, বিরতি নেই— এই নবীনদের কাজও শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখবার যোগ্য হয়েছে। এঁরা কেবল ছবিই

আঁকেন নি, কাঠে পাথরে ও ধাতু ঢালাই ক'রে মূর্তি বানিয়েছেন। শুনেছি, এই মূর্তিকর্মে তাঁরা স্থানীয় প্রাচীন ও দক্ষ শিল্পীর নিকট শিক্ষার সুযোগ পেয়েছেন। সেই শিক্ষানবিশি তাঁদের একাধিক কারণেই সার্থক। একটি প্রজ্জ্বলন্ত প্রদীপের শিখা থেকে অন্য দীপে শিখা জ্বলে ওঠে। তেমনি আর্টের শিক্ষা। পূর্বাপর-প্রচলিত ধারার একটি বিশেষ সার্থকতা আছে। আর্ট্ স্বরূপতঃ সার্বজনীন হলেও, রূপতঃ বিশেষ দেশের, বিশেষ জাতির। ভারতীয় মূর্তিশিল্পেরও অবিস্মরণীয় ও অতুলনীয় একটি বৈশিষ্ট্য আছে— রোদ্যাঁ বা বুর্দেলো, এপ্‌স্টীন বা হেন্‌রি মূর, এঁরা যত বড়োই শিল্পী হোন এঁদের অনুকরণ করতে চেষ্টা করে এ দেশের শিল্পীর ইতোনষ্ট স্ততোভ্রষ্ট হবার সম্ভাবনা আছে। ভারতীয় ভাস্কর্যে যে-একটা অবিচলতা সংযম ও পরিমিতি সর্বত্রই দেখা যায়, যা তার বিশেষ চারিত্র বলা চলে, তার পরিচয় এই নবীন শিল্পীদের প্রথাগত কাজে শুধু নয়, মৌলিক কাজেও লক্ষ্য করা যায়। এ দিক দিয়ে ঋতেন্দ্রের ঢালাই করা তুটি মূর্তি বিশেষ ভালো হয়েছে। বিশেষ উপকরণের বিশেষ যে বাধা, যে অনমনীয়তা, তা শাপ নয়, বর বলতে হবে ; আকারের ভাবে ও ভঙ্গীতে উচ্ছৃঙ্খলতার অবকাশ ঘটে নি।

শিল্পী বিনোদবিহারী ও রামকিঙ্কর শিল্পী ও সমজ্‌দার -সমাজে পরিচিত বলেই মনে করি। অবশ্য, তাঁরা কোনো গোষ্ঠীতে পড়েন কি না সন্দেহ। কোনো coterieতে বা কুটুরীতে জানলা দরজা বন্ধ ক'রে দল পাকিয়েছেন বলে শুনি নি। যথার্থ আর্টিস্টের কোনো দল নেই। সাধনা তাঁদের একা একা। তাঁদের যে শ্রেণীবিভাগ বা গাঁইগোত্রের মেল-বন্ধন তা হবে দূরকালের পরিপ্রেক্ষিতে।

বিনোদবিহারী এবং রামকিঙ্কর এঁদের তুজনের দৃষ্টি তুরকম। কাজেই এঁদের রূপাভিসারও স্বতন্ত্র বা বিশিষ্ট।

রামকিঙ্করের অল্প যে-কখানি কাজ এই প্রদর্শনীতে দেখানো হয়েছে তার প্রত্যেকটি যেন জীবনের চলচ্চিত্রের আশ্চর্য সুন্দর ছাপ, বিচিত্রবর্ণক্ষর তূলির ছাপে ছোপে অতি দ্রুত বন্দী করে ফেলা হয়েছে। রঙের নেশায় রূপ আবিষ্ট। রঙের কুয়াশার মধ্য দিয়ে রূপবিশ্বের দিগ্‌দিগন্ত যেন আভাসে দেখা যাচ্ছে। অস্পষ্টতা-বিদারী শাণিত সূর্যকরে ছিন্ন হয়ে ক্ষণে ক্ষণে চমকে উঠে পুনর্বার যেন সুদূর রহস্যের মূর্তি ধরে মোনালিসার হাসি হাসছে। ধরেও ধরা যাচ্ছে না।

এই প্রদর্শনীতে বিনোদবিহারীর রঙিন এবং কলমের-আঁচড়ে-আঁকা ছবি ও কার্ড্ অনেকগুলি। বিনোদবিহারীর দৃষ্টি ও সৃষ্টির বিষয়— রূপের গড়ন। এবং সেই গড়ন ফুটিয়ে তোলবার, গড়ে তোলবার, প্রধান উপায় ও অবলম্বন হল দৃঢ়, অব্যর্থ, অথচ সাবলীল রেখা, কালো কালীর রেখা— ইস্পাতের পাতের কিনারার মতো— কোথাও তার মর্চে-ধরা নয়— কোথাও তার আড়ষ্টতা

নেই, জড়তা নেই, দ্বিধা নেই। তিনি যে-সব রঙিন ছবি এঁকেছেন তাও এই রেখার বেষ্টনে সুস্থির, সুসীম। সুস্থির বলে অনড় নয়, গতির মুখেই যেন মন্ত্রস্তব্ধ, তাই মনে হয় এই বুঝি নড়ে উঠবে। কত অল্প রেখায় ও আরও কত অল্প রঙে তিনি নেপালের অরণ্য-পর্বতকে কথা কইয়েছেন, অপরিচিত কিন্তু চিরপরিচিত নেপালের বিচিত্র লোকযাত্রা এবং জীবনযাত্রাকে আমাদের চোখের সম্মুখে হাজির করেছেন, সে এক আশ্চর্যের বিষয়। বিনোদবিহারীর চিত্র-কর্মে যেমন প্রচুরভাবে আছে প্রকৃতি, অর্থাৎ গাছপালা, পাহাড় আকাশ মেঘ, তেমনি প্রচুরতা দেখা যায় মানবজীবনের— সেখানে বিষয়ের বাছ-বিচার নেই। তাঁর শিল্প ভাবে নয়, ভঙ্গীতে কথা কয়; রঙে নয়, রেখায়, রেখাবদ্ধ গড়নে। কিন্তু বর্তমান প্রদর্শনীতে দেখে আশ্চর্যান্বিত হচ্ছি ও খুশি হচ্ছি যে, বর্ণবীণাতেও তিনি অতিশয় সূক্ষ্ম তান লাগিয়ে আলাপ করতে পারেন; রেখার আশ্রয় ছেড়ে দিয়েও রূপ হারিয়ে যায় না, ডুবে যায় না। এ দিক দিয়ে দু-তিনখানি চিত্র শিল্পীর নূতন পরিচয় বহন করছে। আশা করি এটা সূচনাই, এই জাতের আরও কাজ তাঁর তূলি থেকে প্রসূত হবে।

পৌষ ১৩৫৬

চিত্র ও মূর্তি -প্রদর্শনী-উপলক্ষ্যে লিখিত।

বাঙলার পল্লীচিত্র

কাব্য ও কথা -সাহিত্যের যতটা আদর বা আলোচনা এ দেশে আছে, চিত্র ও মূর্তি -কলার তেমন নাই। শেষোক্ত ক্ষেত্রে স্রষ্টার সংখ্যা বা সৃষ্টির পরিমাণ অল্প, এ কথায় আমাদের জাতীয় অসাড়তার যথেষ্ট কৈফিয়ৎ হয় না। অবনীন্দ্রনাথের অভ্যুদয়কাল হতে উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি যে হয় নি বা তার পরিমাণ যে নিতান্ত কম, তা বলা যায় না। কিন্তু বাঙালী যে পরিবেশে শৈশব থেকে বেড়ে ওঠে, যে শিক্ষা পায়, তাতে কলাচর্চার স্থান বড়ো একটা নাই; তাই জাতি হিসাবে নানা চারু ও কারু -কলার সমজ্‌দারিতে আমরা আজও কত পিছনে আছি। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিপর্যয়ের ফলে সমস্ত-সমাজ-ব্যাপী যে সংস্কৃতি, যে শিক্ষা, যে রুচি ছিল, তা যেমন নষ্ট হয়ে গিয়েছে (তাকে যথাযথ রাখবার কোনো সম্ভাবনা ও সার্থকতা নাই) অন্য দিকে নূতন সংস্কৃতি, নূতন শিক্ষা ও নূতন রুচি সমাজ-জীবনকে অধিকার করে নি। সমাজবাদের বিতর্ক সকালে খবরের কাগজ খুললেই চোখে খোঁচা মারে এবং মনটাকে সজাগ করে তোলে সে হয়তো ভালোই; কার্যতঃ দেখি সমাজ কেবলই হাজার টুকরা হতে চলেছে, সকল ক্ষেত্রেই মানুষ আপনাকে বা আপনার ছোটো গোষ্ঠীকে বাঁচাতেই প্রাণপণ লড়াই করছে— আর্টের ক্ষেত্রেও ছাড়া-ছাড়া ভাবেই যা-কিছু সৃষ্টি এবং তার উপভোগ। সমস্ত সমাজকে নিয়ে— সমাজের অধিকাংশকে নিয়ে— যেখানে আনন্দের প্রবাহ নাই, জীবনের প্রবাহ নাই, অমৃতের অধিকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্বলে তথা গোষ্ঠীতে সীমাবদ্ধ হতে বসেছে, সেখানে আজও কবি যে কবিতা লেখে, পটুয়া যে ছবি আঁকে, রূপকারী যে নীরস কাঠ কুরে কুরে রূপের আলোছায়ার চমকে রসের অনুভূতি জাগাতে ইচ্ছা করে, তার কারণ আর কিছু নয়—'স্বভাব যায় না মলে'।

একজন নবীন শিল্পীর কয়েকখানি কাঠখোদাই ছবির উপরে এতটা ভূমিকা ফাঁদা অনাবশ্যক মনে হতে পারে। কবিতা বা গল্প আলোচনা করতে বসে বাগ্‌-বিস্তারের এবং তারই ফলে কিছু একটা ভাব বা তত্ত্ব পাঠকের প্রত্যক্ষে আনবার যে সুযোগ হয়তো থাকে, এ ক্ষেত্রে তাও নাই। কথা দিয়ে তো ছবি বুঝানো যাবে না।

তবে, চিত্রকলার চর্চায় মানস সংস্কৃতির মান-উন্নয়নের যে অপরিসীম সম্ভাবনা আছে, সে কথাটা আজ আমাদের দেশে সুযোগ হলেই বলা দরকার। চিত্র

বলতেই পোস্টার বা প্রচারচিত্র নয়, সিনেমা বা চলচ্ছবি নয়, এ কথাটা আমাদের ভালোভাবেই জানা দরকার।

ভাবাশিল্পে আমাদের মনটাকে যেমন বিষয় হতে বিষয়ান্তরে, এক ভাব হতে আর-এক ভাবে, এক রস হতে অন্য রসে বা একই রসের নূতন কোন্ ব্যঞ্জনায় চালনা করে— কখনো বা একেবারে অনন্তে, অনির্দেশ্যে উদাস করে— রূপশিল্পে তেমন করে না। আমাদের ছড়ানো মনকে বরং গুটিয়ে আনে; অশান্ত ভাবনাকে শান্ত করে; যা স্বপ্নলোকে আভাসে আবছায়ায় সকল ধরাছোঁওয়ার বাইরে ছিল তাকেই স্থির-প্রসন্ন মূর্তিতে চোখের সমুখে ও মনের সমুখে উপস্থিত করে। শুধু যদি চোখের সমুখেই আনত, তাকে ছবি বলতাম না। তেমনি যদি কেবল স্থির হয়েই থাকত, তা হলেও প্রাণে সাড়া জাগত না। স্থির রূপের রেখায় রেখায় গতির ইঙ্গিত থাকে, আলোছায়ার বিচিত্র সম্মিলনে যেন কোন্ গানের তানে তানে মীড়-মূর্ছনা বাজতে থাকে।

উপস্থিত ছবির বইয়ের আটখানি কাঠ-খোদাই দৃশ্যে সে গুণ প্রচুর পরিমাণেই আছে। অপরাধী যক্ষের মতো, প্রভু-শাপে-গ্রস্ত-মহিমা, লেখক এই শহরে নির্বাসিত। নবমেঘোদয়ে কুটজকুসুমে উদ্‌ধৃত অঞ্জলি রচনা ক'রে, বিচ্ছেদকৃশা, কৃষ্ণা-একাদশীর শশিকলাসদৃশী, কোনো প্রিয়তমার উদ্দেশে বার্তা পাঠাবার কাল কিন্তু অতীত, সময়ও থাকে না— বেকার বসে থাকার চেয়ে দশটা-পাঁচটার একটা চাকরি জোটানো গিয়েছে। কিন্তু তবু তো দৈবের দয়া বলতে হবে, সাদা কাগজে কালো ছাপের এই-সব ছবি বর্ষণোন্মুখ কালো মেঘের মতোই সহসা চোখে পড়ল; সঙ্গে সঙ্গেই দিক্ দিগন্তরের বাধা দূর হয়ে, রসাল-শাল-তাল-খর্জুর-শালিনী, অজয়-কপোতাক্ষ-ভৈরব-ভাগিরথী-শতনরী-হার-শোভিনী, শস্যশ্যামলা বাঙলার দূর-প্রসারিত মাঠ বাট লোকালয়ের মূর্তি যেন অন্তরে ছুটে এল।

এই প্রিয় আর পরিচিত বাঙলার সব দিক দিয়েই আজ কী দুর্দশা সে কথা তুলব না। কারণ, নানা বিপর্যয় বিপ্লব পার হয়েও, এই ছবিতে যেমন দেখছি, জেলে মাঝ-নদীতে জাল ফেলবে, শালবনে তালবনে রাখাল গোরু-মোষ চরাবে, শিউলী শীতের সকালে খেজুর গাছ থেকে কলসী নামাবে বা গুড় জ্বাল দেবে, খেয়া-নৌকা নদীর এ পারের লোককে নদীর ও পারের পল্লীতে পৌঁছে দেবে এবং পল্লীবালারা কোমল পদাঘাতে কঠিন কাষ্ঠখণ্ডকে তালে তালে তুলে ফেলে ঢেঁকি-শালে ধান ভানার রীতি হয়তো একেবারেই ত্যাগ করবে না। কে জানে! অন্তত যন্ত্রবাহন পাশ্চাত্য সভ্যতার মন্ত্রণায় একেবারে হতবুদ্ধি হয় নি, মুনাফা-শীকার-বৃত্তির মদে একেবারে বেহুঁশ হয় নি, এরূপ ব্যক্তিমাত্রের মনেই এমন ক্ষীণ আশা, সেকালের স্মৃতি ও সংস্কার সম্পর্কে কিছু মমতা থাকাই স্বাভাবিক। তা ছাড়া,

এ কথা বললেও মিথ্যা বলা হবে না, যে, অতিস্ফীত কোলকাতা শহর হঠাৎ একটা ভূমিকম্পে বা বিপ্লবে বা পরমাণু-বোমার বিস্ফোরণে ধ্বংস হয়ে যেতেও পারে (গেলে, বাঙালীর জাতীয় সংস্কৃতির আসলে কোনো ক্ষতি হবে, না, শেষ পর্যন্ত কল্যাণই হবে তা বলতে পারি না)— কিন্তু এই বন প্রান্তর নদ নদী আকাশ এগুলি শীঘ্র লুপ্ত হবে না ; গিরিরাজ হিমালয় পায়ে পায়ে এগিয়ে আসতে আসতে আরও কয়েক লক্ষ বৎসর অনায়াসে কেটে যাবে।

সেই বাঙলার রূপ'কে আলোছায়ার রসে সিঞ্চিত ও ভালো লাগার মাধুরীতে সঞ্জীবিত করে শিল্পী যে আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন এজন্য আমরা তাঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞ রইলাম।

এ দেশে পুঁথিচিত্রণের কাজে কাঠ-খোদাইয়ের প্রচলন হয়েছে বহুদিন পূর্বে। দাক্ষিণাত্যে ছাপা পুরোনো বইয়ের পুরোনো ছবি বা আমাদেরই ঘরের পাশে বটতলা-পুঁথির পুরাতন ছবি— তারই উৎকৃষ্ট নিদর্শনগুলির নিরিখে দেখি, সেগুলি ভালো নক্সা, আলঙ্কারিক রীতির চমৎকার কাজ, লেখাপড়ায় অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত কারিগরের সৃষ্টি। আধুনিক শিক্ষিত আর্টিস্টের কাজে ঠিক সেই রীতির বা সেই-গুণের প্রত্যাশা করা উচিত হবে না। (আলঙ্কারিক রীতির কাজও কেউ কেউ করেন না এবং উপযুক্ত প্রতিভা থাকলে আজও যে সার্থক রচনা হতে পারে না, এমন অবশ্য বলি না।) রঙ তূলি দিয়ে যে দৃশ্য আঁকা যেত, শিল্পী তাই সাদার উপর কালো মেলে দিয়ে আমাদের গোচর করেছেন। মাধ্যমের ভিন্নতায় আস্বাদের ভিন্নতা হয়েছে। এ কথা সকলেই জানেন, চীনা চিত্রকরেরা যে কালো কালীর কাজ করেন তা অল্প প্রতিভায় বা অনায়াসে হবার নয়। নানা বর্ণের সমাবেশে ও সমন্বয়ে যে চমৎকারের সৃষ্টি সম্ভব হয়, একই কালো কালীর টানে-টোনে, অর্থাৎ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তানে, তারই প্রতীতি জাগিয়ে দেওয়া সার্থক চিত্রবিদ্যা কেন, জাদুবিদ্যাই বলা চলতে পারে। কাঠ-খোদাই কাজে অনুরূপ স্পষ্ট টোনের সম্ভাবনা নাই। একই কালো'কে গাঢ় অতিগাঢ়, ফিকা আরো-ফিকা, নানা বিচিত্র পর্দায় ব্যবহার করা যায় না। সুতরাং সূক্ষ্মতার ও সৌকুমার্যের অবকাশ অনেক কম বলতে হবে। তা ছাড়া, তূলি আর ছেদনী, কাগজ আর কাঠ, অভিন্ন নয় ব'লেই, উভয়ে একই প্রকার সাবলীল সাহস বেগ বা বিস্তার আশাতীত। তা হোক, তবু একমাত্র সাদা-কালোর বিচিত্র সমাবেশে সব কথা বুঝাতে হয় ব'লেই এ ছবিতে অন্য একপ্রকার বিস্ময় যথেষ্ট আছে এবং দক্ষতাও অল্প হলে চলে না। তিন আয়তনের বস্তুকে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ এই দুই আয়তনে দেখাতে হয় ব'লেই অনেক প্রাচ্য চিত্রে যেমন কতকগুলি বিশেষ গুণ আছে— তন্মধ্যে একটা হল এই যে, অনেকটাই ইশারায় কথা বলতে হয়, আর বলতে পারলে সুস্পষ্ট বাচনের তুলনায় বেশি বৈ

কম সুন্দর হয় না। স্থির চাহনির তুলনায় যেমন চকিত কটাক্ষ সুন্দর। তেমনি বলা চলে, বিচিত্রবর্ণের এই বিশ্বদৃশ্যকে সাদার বুকে কেবলমাত্র কালো রঙে ফুটিয়ে তুলতে হলেও বিশেষ একটি আভাসের ভাষা জানা চাই— যতটা চোখে আসছে তার অনেক বেশি যাতে মনে আসে, শিল্পী ও রসিক উভয়েরই তেমন ইঙ্গিতজ্ঞ হওয়া প্রয়োজন।

সাদা-কালোর এই-জাতীয় বাস্তবচিত্রের আবার দুই কোটি আছে— এক আলোতে কালো ধরে দেখানো, আর-এক কালোর ভিতরে আলোর চমক— আলোর ইশারা— আলোর উঁকিঝুঁকি। কারও কারও বা ঝোঁক থাকে এই দ্বিতীয় প্রকারের কাজে। কোন্ প্রকার কাজ ভালো, কোন্ কাজই বা চিত্রগুণে ঈষৎ ন্যূন— এরূপ বিচার সম্ভবতঃ অর্থহীন। সবটাই রুচির কথা। তবু উল্লেখ করা যেতে পারে, দ্বিতীয় প্রকারের কাজেই বর্তমান শিল্পীর অনুরাগ বেশি দেখা যায়, বর্তমান লেখকেরও বটে। বিখ্যাত চিত্রস্রষ্টা রেম্‌ব্রান্ট্ যদিও রঙ দিয়ে ছবি এঁকেছেন, তবু তাঁরও ওই একই আলো-আঁধারি মায়া- সৃজনের দিকে ঝোঁক ছিল, আর সেই মায়াতে মুগ্ধ হয়েই তা থেকে চোখ ফেরানো যায় না। (বলা বাহুল্য, উক্ত অমরকীর্তি শিল্পীর কাজ ও অখ্যাতনামা বাঙালী শিল্পীর কাজের মধ্যে কোনো সর্বাঙ্গীণ তুলনা হয় না।) আমাদের আলবামে চতুর্থ ছবিখানি এই-জাতীয় রচনার একটি সুন্দর নিদর্শন। নদী আর আকাশ সব মিলিয়ে একটি নিকষকৃষ্ণ পট; কয়েকটি আলোকবিন্দুর চলস্ফুরণে, স্পন্দনে, শিল্পী ঊর্ধ্বে অদৃশ্য চন্দ্রলেখা আর নিম্নে অবিচ্ছিন্নগতি বারিরাশি উভয়ই সুন্দর বুঝিয়েছেন। সপ্তম চিত্রে, কাঠের বোঝা মাথায় যে সাঁওতাল মেয়েরা চলেছে তাদের পা-ফেলা পা-তোলা যেন চোখে দেখা যায়। অল্পক্ষণের মধ্যে তারা সকলেই চলে গেলে, মনে হয়, এই চিত্রের এক দিক হতে অন্য দিক পর্যন্ত প্রসারিত ওই শৈলমালা আর এই শাল-সেগুন গাছ দুটি, এরাই শুধু নিশ্বাস রোধ করে ধূ-ধূ-দ্বিপ্রহরের সাবিত্রীমন্ত্র জপ করতে থাকবে।

কিন্তু কথা দিয়ে ছবি ফোটানো যায় না, তার প্রয়োজনও দেখি না। কাজগুলি আমাদের ভালো লেগেছে। এগুলির মধ্যে যথেষ্ট তারুণ্য ও সজীবতা আছে, শিল্পীর দূরব্যাপী সার্থকতার প্রচুর সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে। কবিতা নয় যে পরিশ্রমপূর্বক পড়ে পড়ে অর্থবোধ করতে হবে— প্রবন্ধ নয় যে অকালে নিদ্রাকর্ষণ ব্যতীত অন্য উপযোগিতা নেই— অসাধারণ মলাটে প্রচ্ছাদিত অতিসাধারণ গল্প উপন্যাস নয় যে, হয় রাজনৈতিক প্রচার নয় বাস্তবজীবনের অনুচ্চারিত হাহাকার আর নয়তো, বেশির ভাগ যা আশা করা যায়, বাড়ি আর গাড়ি আর অবাস্তব প্রেমস্বপ্ন এই বাঁধা বিষয়ের একঘেয়ে পুনরাবর্তন বিরক্তিকর হয়ে উঠবে— ছবির

একটি সুবিধা আছে এই যে, তার দিকে শুধু একবার ভালো করে চেয়ে দেখলেই চলবে। অবশ্য, ভালো ক'রে চাইতেও যে সকলেই জানেন তা নয়। তবু, কিছু শিক্ষার দ্বারা, কিছু চর্চার দ্বারা, আর কিছু বা সহজাত শক্তির গুণে, একবার রূপ দেখবার চোখ খুলে গেলে যেমন বাহিরে, তেমনি ঘরে বসেও, নয়নের আনন্দ আর মনের আরাম -দায়ক কত-কিছুর আত্মীয়তা-লাভেই যে জীবন ধন্য হবে। এ দিয়ে, এমন-কি, দিনশেষে কর্মক্লান্ত, শহরবাসী চাকুরিজীবীর ক্লান্তিও দূর হতে পারবে। সমস্ত আকাশ পৃথিবী যে কথা বলছে, কবি যে কথা বলছেন, চিত্রকর যে কথা বলেন, আমরাও সেই কথাই বলতে চাই: হে মানুষ, তুমি দেখো! চেয়ো দেখো!

পৌষ ১৩৫৭

মূলতঃ শিল্পী শ্রীহরেন দাসের কাঠ-খোদাই ছবির সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখিত।

দিবা দ্বিপ্রহর

শ্রীনন্দলাল বসু

ছাগল-ছানা

শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

চাঁদনী রাত

শ্রীনন্দলাল বসু
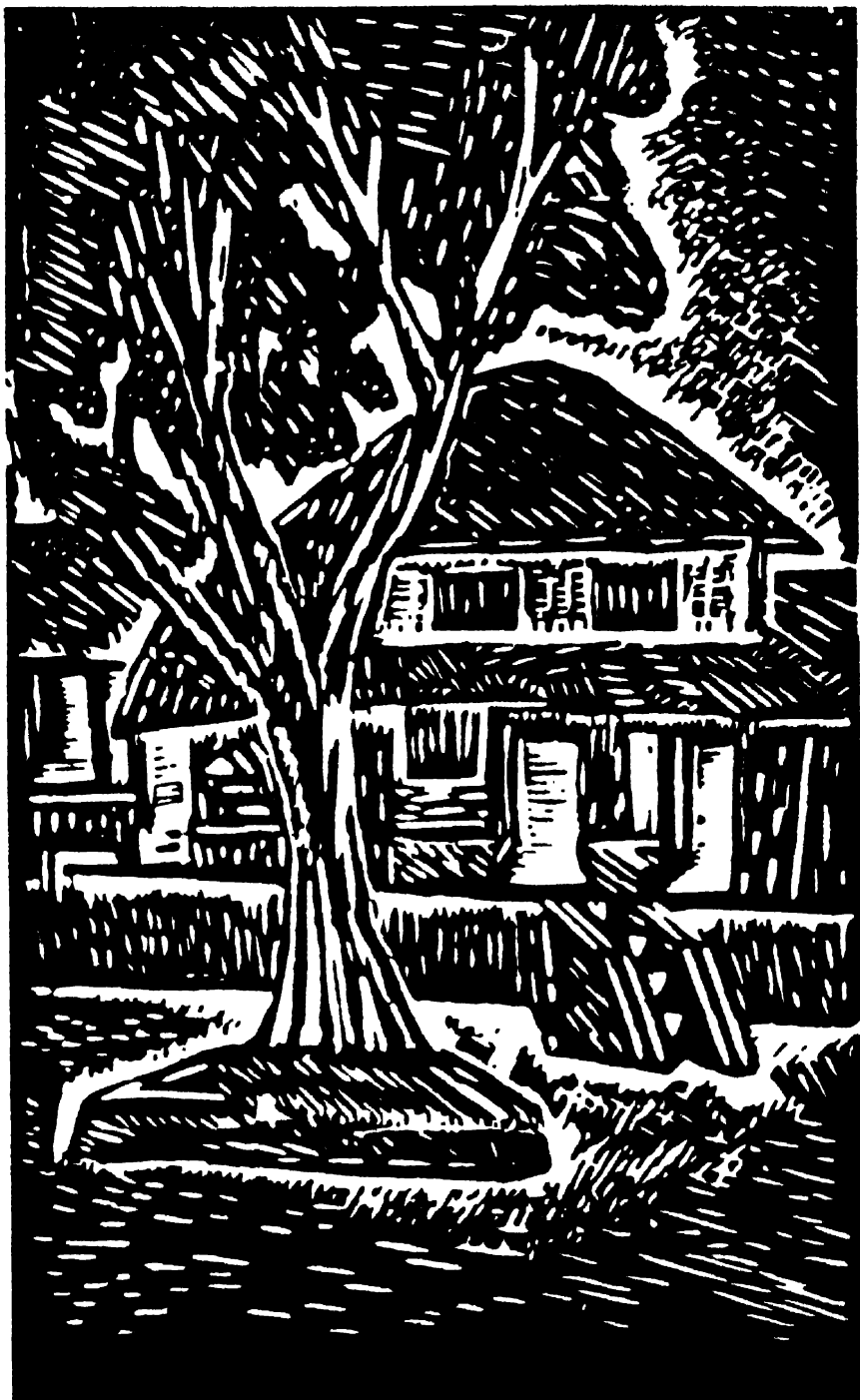
চিত্রসূত্রাবলী

দেবভাষানিবদ্ধ কাব্যে নাটকে ও দর্শনে ভারতীয় প্রাচীন চিত্রকলার অস্তিত্বের ও উৎকর্ষের সম্পর্কে অনেক কথাই জানা যায়। কাব্যে নাটকে জানতে পারি, চিত্রবিদ্যা কেবল যে বিশেষ শিল্পী বা কারু -গোষ্ঠীর অধিগত ছিল এমন নয়, নর-নারী-নির্বিশেষে অভিজাতকুল, রাজা ও রাজন্যবর্গ, এঁরাও ওই বিদ্যার যথেষ্ট চর্চা করতেন। বাৎস্যায়ন-প্রণীত কামসূত্রে স্পষ্টই বলা হয়েছে, পরিশীলিতরুচি নাগরিকের শয়নাসনকক্ষে কেবল যে চিত্র থাকবে এমন নয়, চিত্রকর্মের উপযোগী রঙ তূলি প্রভৃতিও থাকবে— কেননা, সজ্জন নাগরিকের বিশেষ অনুশীলনের যোগ্য যে চতুঃষষ্টিকলা তারই শিরোধার্য হয়ে রয়েছে চারটি গান্ধর্বী কলা, আলেখ্য তারই অন্যতম।

কামসূত্রের অন্যতম টীকাকারের কল্যাণেই চিত্রের ষড়ঙ্গ সম্পর্কে সুবিখ্যাত শ্লোকটি পাওয়া গিয়েছে। বিভিন্ন দর্শনশাস্ত্রে বা দার্শনিক আলোচনায় চিত্র সম্পর্কে নানা সারগর্ভ এবং গূঢ়ার্থদ্যোতক উক্তি পাওয়া যাবে তাতে আর আশ্চর্য কী। সাংখ্যদর্শন-অনুযায়ী— 'আশ্রয়ব্যতীত যেমন চিত্রের অবস্থান হয় না, সাকার-উপাসনায় চিত্র একটি প্রধান অঙ্গ'।[১] বেদান্তপ্রতিপাদক পঞ্চদশী গ্রন্থে একটি অধ্যায়ের নাম 'চিত্রদীপ', সে স্থলে এই কলাবিদ্যা সম্পর্কে প্রসঙ্গক্রমে যা জানা যায় সে আমরা পরে উদ্‌ধৃত করব।

চিত্রবিদ্যার করণ উপকরণ প্রকরণ নিয়ে, স্থান কাল পাত্র -অনুসারে বিশেষ চিত্রের বিশেষ উপযোগিতা বা অনুপযোগিতা নিয়ে যেমন, তেমনি চিত্রশালা-লক্ষণের প্রসঙ্গ নিয়ে, সংক্ষেপে বা বিস্তারিতভাবে বহু আলোচনা আছে বহু শাস্ত্রে সংহিতায় পুরাণে। তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল— বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণ বা উপপুরাণ, অভিলষিতার্থচিন্তামণি বা মানসোল্লাস -নামক কোষগ্রন্থ, সমরাঙ্গন-সূত্রধার, শ্রীকুমার-বিরচিত শিল্পরত্ন ও নারদশিল্প। এই সব শাস্ত্রে বা গ্রন্থে সাধারণভাবে শিল্প সম্পর্কে আর বিশেষভাবে আলেখ্যলিখন সম্পর্কে যে-সমস্ত তথ্য বা তত্ত্ব পাওয়া যায় সে-সবের সম্পূর্ণ ও সুসংগত তাৎপর্য-উদ্ধার সম্ভব হলে, ভারতীয় চিত্রকলার রীতি প্রকৃতি সম্পর্কে এ কালের আমাদের ধ্যান ও জ্ঞান প্রত্যয়পূর্ণ ও নির্ভরযোগ্য হবে তাতে আর সন্দেহ কী। অথচ, এ কাজের জন্য

১ গিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ: প্রাচীন শিল্পপরিচয় (১৩২৯)

সংস্কৃত ভাষায় যেমন সম্পূর্ণ অধিকার থাকা প্রয়োজন তেমনি শিল্প সম্পর্কে, চিত্র-কলা সম্পর্কে, প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা ব্যবহারিক জ্ঞান সেও অপরিহার্য। সেই সঙ্গে বিভিন্ন শিল্পবিদ্যার ও চিত্রবিদ্যার পরম্পরাধৃত যে অনুশীলন সুবিশাল ভারতভূমির প্রদেশে প্রদেশে (তেমনি ভারতের সমগ্র প্রতিবেশে) বংশানুক্রমে আজও চলে আসছে, যতটা তার অবশিষ্ট আছে, তারও তো বিশেষ জ্ঞান না থাকলে চলবে না। এমনতর দুর্লভ জ্ঞান অভিজ্ঞতা রুচি ও উদ্যমের সম্বলে অথবা বলে বলীয়ান হয়ে যিনি এই বিশেষ ব্রতে সারা জীবন উৎসর্গ করবেন একমাত্র তাঁর কাছেই তো আমরা এ বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান ও আনুপূর্বিক তথ্য, সামঞ্জস্যপূর্ণ সামগ্রিক ধারণা প্রত্যাশা করতে পারি। এখনও সে আমাদের সুদূর প্রত্যাশাই বলতে হবে।

ইতিমধ্যে যাঁরা সৃজনশীল শিল্পী, প্রতিভাবান্, ধীমান্, তাঁদের অভিনিবেশ ও অনুসন্ধানের ফলে খণ্ড খণ্ড ভাবে যা জ্ঞাত বা অনুমিত হয়েছে তারই সযত্ন সমাহারে সমগ্রের একটি রেখাঙ্কিত আভাস এখনই হয়তো কল্পনা করা যায়। সেই তথ্যে সত্যে ও অনুমানে রচিত ধারণায়, প্রত্যক্ষ শিল্পনিদর্শন শাস্ত্রবাক্য ও কিংবদন্তী -সঞ্জাত বোধে, নানা ক্ষুদ্র ভ্রান্তির অবকাশ থাকলেও কালে কালে তার নিরসন হয়েছে বা হতে পারবে।

সংক্ষেপে বলা যায়, ভারতের শাস্ত্রসম্মত আর চিরাচরিত চিত্ররীতির বিস্তারিত আলোচনার অধিকারী আজও কেউ দেখা দিয়েছেন কি না সন্দেহ, কৃৎস্নবিদ্ না থাকাই সম্ভব, আর বর্তমান লেখকের অভিজ্ঞতা এবং অনুশীলন যে অণুপ্রমাণ তাতেও কোনো সন্দেহ অথবা কপট বিনয়ের অবকাশ নেই। অথচ, ঘটনাক্রমে বিষ্ণুধর্মোত্তরের চিত্রসূত্রাবলীতে চোখ বুলোতে হয়েছে, দুর্লভ সৌভাগ্যে শিল্পীগুরু নন্দলালের চিত্ররচনারীতি কাছে থেকে লক্ষ্য করবার সুযোগ হয়েছে, আচার্য নন্দলালের ও অন্য বিশেষজ্ঞজনের মুখে বক্ষ্যমাণ বিষয়ে বহু কথাই শোনা গিয়েছে, তারই ফলে কতকটা অনধিকারী হয়েও 'চিত্রসূত্র'-আলোচনায় আমাদের এই আংশিক বা অসামগ্রিক উদ্যম। বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণের চিত্রসূত্রাবলীই আমাদের বিশেষ আলোচনার বিষয়।

প্রবন্ধান্তরে পূর্বেই উল্লিখিত— শ্রীমতী স্টেলা ক্রাম্‌রীশের অনুমান এই যে, আলোচ্য চিত্রসূত্রাবলীর সংকলন হয়ে থাকবে খৃস্টীয় সপ্তম শতকে, ভারতীয় ধ্রুব-চিত্ররীতির প্রৌঢ় পরিণতির ও বিশেষ উৎকর্ষের সমকালে। তা হোক, সংস্কৃত কাব্যে নাটকে দর্শনে ও শিল্পশাস্ত্রে যে প্রকৃষ্ট কলাবিদ্যার নানা উল্লেখ আর ব্যাখ্যা বিবরণ বিশ্লেষণ পাওয়া যাচ্ছে আসলে সে বহু সহস্র বর্ষের পরম্পরা বেয়েই এসেছে। শিল্পী ও সমজ্‌দার -মহলে বিধিবদ্ধ ধারণার ও পদ্ধতির ক্রমিক উদ্ভব হল কবে, সেও কেউ অসন্দিগ্ধভাবে বলতে পারবেন না। কারণ, অজন্তাগুহার প্রথম যুগের চিত্র-

কৃতিকেও অনেকেই খৃস্টপূর্ব বলে থাকেন— সেও তো আকস্মিক বা অপরিণত নয়। আর, সিন্ধুসভ্যতার উৎখাত কলসের গাত্রে, ঢাক্‌নায়, চার-হাজার পাঁচ-হাজার বৎসরের অতিদূর সীমায় অজ্ঞাত অখ্যাত রূপরসিকের তুলির স্বাক্ষর দীপ্যমান রয়েছে রঙে ও রেখায়। নগর প্রাকার পরিখা ও স্নানভূমি -নির্মাণে, নানা উপাদানে বিবিধ মূর্তি খেলনা আধার ও অলংকার-সৃজনে দক্ষতা যাদের চমৎকারজনক, বিচিত্র-জাতি চিত্র-রচনাতেও তাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বা প্রয়োগদক্ষতা হয় নি এমন কল্পনা করা যায় না। ফলতঃ অচিরস্থায়ী আধারে বা আশ্রয়ে অঙ্কিত হওয়াতেই, মনে হয়, ঐ সুদূর কাল থেকে প্রবাহিত অচ্ছিন্ন ধারার ধারণার উপযোগী সুপ্রচুর আলেখ্যনিদর্শন আমাদের কাল পর্যন্ত এসে পৌঁছয় নি। অপরিজ্ঞাত মহাদেশের বা মহাকালের মুখের উপর থেকে ভালো ক'রে কুহেলী-আবরণ সরে গেল প্রথম বুঝি অজন্তার প্রচ্ছন্ন গুহাবলীতে।

শাস্ত্রে বা পুরাণে চিত্রবিদ্যার উৎপত্তি নিয়ে যে কাহিনী আছে, প্রচলিত অর্থে ইতিহাসের মর্যাদা না পেলেও, তাৎপর্যের দিক দিয়ে তারও গুরুত্ব অল্প নয়। বিষ্ণু-ধর্মোত্তর-অনুযায়ী মহামুনি নারায়ণ এই বিদ্যার প্রবর্তক। তপোনিরত এই মুনির মনোহরণে স্বর্গ থেকে দিব্যাঙ্গনারা এসে বিচিত্র হাবভাব বিস্তার করাতে, ভগবান্ নারায়ণ উরুদেশে (স্থানান্তরে ও মতান্তরে উর্বীপৃষ্ঠে বা ভূতলে) সহকাররসে এক অলৌকিক রূপলাবণ্যময়ীকে অঙ্কিত ক'রে জীবন দিলেন, হল উর্বশীর সৃষ্টি। ইন্দ্র-দূতীরা অবশ্যই লজ্জা পেলেন। পরে নারায়ণের কাছে এই বিদ্যা শিখে নিলেন বিশ্বকর্মা।

অন্য এক কাহিনীতে আছে— পুণ্যাত্মা ভয়জিতের রাজ্যে ছিল না দুঃখশোক দৈন্য। দৈবক্রমে এক ব্রাহ্মণের পুত্র মারা গেল অকালে। ক্ষুব্ধ ব্রাহ্মণ স্বভাবতঃই রাজাকে এসে অভিযুক্ত করলেন— সত্য-ত্রেতায় এই ছিল রীতি— নিশ্চয় তাঁরই পাপে ব্রাহ্মণের এই নিদারুণ পুত্রশোক। ভয়জিৎ ব্রাহ্মণের এই অহেতুক অপবাদ নতমস্তকে ধারণ ক'রে, প্রেতপতি যমকে আহ্বান ক'রে ঘোরতর যুদ্ধ বাধালেন তাঁর সঙ্গে। প্রলয় ঘটে ঘটে এমন সময়ে ব্রহ্মা এসে বললেন, বৎস, যমের কী দোষ! যার যা কর্মফল সে তাই ভোগ করে। যা হোক, ব্রাহ্মণতনয়ের একটি তুমি আলেখ্য লেখো দেখি, আমি তাতেই প্রাণসঞ্চার করে দিই। সেইমত কার্য হলে ব্রাহ্মণ ফিরে পেলেন তাঁর আত্মজে আর ব্রহ্মা বললেন, রাজন্, আমারই প্রসাদে মনুষ্যসমাজে প্রথম চিত্র অঙ্কন করলে তুমি, বিশ্বকর্মার কাছে গিয়ে এ বিদ্যা সম্যক্ শিখে নিয়ো।

গল্প তো ইতিহাস নয়। (গল্প হিসাবেও, অবশ্য, দুটির মধ্যে মারাত্মক কোনো বিরোধ নেই।) তাৎপর্য এই যে, হিন্দুজাতির ধ্যানে জ্ঞানে সকল বিদ্যার মতোই

চিত্রকলাও আসলে অপৌরুষেয়। মর্তমানুষই এর উদ্ভাবক নয়। বিশেষ কথা এই যে, চিত্রকৃতি, এমন-কি 'প্রতিকৃতি'ও, রচিত হয় নি কোনো প্রাকৃত আদর্শ চোখের সামনে রেখে তারই নকল ক'রে। আদিতম আলেখ্যলিখনে স্মৃতিরও কার্যকারিতা নেই— কেননা, নারায়ণসৃষ্ট উর্বশীর কথা ছেড়ে দিলেও, ভয়জিৎ নৃপতি ব্রাহ্মণবটুকে কখনো চক্ষে দেখেছিলেন এমন মনে হয় না। যা হোক, সাধারণী রূপস্মৃতি, ক্রমে অবশ্য বিশেষ বিশেষ রূপের স্মৃতি, ইচ্ছা ও কল্পনা, এতেই ভারতীয় চিত্রকলার উৎপত্তি। অনাগতের উদ্দীপন বা উদ্ভাবন, অতীতের উজ্জীবন, এর বিশেষ কার্য। নিখিল জীবনের সঙ্গেই অঙ্গাঙ্গী যোগ। পৃথগ্‌ভাবে নন্দনরুচির পরিতৃপ্তিতে বা নাগরিকজনের মানস বিলাসে এর সার্থকতা নয়। সব-শেষ কথাটি এই যে, আগে শিল্পী, পরে কারিগর— আগে সৃষ্টি, পরে প্রকরণ পদ্ধতি— আগে ইচ্ছা ও কল্পনা, পরে অনুশীলন অনুক্রিয়া ও 'অনুকৃতি', ধ্যান ধারণায় মননে যতদূর ও যেমনটি হয়।

গল্পচ্ছলে হলেও এই কয়েকটি শিক্ষা প্রাচীনেরা যদি দিয়ে থাকেন, আর অর্বাচীন কালের আমরা যদি হৃদয়ঙ্গম করে থাকি— সহস্রের মধ্যে একজন হলেও হবে— কল্যাণকর প্রভাব তার অপরিসীম।

চিত্র যে বিশেষভাবে চিত্তেরই আকারধারণ, এ তত্ত্বটি বুদ্ধঘোষের অট্‌ঠশালিনী টীকার আংশিক সংকলনে সুন্দরভাবে বুঝিয়েছেন আচার্য সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। তা ছাড়া পাতঞ্জলসূত্রের উল্লেখ ক'রেও বলেছেন—

চিত্রী যখন চিত্র আঁকেন তাহার পূর্বে চিত্রের বস্তুকে ধ্যানের দ্বারা হৃদয়ে এমন করিয়া গ্রহণ করেন যাহাতে ধ্যাতা ও ধ্যেয়-বিবর্জিতভাবে চিত্ত কেবলমাত্র চিত্রেয় বস্তুর আকারে উদ্ভাসিত হইয়া থাকে। ··· যে চিত্র চিত্রী বাহিরে আঁকিবেন তাহার বিষয়বস্তু কোন দৃষ্ট পুরুষ প্রাণী বা বৃক্ষলতাদি হইতে পারে কিংবা তাহা চিত্রীর মনোগত বা চিন্তিত কোনও ভাব হইতে পারে। শিল্পরত্নে লিখিত আছে—

দেবান্ মনুজান্ বাপি মৃগান্ নাগান্ বিহঙ্গমান্।
লতাবৃক্ষাদিকান্ বাথ নাগান্ বা সাগরানপি।
শ্রোত্রাভ্যাং বাথ নেত্রাভ্যাং মনসা বাথ চিন্তিতান্।
আলিখেৎ কিট্টলেখিন্যা সুমুহূর্তে সুলগ্নকে।
স্বস্থচিত্তঃ সুখাসীনঃ স্মৃত্বা স্মৃত্বা পুনঃ পুনঃ।

··· চিত্রী যাহা কিছু দেখিয়াছেন, যাহা কিছু চিন্তা করিয়াছেন, যাহা কিছু শুনিয়াছেন বারংবার স্মৃতিদ্বারা তাহা চিত্তে দৃঢ় করিয়া সেই দৃঢ়ীভূত চিত্তাবস্থাকে

বাহিরে লেখনীদ্বারা প্রকাশ করিবেন। পুনঃ পুনঃ স্মরণেই সমাধির উৎপত্তি হয়।[২]

মূর্তি চিত্র নৃত্য আতোদ্য এবং গীত পরস্পর কী শৃঙ্খলায় সমন্বিত ও সঞ্চালিত, অথণ্ড মানবজীবনের চতুর্বর্গ -অনুশীলনের সঙ্গেই বা তাদের কী সম্পর্ক, তার কথঞ্চিৎ আভাস পেয়েছি আমরা বজ্র-মার্কণ্ডেয়-সংবাদে এবং অন্যত্র আলোচনা করেছি। বিষ্ণুধর্মোত্তরের কতকগুলি (সব[৩] নয়) চিত্রসূত্রের অর্থগ্রহই উপস্থিত কর্তব্য। তৎপূর্বে পঞ্চদশী গ্রন্থে প্রসঙ্গক্রমে ছবির বিষয় যা বলা হয়েছে সেও

২ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত : ভারতীয় প্রাচীন চিত্রকলা (১৯৪২)

স্থূলাক্ষর আমাদের। বুদ্ধঘোষের ব্যাখ্যানের আলোচনা ও উদ্ধৃতি, পৃ ৯২-৯৭। পাতঞ্জল-সূত্র এবং শিল্পরত্নের উদ্ধৃতি পৃ ১০১-১০৩। কিট্টলেখনী crayon pencil -জাতীয় বস্তু। সেই লেখনী-যোগে শুভক্ষণে শান্তচিত্তে স্মৃতি বা ধ্যান থেকে সমগ্রভাবে গ্রহণ ক'রে যে রূপ অন্তরে আছে তাকেই বাহিরে প্রকাশ করতে বলা হয়েছে। এই বিশেষ প্রক্রিয়ায় দক্ষ লিপিকারের লেখনীচালনারই অনুরূপ একটি সাবলীল স্বচ্ছন্দ ভাব থাকবে, না হলে এ শিল্পসাধনার সিদ্ধি বা সার্থকতায় পৌছুনো যাবে না, তাতে আর সন্দেহ কী। রেখা **লেখার** দ্বারা এই হল আলেখ্যের সূচনা। অতঃপর শিল্পরত্ন বলেন—

এবং স্বস্বোচিতং স্থানং মনসা নিশ্চিত্য বুদ্ধিমান্
লিখেচ্চিত্রগতং ভাবং তথা ব্যাপারমেব চ।
অথ বর্ণানি বিন্যস্য তত্র তত্রোচিত ক্রমাৎ
লেখিন্যা স্থূলয়া মন্দং নিষ্কলঙ্কং মহামতিঃ
তত্র নিম্নোন্নতাদীনি বিশেষানি সমাচরেৎ।

রেখাবিন্যাসের দ্বারা চিত্রিতব্য রূপসমূহের যার যেমন ভঙ্গী ভাব ও ক্রিয়া লিখতে হবে, অতঃপর যেখানে যে রঙটি প্রয়োজন স্থূলতুলিতে ধীরে ধীরে ও পরিচ্ছন্ন ভাবে ভরে দিতে হবে, সবশেষে গড়নের নতোন্নত ভাবের যে বিশেষত্ব সেটিও দেখানো চাই। এ দেশের ধ্রুবচিত্ররীতি বা বিষ্ণুধর্মোত্তর-ব্যাখ্যাত প্রক্রিয়া থেকে কোনো ভিন্নতা নাই।

৩ দেশপ্রচলিত ভাষায় বিভিন্ন অধ্যায় -ধৃত **সমুদয়** চিত্রসূত্রের **সার্থক** ভাবান্তর -সাধনের মাহেন্দ্রলগ্ন কবে আসবে? পাশ্চাত্য বিদ্বৎসমাজে উনবিংশ শতকেই যে গ্রন্থের আবিষ্কার, এ দেশের নানা জনপদে পুঁথি আকারে যা দুর্লভ নয়, মুদ্রিত আকারেও যা ১৯১২ খৃস্টাব্দেই প্রকাশিত হয়েছে, ১৯২৪ খৃস্টাব্দে যার ইংরেজি অনুবাদ প্রচার করেছেন শ্রীমতী স্টেলা ক্রাম্‌রীশ —১৯২৮ খৃস্টাব্দেই পরিবর্ধিত নূতন সংস্করণ— ১৯৫৮ সনেও মূলানুগামী এবং নির্ভরযোগ্য তার কি কোনো বাংলা বা হিন্দি ভাষান্তর রয়েছে? থাকার কোনো প্রয়োজনই নেই? অতীতের ইঙ্গিতেই বর্তমানকে জানা যায় এবং ভবিষ্যৎ লক্ষ্য -নির্ণয়েরও সুবিধা হয়ে থাকে।

সংকলনযোগ্য। 'প্রাচীন শিল্পপরিচয়' গ্রন্থ থেকেই উদ্‌ধৃত করি—

'পঞ্চদশীর চিত্রদীপ প্রকরণে চিত্রের চারিটী অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথমাবস্থা, ধৌত; দ্বিতীয়, ঘট্টিত; তৃতীয়, লাঞ্ছিত; এবং চতুর্থ, রঞ্জিত। পট-চিত্রের আধার বস্ত্রের স্বাভাবিক শুভ্রাবস্থা, ধৌত। উহাতে অন্নবিলেপন অর্থাৎ অন্নমণ্ডের দ্বারা প্রলেপ-দান, ঘট্টিত। তাহাতে মসী, অর্থাৎ কালীর দ্বারা আকার-সম্পাদন, অর্থাৎ পরিমাণসূত্রানুসারে কালীর রেখাপাতের দ্বারা লেখনীয় বিষয়ের আকৃতি-বিন্যাস, লাঞ্ছিত; এবং স্থানানুসারে উপযুক্ত বর্ণবিন্যাসের নাম, রঞ্জিত।[৪] স্মৃতিশাস্ত্রেও··· পঞ্চদশী-কথিত ক্রমেরই আভাস পাওয়া যায়।'

বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণের তৃতীয় খণ্ডে দ্বিতীয় অধ্যায় থেকেই শুরু হয়েছে চিত্র-সূত্রাবলী। প্রসঙ্গক্রমে অন্যান্য বিষয় এলেও ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়ে এসে তবে তার সমাপ্তি। ১৯১২ খৃস্টাব্দে 'শ্রীবেঙ্কটেশ্বর' মুদ্রাযন্ত্র থেকে প্রকাশিত গ্রন্থই আমাদের অবলম্বন। লিপিকারপ্রমাদের বা মুদ্রণাশুদ্ধির বিশেষ অসদ্ভাব নেই। প্রধানতঃ শিল্পী বা কারু -সমাজে বংশানুক্রমে যে শাস্ত্র মুখে মুখে বা পৌনঃপুনিক প্রতিলেখনে প্রচলিত থাকে তাতে এমন না হওয়াই আশ্চর্যের বিষয়। অনুমান হয় যিনি যখনই এরূপ গ্রন্থ সম্পাদন বা সংকলন করেন, কিছু না কিছু সংশোধন করে নিতে বাধ্য হন— বিশেষজ্ঞতার অল্পতায় বা অনবধানে নূতন প্রমাদেরও সৃষ্টি হয়। 'প্রাচীনশিল্পপরিচয়' গ্রন্থে গিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থও স্থানে স্থানে এমন সংশোধন বা পরিবর্তন করেছেন। কোনো বিশেষ পুঁথি তাঁর হাতে এসেছিল কি? মুদ্রিত গ্রন্থের পাঠ আমরাও সর্বত্র যথাযথ গ্রহণ করতে পারি নি; সম্ভবপর পাঠ ও প্রসঙ্গানুরূপ অর্থ -গ্রহণে যত্ন করেছি। আক্ষরিক অনুবাদ যেমন দিই নি, জ্ঞাতসারে শব্দার্থ কোথাও বিকৃত করি নি। পাঠান্তর বা লিপ্যন্তর কল্পনা করতে বাধ্য হয়ে থাকলে, হেতুপ্রদর্শনে আলস্য করি নি। বিষয়জ্ঞান এবং ভাষাজ্ঞান নির্দোষ নয় বলেই নানা ত্রুটি বিচ্যুতি তবুও থাকবে।[৫]

৪ যথা চিত্রপটে দৃষ্টমবস্থানাং চতুষ্টয়ম্
পরমাত্মনি বিজ্ঞেয়ং তথাবস্থাচতুষ্টয়ম্।
যথা ধৌতোৎঘট্টিতশ্চ লাঞ্ছিতো রঞ্জিতঃ পটঃ।
স্বতঃ শুভ্রোঽত্র ধৌতঃ স্যাৎ ঘট্টিতোঽন্নবিলেপনাৎ।
মস্যাকারৈর্লাঞ্ছিতঃ স্যাৎ রঞ্জিতো বর্ণপূরণাৎ॥

৫ যোগ্যতাসম্পন্ন সুধী বা বিশেষবিৎ শীঘ্রই এ বিষয়ে আকৃষ্ট হবেন এই আমাদের আশা। বর্তমান নিবন্ধ-রচনায় আলাপ আলোচনার দ্বারা লেখককে সাহায্য করেছেন অনেকেই, তন্মধ্যে বিশেষভাবে স্মরণীয় হলেন— সতীর্থ শ্রীঅরুণাচল পেরুমল, শ্রীকালিদিণ্ডিমোহন বর্মা,

'চিত্র' প্রবন্ধে ইতিপূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, মার্কণ্ডেয় ঋষি বর্তমান প্রসঙ্গের সূচনাতেই বলেছেন—

°সম্যক্‌ভাবে চিত্রসূত্র না জানা থাকলে কারও পক্ষে প্রতিমালক্ষণ জানা সম্ভবপর নয়।

°নৃত্যশাস্ত্রের আনুকূল্য বিনা চিত্রসূত্রের বোধ দুর্ঘট, যেহেতু নৃত্য এবং চিত্র উভয়েরই করণীয় হল জগতের অনুক্রিয়া।

°আতোদ্যের জ্ঞান যার নেই বৃত্ত* বা ছন্দ তার দুর্জ্ঞেয়, বাদনবিচ্ছিন্ন নৃত্ত* কোথাও দেখা যায় না।

°আর, গীত না হলে বাদ্যও তো জানা যায় না, অতএব যিনি গীতশাস্ত্রবিৎ সবই তিনি জানেন যথাবিধি।

একচত্বারিংশ অধ্যায়ে চিত্রের দোষগুণ জাতি-প্রকৃতির বর্ণনা—

°সত্য বৈনিক নাগর মিশ্র চতুর্বিধ চিত্র হয়ে থাকে, এখন তার লক্ষণ বলি।

°দীর্ঘায়ত সুভূমিক আধারে যৎকিঞ্চিৎ লোকসাদৃশ্যে প্রমাণযুক্ত সুকুমার যে চিত্র তাকে বলা হয় 'সত্য'।

°চতুরস্র ক্ষেত্রে না-দীর্ঘ না-উল্বণাকৃতি প্রমাণ স্থান এবং লম্ব -সমৃদ্ধ সুসম্পূর্ণ যে রূপের লিখন তারই নাম 'বৈনিক'।

°গোলাকার ক্ষেত্রে স্বল্পমাল্যবিভূষণ দৃঢ়োপচিতসর্বাঙ্গ অনুল্বণ রূপের বিন্যাসে যে চিত্র রচিত হয় তাকেই 'নাগর' বলে।

°পূর্বোক্ত তিন-প্রকার চিত্রের যে-কোনো সমাসে বা মিশ্রণে 'মিশ্র' জাতির উৎপত্তি।

শ্রীতিনকড়ি ভট্টাচার্য, শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী ও শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়। নানা সময়ে আচার্য শ্রীনন্দলাল বসুর উপদেশ-লাভে বহু দুর্বোধ বিষয় সহজ সুবোধ্য হয়েছে।

°এরূপ চিহ্নের দ্বারা সর্বত্রই বিষ্ণুধর্মোত্তর গ্রন্থের শ্লোকানুবাদ বা বিশদার্থসংগ্রহ নির্দেশ করা হয়েছে।

* মুদ্রিত গ্রন্থে যথাক্রমে বৃত্ত এবং নৃত্ত পাঠই আছে। নৃত্যের প্রাণ নৃত্ত (দ্রষ্টব্য পাদ-টীকা ১০, পৃ ১৫) আর নৃত্তেরও স্বরূপ বৃত্তে বা ছন্দে, বিধিবিহিত আবর্তনে। সুতরাং 'বৃত্ত' বা 'নৃত্ত' কোনো শব্দেই যে পাঠপ্রমাদ ঘটেছে এমন নয়। বরং উপস্থিত আমাদের মনে হয়, বৃত্ত, নৃত্ত, নৃত্য, প্রত্যেক শব্দটি বিশেষ বিবেচনা ক'রেই বিশেষ স্থানে ব্যবহার করা হয়েছে— অন্যরূপ হলে তাৎপর্যের ন্যূনতা ঘটত।

কুলীন তিনটি শ্রেণীর বর্ণনে প্রত্যেকের স্বভাবসংগত আকার নির্দেশ করা হয়েছে। লক্ষ্য করবার বিষয় যে, 'সত্য' বলতে দৃষ্ট বিষয়ের যথাযথ অনুকৃতি বা হুবহু নকল নয়— লৌকিক সাদৃশ্য যৎকিঞ্চিৎ থাকবে, সহজাত-প্রতীতি-গম্য হবে, একেবারে অবাস্তব কল্পনা মনে হবে না, এই পর্যন্ত। মূলে 'বৈণিক' শব্দ আছে, আধুনিক পণ্ডিতেরা মনে করেন 'বীণা' বা 'বীণ' শব্দজ, অর্থাৎ সুরেলা, lyrical। প্রসঙ্গের পূর্বাপর অনুধাবন করলে এ অর্থ, এরূপ ব্যুৎপত্তি-সিদ্ধ এই শব্দ সংগত মনে হয় না। মহাকাব্য নাটক গীত বা কবিতার সঙ্গে চিত্ররূপের তুলনা প্রাচীনের ধ্যানে বা মননে ছিল যে, তার কোনো প্রমাণ নেই। হঠাৎ এ কালের মনোভাব ও বিচার বিশ্লেষণ সে কালের শাস্ত্রব্যাখ্যায় জুড়ে দেওয়া যায় না। তাঁদের বিবেচনায় চিত্রের কোনো জাতি যদি মহাকাব্যের মতো (epical) বা নাটকের মতো (dramatic) না হয়, হঠাৎ অন্য এক-প্রকার চিত্র, গীত বা গীতিকবিতা -সদৃশ (lyrical) হতে পারে না। সহজসাধ্য ব্যাখ্যার লোভ আমাদের সংবরণ করতে হবে। বস্তুতঃ, বণিজ্ বা বণিক শব্দের সঙ্গে বৈণিকের সুদূর কোনো জ্ঞাতিত্ব আছে কি না প্রথম থেকে তাই ভেবেছি। মনে হল, পাণিনি ব্যোপদেব সকলেই প্রতিবাদী। কাজেই আশা ত্যাগ করেছি। গীতসদৃশ অর্থই মানতে হয়। এমন সময় পূজনীয় শিল্পী নন্দলাল বললেন, এ তো commercial artএর কথাই হচ্ছে, অন্য অর্থ এখানে আসে কৈ। অতএব তাঁর পাদবন্দনা করে, পাণিনি-ব্যোপদেবকেও দূর থেকেই নমস্কার ক'রে (ব্যাকরণের কিছুই জানি নে) অভীষ্ট বাগর্থেরই হেতু প্রদর্শন করতে হয়।

আমাদের বিশ্বাস, ভারতভূমির অতীত ষষ্ঠ বা সপ্তম শতাব্দে, বর্ণাশ্রম ধর্ম যখন অন্তঃশূন্য হয়ে পড়ে নি গজভুক্ত কপিত্থের মতো, হিন্দুশাস্ত্রকারের সকল ধ্যান-ধারণার পটভূমে সর্বদাই ছিল বিশাল হিন্দুসমাজ। কেননা, ব্যষ্টি ও সমষ্টিকে অঙ্গাঙ্গীভাবে মিলিয়ে জীবনও যে তেমনি ছিল। ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের আঁকা চতুর্বিধ চিত্র না হলেও, অন্য ভাবের তিনটি শ্রেণীর আঁকা তিন-প্রকার চিত্রের সন্ধান এখানে নিশ্চিত। 'সত্য' আলেখ্যের লেখক এখানে ব্রাহ্মণকল্প দ্রষ্টা শিল্পী। কেবল তাঁর আঁকা চিত্রেই সত্যের সাদৃশ্য উল্লেখ করা হয়েছে— স্থূল তথ্যের বা খুঁটিনাটি-গত বাস্তবের নয়— মান পরিমাণ সৌকুমার্য সে-সব তো আছেই। ধ্যানলোকের একটি রূপ সাকার ক'রে ধ'রে পুনঃ পুনঃ তারই ছাপ তোলা, যা হয়তো অন্যের স্বভাব বা বৃত্তি, মনে হয়, সত্য-চিত্রীর ক্ষেত্রে তাও নেই। চিত্রক্ষেত্রের আয়ত চতুঃসীমা সম্পর্কে একটি কথা শিল্পী নন্দলাল বলেন— উৎকৃষ্ট রূপ-সৃজনে ও সন্নিবেশে এটিই বিশেষভাবে উপযোগী। অতীতে বর্তমানে এ উক্তির সত্যতার প্রমাণও অজস্র। দণ্ডায়মান বা শয়ান পূর্ণ মানবশরীরের উপযোগী যে ক্ষেত্র তারই
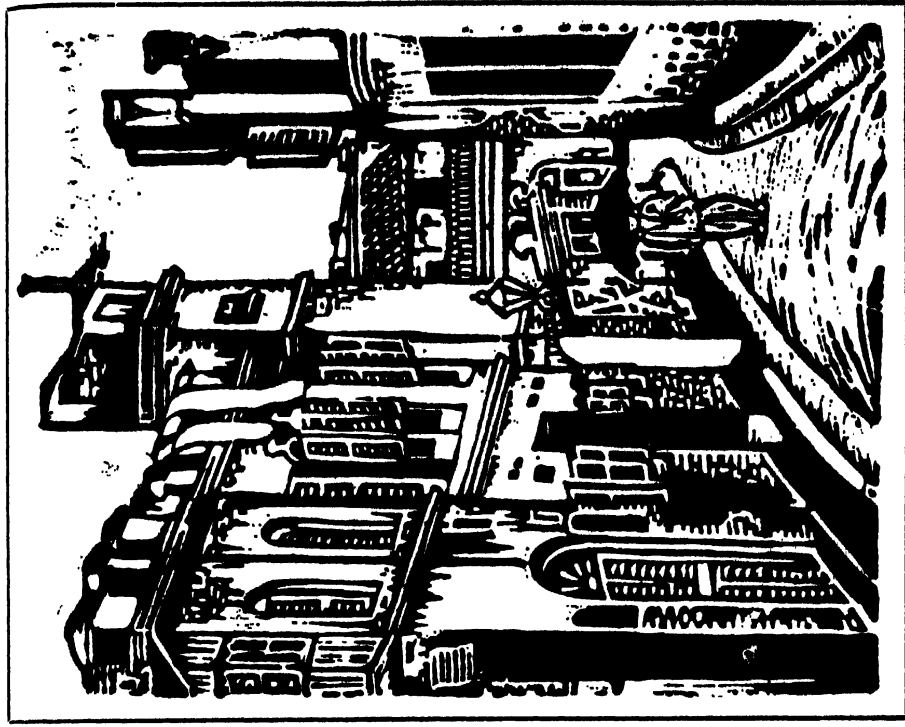
প্রদোষ : শান্তিনিকেতন । শ্রীদেবরাজ শেট্টী

শহরের গলি : কলিকাতা । শ্রীহুতান হরাহাপ

শান্তিনিকেতন

শ্রীকানাই সামন্ত
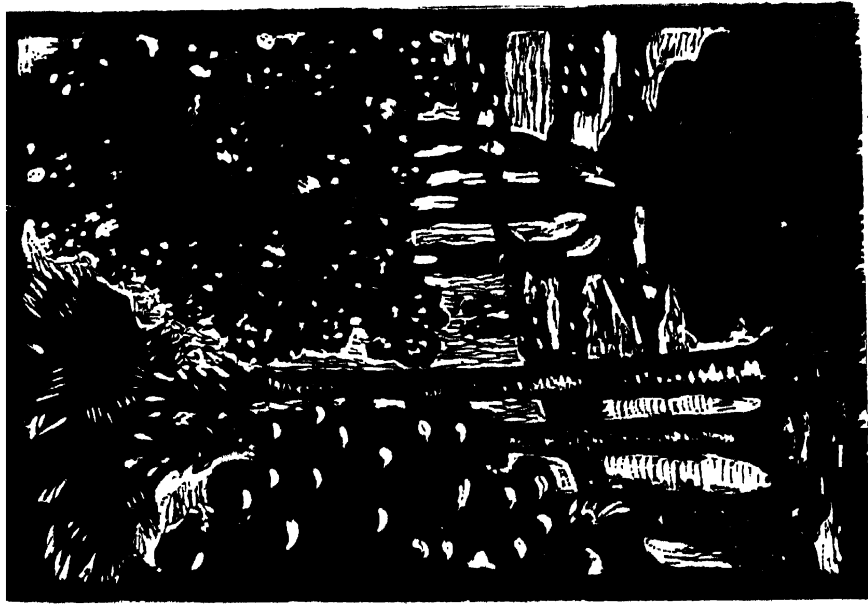
আদর্শে, তারই ভাবনাসহিত প্রেরণায়, চিত্ররচনার এই জ্যামিতিক আয়তন-ক্ষেত্রই নির্দিষ্ট হয়ে গেছে।

উৎপতনে বা নিপাতনে, হুঁচোট খেয়ে বা পিছ্‌লে, দন্ত্য বর্ণ মাথায় এবং মূর্ধাশ্রিত ব্যঞ্জন দাঁতে আসে কি না পণ্ডিতেরা বলুন। উপস্থিত দেখা যায়, বি+ইন+ক থেকে বীনক এবং তা থেকে বৈনিকও সিদ্ধ হতে পারে। বিশেষ-ভাবে সক্ষম দক্ষ অথবা প্রভু যিনি তিনিই বীনক— ক স্বার্থে, অথচ ব্যাখ্যাতার মুখ চেয়ে পরার্থেও বলা চলে— বীনকেরই চমৎকারজনক কৃতি হল 'বৈনিক'। এ ক্ষেত্রে সাদৃশ্য বাদ দিয়ে চিত্রের অন্যান্য গুণ সবিস্তারেই উল্লিখিত হয়েছে— সে কথা পরে। ছন্দঃপ্রেরণার থেকে কম্পোজিশনের ভাবনা যেখানে বেশি সে চিত্রের চতুরস্র ক্ষেত্রই হয়তো বেশি উপযোগী। উপরে-নীচে ডাইনে-বাঁয়ে মাত্রা বা তাল মিলিয়ে, সমতৌল (symmetry) বা ভারসাম্য (balance) অনুধাবন ক'রে রূপরাজির বিন্যাস এ ক্ষেত্রে সুন্দর সুচিন্তিত সুবিহিত হয়ে থাকে। এ-জাতীয় চিত্রের বহু নিদর্শন সেকালে ছিল, আর এ কালেও এ দেশে বা বিদেশে প্রচুর রয়েছে।

'নাগর' নিতান্তই বিদগ্ধ নাগর নাগরিকার শৌখিন শিল্পচর্চার ফল। গোলাকার এরূপ চিত্র পাটায় পটে মৃৎপাত্রে বা সরায় পরিশীলিতরুচি জানপদজন অবসরবিনোদনের উদ্দেশে আর গৃহশোভা-সাধনে আঁকতেন মনে হয়। বৃত্ত-ক্ষেত্রে মনোহারী মণ্ডনগুণ সহজেই ফুটত— নরনারীর রূপ হলে অনতিভূষিত উৎকট-নয় এমন পুষ্ট অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-লিখনে ত্রুটি থাকত না। তবে চিত্রের অন্য অনেক প্রয়োজনীয় গুণ থাকত কি না মার্কণ্ডেয় ঋষি বলেন নি।

ঋষির ঘনশ্মশ্রুদাম ভেদ করে স্মিত হাসিই ফুটে উঠবে যদি এখন বলি, চিত্রের এই চতুঃশ্রেণী-নির্দেশে মনে হয় যেন তিনটি দ্বিজাতি এবং চতুর্থ শূদ্রজাতিরও দিশা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। সত্যের নির্ভর সত্যকল্পনায়, সে হল ব্রাহ্মণ। বৈনিকের পরিচয় সামর্থ্যে ও দক্ষতায়, সে হল ক্ষত্রিয়। (ক্ষত্রিয় বেনের কাছে আত্মবিক্রয় ক'রে ঠিক-ঠিক commercial art হয়ে উঠেছে, সে এই নিকটবর্তী কালে।) নাগরের লক্ষণ চাতুর্য এবং শোভনতা, সে হল বৈশ্য। অবশিষ্ট যে জাতি নানা বিমিশ্রণ থেকে উদ্ভূত, তার বিশেষ পরিচয় দেবার ছিল না, তা সর্বসামান্য বলা চলে, চতুর্বিধ চিত্রের মধ্যে সেটিই হল শূদ্রবর্ণ।

সে যাই হোক, আলোচ্য শ্লোকনিচয়ে কয়েকটি শব্দের অর্থ পরিষ্কার হলেও, কয়েকটির অজ্ঞাত বা অপ্রচলিত, সুতরাং বিশেষ বিচারের বিষয়। প্রমাণ তো অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অন্যোন্যনির্ভর মান-পরিমাণ। স্থান যে স্থিতির ভঙ্গী তা অন্যত্র বিশদভাবে বলা হয়েছে। ভূলম্ব বা ভূলম্ভ শব্দ অন্যত্র আছে, লম্ভ তারই পর্যায়শব্দ

মাত্র— স্থান যদি হয় স্থিতি ও গতির ভাব বা ভঙ্গী, তবে লম্বত্ব ভূলম্ব বা ভূলম্বত্ব হল সেই ভঙ্গী সত্ত্বেও বা ভঙ্গের দ্বারাই, প্রতিষ্ঠাভূমিতে চিত্ররূপের যে ভারসাম্য রয়েছে সেইটি। বলা বাহুল্য মাত্র, ভূলম্ব[৭] এবং স্থান একেবারে অঙ্গাঙ্গীভাবেই সংগত।

পর পর শ্লোকে পাওয়া যায় 'উল্বণ' শব্দ, নানা অর্থ তার নানা অভিধানে। স্ফুট, ব্যগ্র, উৎকট, উগ্র, সমধিক, শক্তিশালী, আড়ম্বরপূর্ণ— কোন্‌টি বেছে নেওয়া যাবে? পণ্ডিত গিরীশচন্দ্র তাঁর সারার্থসংকলনে জাঁকজমকের চমকই বুঝেছেন। নাগর চিত্র-নির্ণয়ে মূলের 'নত্তনোল্বণম্' শব্দের বিশ্লেষই সুকঠিন— পণ্ডিত না হয়েও অগ্রার্ধ ত্যাগ ক'রে 'নোল্বণম্'টুকু রাখলেই 'যথালাভ'।

অতঃপর বর্তনা-প্রসঙ্গ। বর্তনের প্রতিশব্দ 'বলন' বলা যেতে পারে, যা থেকে বৈষ্ণবকবির 'বাহুর বলনী'। বর্তনা বলতে যেমন আবর্তন বা গড়ন বোঝাতে পারে, এ ক্ষেত্রে তেমনি চিত্ররূপের গড়ন বা বর্তুলতা ফোটাতে হলে যে বিশেষ অঙ্কন-কৌশলের ব্যবহার আছে সেই পর্দাজ বা stipplingও নির্দেশ করা হয়েছে সন্দেহ নেই।—

[০]বর্তনা তিনপ্রকার হয়ে থাকে— পত্র, রৈখিক বা আরৈখিক,[৮] তা ছাড়া বিন্দু বা বিন্দুজা।

[০]পত্র নামেই পরিচিত হল পত্রাকৃতি বর্তনা, রৈখিক বা আরৈখিক[৮] বর্তনা

[৭] প্রাচীন শিল্পী এবং শিল্পশাস্ত্রীগণের বিবেচনায় ভূলম্ব বা equilibrium-এর প্রয়োজন-বোধ কতটা ছিল, কেনই বা ছিল, সেটি বুঝতে হলে স্মরণ করা চাই নৃত্ত বা নৃত্যের কথা, যে নৃত্তসূত্রের ভূমিকায় এই চিত্রসূত্রাবলীর মনন বা প্রণয়ন। ভারসাম্য কোথাও কখনো এতটুকু নষ্ট হলেই, পদস্খলন হবে নৃত্যে, স্থায়ী ভাস্কর্য বা স্থাপত্যও গড়ে তোলা যাবে না। একমাত্র চিত্রেই ও-জিনিস আবশ্যক নয়, স্থূলদৃষ্টিতে এমন মনে হতে পারে— ভারতীয় শিল্পী বা শিল্পশাস্ত্রী সে ধারণায় প্রশ্রয় দেন নি।

[৮] মুদ্রিত পাঠে যথাক্রমে চক্ষুগোচর হয়— হৈবিক, হৈরিক। তদগ্রে অ বা আ ছিল, সমাস বা সন্ধিতে গ্রস্ত হয়েছে, এ অনুমানে বাধা নেই— কিন্তু লাভও নেই। পক্ষান্তরে 'রৈখিক' বা 'আরৈখিক' অনুমানের যুক্তি এই যে, বিন্দু এবং পত্র বাদ দিলে পর্দাজের প্রয়োগসিদ্ধ আর-একটি মাত্র বিশেষ রূপ, সে হল নানারূপ সূক্ষ্মরেখারই বিন্যাস। দেবনাগরী হরপের তথা লৌকিক উচ্চারণের বিবর্তনে 'রৈখিক'ই 'হৈবিক' বা 'হৈরিক' হওয়া বিচিত্র নয়, সুধীজনের মুখে এই কথাই শুনেছি।

অতীব সূক্ষ্ম, তা ছাড়া স্তম্ভনাযুক্ত[১] বিন্দুর প্রয়োগেই বিন্দুবর্তনা।

(রূপভেদ ছাড়া প্রকৃতিভেদও আছে— আর্দ্র এবং শুষ্ক।) [০]পূর্বাপর আর্দ্র-বর্তনার প্রয়োগই উত্তম, শুষ্কবর্তনায় বস্তুচিত্রণ মধ্যম, আর, কোথাও শুষ্ক কোথাও আর্দ্রবর্তনার প্রয়োগকেই অধম বলা হয়ে থাকে।

(বর্তনার রূপভেদের পরেই গুণগত ভেদ মূল গ্রন্থে পাওয়া যাবে না।) আর্দ্র, শুষ্ক, শুষ্কার্দ্র বর্তনার উল্লেখমাত্র চিত্রী বা চিত্রজ্ঞ ব্যক্তির নিকট যথেষ্ট। কৌতূহলী অন্যজনের জানা দরকার, শুষ্ক বা শুষ্কপ্রায় (স্যাঁৎসেঁতে) 'জমি'তে পর্দাজ লাগাবার সঙ্গে সঙ্গেই জলে তুলি ভিজিয়ে ঐ পর্দাজের (সাধারণতঃ) একটি ধার মুছে নিলে, পূর্বপ্রস্তুত রঙের ক্ষেত্রে রঙের নূতন পর্দাটি চমৎকার মিলিয়ে দেওয়া যায়; তাতেই গড়ন অত্যন্ত স্বাভাবিক ও সুকুমার সৌন্দর্যে ফুটে ওঠে। দক্ষ শিল্পী ডান হাতের বিভিন্ন আঙুলের ফাঁকে একই কালে একটি রঙের তুলি আর একটি জলের তুলি নিয়েও কাজ করতে পারেন— এমন চীনা চিত্ররীতিতে বা কালীঘাট-পটুয়াদের মধ্যেও দেখা গিয়েছে। এই তো আর্দ্রবর্তনা। এরই নিরিখে কাঁচা পাকা নানা হাতের নানা চিত্রের চাক্ষুষ পরিচয়ে, শুষ্ক ও শুষ্কার্দ্র বর্তনাও সহজেই বোধগম্য হবে। অবশ্য, টেম্পারা, ফ্রেস্কো, কালী-তুলীর কাজ, নানা জাতির নানা অঙ্কনপ্রকরণ মনে রেখে ওই শব্দ-কয়টির আর-এক প্রকার অর্থ হতে পারে এবং হওয়াই উচিত। যে 'জমি'তে বর্তনা প্রয়োগ করা যাচ্ছে সেটি আর্দ্র (অল্পবিস্তর ভিজে-ভিজে) বা শুষ্ক হতে পারে, তাতেই আর্দ্র বা শুষ্ক বর্তনা হল। কোথাও আর্দ্র আর কোথাও শুষ্ক ভূমিতে বর্তনার প্রয়োগে সমুদয় চিত্রে বর্ণব্যঞ্জনার

[১] স্তম্ভনা+যুক্ত অথবা স্তম্ভন/স্তম্ভনা+অযুক্ত, ঋষিপ্রতিপাদ্য কোন্‌টি, নিশ্চয় ক'রে কে বলবে? স্তম্ভন বলতে, অবরোধ, স্থিরীকরণ, জড়ীকরণ, সকলই হয়। রেখা ও রঙের স্থিরীকরণ (fixing) চিত্রের সর্বত্রই প্রয়োজন, বিশেষ ক'রে বিন্দুবর্তনা সম্পর্কে বলবার কারণ নেই। জড়ীকরণ বা অবরোধ অর্থ সংগত মনে হয়। কারণ, নিপুণ চিত্রকর বর্তনা এভাবে প্রয়োগ করেন যাতে 'রঙের বিভিন্ন পর্দা বা টোন সীঁড়ের মতো মোলায়েম করে মেশানো' যায়, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। অর্থাৎ, এই শিল্পকৌশল আড়ষ্টভাবে বা প্রকটভাবে প্রযুক্ত হয় না। (সকল প্রকার পর্দাজ সম্পর্কেই এ কথা সত্য।) এক-একটি বিন্দু পৃথক্ পৃথক্ ভাবে দর্শকের চোখে পড়ে না। তা হলে সিদ্ধান্ত এই যে, স্তম্ভনবিযুক্ত বিন্দুতেই বিন্দুবর্তনা, যার ফলে প্রযুক্ত ছায়াসুষমা ক্রমিক উজ্জ্বলতায় অলক্ষ্যে অনায়াসে মিলিয়ে আসে, গড়ন ফোটানোর বদলে একটি হালকা রঙের ক্ষেত্রে অন্য একটি গাঢ় রঙের অসংখ্য স্থূল সূক্ষ্ম 'ব্রণ' জড় বা অনড়ভাবে দেখা দেয় না। পরম্পরাগত নানাবিধ পর্দাজের বিবরণ পাওয়া যাবে আচার্য নন্দলাল বসুর 'শিল্পচর্চা' (১৩৬৩) গ্রন্থে। দেখা যাবে শাস্ত্রনির্দিষ্ট মৌলিক তিনটি বর্তনাই ধারাবাহিক অনুশীলনে নানা রূপ নিয়েছে, অথচ মূলগত ভেদ ঘটে নি।

কোনো সামঞ্জস্য রাখা যায় না— এজন্য শুষ্কার্দ্র বর্তনাকে নিকৃষ্ট বলা হয়েছে।

অতঃপর, যে-কয়টি বস্তুর সমাহারে চিত্রের নির্মাণ সে সম্পর্কে কী বলেন শাস্ত্রকার দেখা যাক্—

°রেখা বর্তনা মণ্ডন এবং বর্ণ এই ক'টি উপায়ে বা লক্ষণে চিত্র ভূষিত হয়ে থাকে।

°আচার্যগণ রেখার এবং বিচক্ষণসমাজ বর্তনার প্রশংসা করেন, স্ত্রীগণ মণ্ডন ইচ্ছা করেন আর অবশিষ্ট জনসাধারণ খোঁজেন বর্ণাঢ্যতা।

°সকলেই গ্রহণ করতে পারে চিত্রণকার্যে সে চেষ্টা থাকা দরকার। অর্থাৎ, পূর্বোক্ত সকল লক্ষণেই চিত্র ভূষিত বা সমন্বিত হওয়া সংগত।

একচত্বারিংশ অধ্যায়ের নানা শ্লোকে চিত্রের, সেই সঙ্গে চিত্রোপযোগী ভূমির, দোষগুণ নিয়ে নানারূপ আলোচনা করা হয়েছে—

°বিন্দুরেখত্ব (ছেঁড়া-ছেঁড়া বিন্দু-বিন্দু রেখা), অঙ্কনের দুর্বলতা, রূপের অবিভক্ততা (বিভিন্ন রূপের পরিচ্ছিন্ন অথচ অন্যোন্য-আশ্রয় বিন্যাসের অভাব), অবিরুদ্ধতা (পটভূমি থেকে রূপের যে পরিস্ফুটতা বা 'এগিয়ে আসা' তারই অভাব), দেবতার মানবাকার, গণ্ড ওষ্ঠ এবং নেত্রের অতিকৃতি[১০]—এই হল চিত্রদোষ।

°যথাযথ স্থান অর্থাৎ দেহভঙ্গী, প্রমাণ অর্থাৎ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরিমাপ, ভূলম্ব অর্থাৎ দেহীর ভারসাম্য, রূপের মাধুর্য এবং বিভক্ততা, সাদৃশ্য এবং ক্ষয়বৃদ্ধি[১১]—এই ক'টি চিত্রের গুণ।[১২]

(চিত্র নষ্ট হয় কেন?) °শিল্পীর পক্ষে দুরাসন বা উপবেশনের দুঃখ, দুঃখে

১০ বৃহদ্গণ্ডৌষ্ঠনেত্রত্বম্। মুদ্রিত 'বৃহদণ্ড' বৃহৎ (আকারে ক্ষুদ্র) পাঠপ্রমাদ মাত্র। এ অণ্ড এখানে নিষ্প্রাণ ও নিরর্থক। কোনো পক্ষীমাতার দেহতাপে সংগত কোনো অর্থ উদ্ভিন্ন হবার নয়। বামন শিবরাম আপ্টের অভিধানে, গণ্ড: the cheek, the whole side of the face including the temple.

১১ সম্মুখ, পশ্চাৎ, পার্শ্ব, অল্লাধিক ঋজু বা নত, দেহীর বিভিন্ন 'স্থান'-অনুযায়ী বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কম-বেশি ছোটো বা বড়ো দেখায়— শিল্পশাস্ত্রে তারই পারিভাষিক নাম ক্ষয়বৃদ্ধি (foreshortening)।

১২ মাঝের একটি অধ্যায় ডিঙিয়ে এই দোষগুণের প্রসঙ্গ আবার তোলা হয়েছে ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়ে। সেখানে, দৌর্বল্য, স্থূলরেখত্ব (বিন্দুরেখত্ব নয়), অবিভক্তত্ব, বর্ণসংকর

আগমন, পিপাসা এবং অন্যমনস্কতা বা অন্যচিত্ততাই চিত্রবিনাশের হেতু।

দুঃখে আগমন (দুরানীতং) অবশ্য চিত্রীর না হয়ে, চিত্রিতব্য বিষয়ের এরূপ মনে করাই সংগত। অর্থাৎ, রসরূপকল্পনায় কৃচ্ছ্র বা অসাচ্ছন্দ্য থাকলে সেই হয় চিত্রবিনাশের, চিত্রকৃতির ব্যর্থতার, অন্যতম হেতু।

০সুন্দরভাবে লেপন করা এবং সুপরিসর,[১৩] মধু গুড় অন্নমণ্ড প্রভৃতি স্থায়িত্বজনক বস্তুর সমাহারে প্রস্তুত আস্তরণের দ্বারা দৃঢ়ীকৃত,[১৪] সুনির্মল বা শুভ্র, রৌদ্রবৃষ্টিজনিত বা অন্য কোনো-প্রকার ক্ষয় ক্ষতি থেকে সুরক্ষিত, আলেখ্য-লিখনের ভূমি এমন হওয়াই প্রশস্ত (শুভা) —এই হল নির্দেশ।

(বর্ণের অবাঞ্ছিত বা অসুন্দর মিশ্রণ) —দোষ এই চারটিতে এসে ঠেকেছে। (বর্ণসংকর কোথায়, বর্ণভাণ্ডে অথবা চিত্রে পাশাপাশি সমাবেশে অথবা উভয়ের যে-কোনো স্থলে, এ প্রশ্ন থেকে যায়। সম্ভবতঃ, কোনো স্থলেই বর্ণসংকর বাঞ্ছনীয় নয়।) গুণের সংখ্যায় হ্রাসবৃদ্ধি হয় নি, সে হল— স্থান, প্রমাণ, ভূলম্ভ, মাধুর্য, বিভক্ততা, সাদৃশ্য এবং ক্ষয়বৃদ্ধি। গুণগুলি একই, উল্লেখেও ক্রমভঙ্গ হয় নি। প্রথমেই ভঙ্গীর ভাবনা (আচার্য নন্দলাল যেমন বলেন 'প্রাণছন্দের রেখা-পাত'), পরে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরিমাপ, সঙ্গে সঙ্গে দেখা চাই যে, ভারসাম্য নষ্ট হয় নি। তখন ভাবব্যক্তির মাধুরী ফুটিয়ে তোলা, রূপকে স্পষ্টতা এবং সৌসাদৃশ্য (সুন্দর সাদৃশ্য) দেওয়া, সব-শেষে বিশেষ 'স্থান'-অনুযায়ী বিশেষ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের 'ক্ষয়বৃদ্ধি'তে একাধারে দর্শন এবং মনন মিলিয়ে দেওয়া। এই অপূর্ব পারম্পর্যটি বিশেষভাবে অনুধাবনের যোগ্য।

১৩ মুদ্রিত পাঠ: স্বানুলিপ্তাবকাশা। সুন্দরভাবে আনুলিপ্ত বা অনুলিপ্ত এবং সুন্দর অবকাশ যার এ অর্থ ছাড়া, অবকাশ যার সুন্দরভাবে লেপন করা এ তো হতেই পারে।

১৪ মূলে একটিমাত্র শব্দ আছে: মধুকা। চিত্রভূমির প্রস্তুতিতে গুড়ের জলের ব্যবহার অবিরল, শিল্পরত্ন থেকে জানা যায়। ভূমি সম্পর্কে বিশেষভাবে বলা হয়েছে বিষ্ণুধর্মোত্তরের চত্বারিংশ অধ্যায়ে। পণ্ডিত গিরীশচন্দ্রের গ্রন্থে এইভাবে তার সারসংকলন—

চিত্রের স্থায়িত্ব-সম্পাদনের জন্য কুড্যে [দেয়ালে] যে প্রলেপ দিবার ব্যবস্থা আছে, তাহাতে অনেকগুলি মশলার সংমিশ্রণের উপদেশ দেখা যায়। যথা,— তিন প্রকার ইষ্টকচূর্ণ, সাধারণ মৃত্তিকা তিন ভাগ, গুগ্‌গুল, মোম, মধুক (রক্ত অথবা যষ্টিমধু), মুরুক (মুরক), মুরা-নামক প্রসিদ্ধ গন্ধদ্রব্যবিশেষ, গুড়, কুসুম্ভ ও তৈল, এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া তিন ভাগ অগ্নিদগ্ধ সুধার (চূণ) সহিত চূর্ণাকারে মিশাইবে।

অনন্তর ইহাতে দুইভাগ অপক্ব বিল্বচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া (মযকং কযং বুঝা গেল না) উপযুক্তপরিমাণ বালুকা দিবে। তাহার পর পিচ্ছল বল্কলজলের দ্বারা সমস্ত ভিজাইবে। এই উপাদান এক মাসে প্রলেপের উপযুক্ত হয়। অনন্তর এই পদার্থের দ্বারা প্রাচীর প্রভৃতিতে বিবেচনাপূর্বক প্রলেপ দিবে। এই প্রকারে এবং আরও কতকগুলি প্রক্রিয়ার দ্বারা চিত্রস্থানকে উপযুক্ত করিয়া, তাহাতে চিত্র অঙ্কিত করিলে, শত বৎসরেও চিত্রের অন্যথা হয় না।

—প্রাচীনশিল্পপরিচয়, পৃ ১২৭

°সুচিক্কণ (সুস্নিগ্ধ), বিশেষভাবে পরিস্ফুট (বিস্পষ্ট), সুন্দর বর্ণ (সুবর্ণ),[১৪] আর রেখাও সুন্দর (সুরেখ), রূপসমস্ত বিশেষ দেশের বিশেষ বেশে সজ্জিত আর প্রমাণে যেমন শোভাতেও তেমনি হীনতালেশহীন (অহীয়মান) —এমন চিত্রই অতীব চিত্র, অর্থাৎ চমৎকারজনক, সুন্দর।

চিত্রকর্মের ভূমি সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তাতে মনে হয় ভিত্তিচিত্রই উদ্দিষ্ট। 'সুবর্ণরেখম্' পাঠ আছে, এজন্য স্বর্ণরেখার ভাবনা অসংগত। আলেখ্যোচিত সুন্দর রঙ ও সুন্দর রেখা, এই অর্থই প্রশস্ত মনে হয়।

পরবর্তী অধ্যায়ের বর্তনা-প্রসঙ্গ (একটিমাত্র শ্লোক) পূর্বেই সংকলিত, অবশিষ্ট বিশেষ বিশেষ শ্লোকে বলা হয়েছে—

°দৃষ্ট বস্তু বা বিষয় সততই সুসদৃশ (সুন্দরভাবে সদৃশ, উৎকটভাবে বা যান্ত্রিকভাবে নয়) করা উচিত। কেননা, চিত্রে সাদৃশ্যসাধন প্রধান সার্থকতা।

°নরনারীর আলেখ্যলিখনে যে দেশের যেমন রূপ, যেমন বর্ণ, যেমন বেশ, বুদ্ধিপূর্বক সেরূপই করা উচিত।

[১৫] চত্বারিংশ অধ্যায়ে চিত্রে-ব্যবহার্য বিভিন্ন বর্ণ সম্বন্ধে বলা হয়েছে। পণ্ডিত গিরীশচন্দ্রের গ্রন্থ -অনুযায়ী তারও সারার্থ সংকলন করা গেল। 'রাজবর্তং' পাঠ ত্যাগ করে 'রাজাবর্তং' অনুমান সংগত।—

রঙ্গদ্রব্যাণি কনকং রজতং তাম্রমেব চ।
অভ্রকং রাজাবর্তং চ সিন্দূরং ত্রপুরেব চ॥
হরিতালং সুধা লাক্ষা তথা হিঙ্গুলকং নৃপ।
নীলং চ মনুজশ্রেষ্ঠ তথান্যে সন্ত্যনেকশঃ॥

স্বর্ণ, রজত, তাম্র, অভ্র, রাজাবর্ত (lapis lazuli), সিন্দূর, সীসক, হরিতাল, সুধা (চুন) হিঙ্গুল, নীল, আরও অনেক বস্তু রঞ্জনে ব্যবহৃত হয়।

সঙ্কটং লৌহবিন্যস্তমভ্রকং দ্রাবণং ভবেৎ।
এবং ভবতি লৌহানাং লেখনে কর্মযোগ্যতা॥

স্বর্ণাদি ধাতুর পত্রবিন্যাস ও রসক্রিয়া (দ্রববৎ ব্যবহার) উভয় বিধিই আছে। চিত্রে স্বর্ণরৌপ্যাদির অতিসূক্ষ্ম পাত ধরানো বিশেষ কৌশল ও অভ্যাস -সাপেক্ষ— দ্রবব্যবহার অপেক্ষাকৃত সহজ।

দেশে দেশে মহারাজ কার্যাস্তে বজ্রলেপযুতাঃ।

চিত্রের রঙ স্থায়ী করবার বিশেষ বিধিব্যবস্থা ছিল, এখানে বজ্রলেপ শব্দে তারই উল্লেখ।

ধৌতং জলেনাপি ন নাশয়েৎ তিষ্ঠন্ত্যনেকানি চ বৎসরাণি।

শাস্ত্রকার বলেন, জলে ধুলেও এই রঞ্জন নষ্ট হয় না, বহু বহু বৎসর ঠিক থাকে।

—প্রাচীনশিল্পপরিচয়, পৃ ১৩২-১৩৩

⁰চিত্রিত নরনারীর দেশ কেশ শয়ন আসন স্থান যান নিয়োগ ও কর্ম বুদ্ধি-পূর্বক, যত্নপূর্বক অঙ্কিত করা চাই।

⁰পূর্বে (নৃত্যসূত্রে) যেমন বলা হয়েছে, যেরূপ উদাহরণ দেওয়া হয়েছে, তদনুযায়ী যথাযোগ্য ভাব ও রস যোজনা করবে।

⁰যে কালে, যে দেশে, যে বয়সে, যেমন ভাবটি এনে (যথাক্রমেং) যে ভাবে ক্রিয়াশীল থাকা দরকার, চিত্র (চিত্রগত রূপ) যদি তেমন হয় তবেই ধন্য—তদ্‌বিপরীতে নিষ্ফল জানবে।

⁰বিচক্ষণবুদ্ধি দ্বারা বিকল্পিত (বিশেষভাবে কল্পিত), করণ (ক্রিয়া) কান্তি বিলাস রস প্রভৃতি লক্ষণে বা গুণে সংগত, যে আলেখ্যলিখনে লোচন স্পষ্টই যেন ঈক্ষণশীল, দর্শকজনের সমাদরে সেই চিত্রই হয়ে থাকে অভীপ্সিতকামদ।

এই হল রূপনির্মাণ নামক দ্বাচত্বারিংশ অধ্যায়। পরবর্তী অধ্যায়ে শৃঙ্গার হাস্য করুণ বীর রৌদ্র ভয়ানক বীভৎস অদ্ভুত শান্ত এই নব চিত্ররসের বিভিন্ন ভাবভঙ্গী আকার প্রকার লক্ষণ ও লক্ষ্যের বিবরণ দিয়ে পরে বলা হয়েছে—

⁰শৃঙ্গার হাস্য শান্তি এই কয় রসের চিত্রই গৃহস্থের ঘরে লেখা উচিত, অন্যান্য রসের আলেখ্য-লিখন সেখানে কখনোই হবে না।

⁰দেবালয়ে সবই করা চলে, তেমনি রাজভবনে। কিন্তু রাজসভাগৃহেই সব রসের চিত্র আঁকা হবে, রাজার বাসগৃহে নয়।

⁰অর্থাৎ, দেবালয় ও রাজসভা বাদ দিয়ে, মৃত দুঃখার্ত ও কুৎসিত ব্যক্তি, সংগ্রাম ও শ্মশান -দৃশ্য, এ-সব করুণ অথবা অশুভ আকৃতি কখনোই (লেখা হবে) না।

⁰স্বর্ণ রৌপ্যাদি নিধি -দ্বারা ভূষিতশৃঙ্গ এমন-সব বৃষ এবং শুণ্ডে ধৃতনিধি গজরাজি লিখবে (এগুলি মঙ্গলজনক)[১৬]— (কুবেরের) নবনিধি, বিদ্যাধরগণ, ঋষিগণ, (বিষ্ণুবাহন) গরুড়, (শ্রীরামভক্ত) হনুমান এবং আরও যে-সব রূপ মঙ্গলজনক ব'লে ত্রিলোকে প্রকীর্তিত গৃহস্থের গৃহে গৃহে সততই লেখনীয়। (কিন্তু) নিজের গৃহে নিজেই চিত্রকর্ম করবে না শিল্পী।[১৭]

⁰স্থানহীন (ভাবভঙ্গরহিত), গতরস, শূন্যদৃষ্টি, মলিন বা চেতনাশূন্য, এমন রূপের লিখন প্রশস্ত নয়।

১৬ অন্বয়বিভ্রাটে ইংরেজি অনুবাদে অনেক অনর্থ কষ্টকল্পনা স্থান পেয়েছে।

১৭ বৈদ্য যেমন স্বগৃহে চিকিৎসা করেন না তেমনি কি?

(তালে তালে) °যেন ভারসাম্য রেখে নৃত্য করছে, যেন ভয় প্রকাশ করছে, মাধুর্য যেন হাসছে, সজীব দেখাচ্ছে, যেন শ্বাস প্রশ্বাস বইছে —এমন চিত্রই শুভলক্ষণ।

°হীনাঙ্গ, মলিন, শূন্য, বদ্ধব্যাধিভয়াকুলতায় তথা প্রকীর্ণকেশে রুগ্ণ বা মৃত, এ-সব চিত্র মঙ্গলকর্মে বর্জনীয়।

°শাস্ত্রজ্ঞ সুকৃতি দক্ষ চিত্রী -দ্বারা ধীমান্ ব্যক্তি প্রতীতিযোগ্য চিত্রই অঙ্কন করাবে, প্রতীতি হয় না এমন কদাচ করাবে না। এরূপ হলেই শ্রী আবাহন করে আনে আর অলক্ষ্মীকে ত্বরায় দূর করে দেয়, অনাগত অশুভের উৎকণ্ঠা ধুয়ে মুছে দেয় আর সমাগত শুভকে রক্ষা করে বা তুলে ধরে, শ্রদ্ধা প্রীতির প্রচার করে যেমন তেমনি যে প্রীতির তুলনা নেই সেও উৎপাদন করে, ফলতঃ দুঃস্বপ্নদর্শন নাশ করে ও গৃহদেবতার প্রীতিপ্রদ হয়— চিত্র যে স্থলে প্রতিষ্ঠিত সে আর শূন্য মনে হয় না।

°যিনি নিরভূষণ শল্যবিদ্ধ এবং বৃদ্ধ এঁকেও চমৎকার উৎপাদন করেন তিনি চিত্রবিৎ।

°তরঙ্গ, অগ্নিশিখা, ধূম, বৈজয়ন্তী (পতাকা), অম্বর (বস্ত্র অথবা আকাশ), এ-সব দৃশ্যবস্তুকে অদৃশ্য বায়ুগতি দিয়ে (বায়ুগতিতে কেমন ভাবে চঞ্চল বা গতিশীল দেখিয়ে) যিনি লেখেন তাঁকেই মত্ত[১৮] চিত্রবিৎ বলে জানবে।

°সুপ্ত হলেও চেতনাযুক্ত, মৃত ব'লেই চৈতন্যবর্জিত, এ রূপ যাঁর তুলিতে ফোটে— গড়ন বা নতোন্নত ভাবও দেখিয়ে থাকেন— তিনি চিত্রবিৎ।

অষ্টাত্রিংশ অধ্যায়ের একটি শ্লোকে আছে, দিব্যধামের সকলেই ষোড়শবর্ষীয়, নিত্য-প্রসন্নবদন ও স্মিতদৃষ্টি। হিন্দুদেবদেবীর ধাতু বা প্রস্তর -মূর্তি যাঁরা দেখেছেন তাঁরাই এ কথা মানবেন। মহিষাসুর-নিধনেও দেবীর দৃষ্টি ভ্রূকুটিকুটিল হয় না, রণরঙ্গিনী কালিকারও একটি হাতে থাকে বরাভয়, আর ব্রহ্মা বিষ্ণু ইন্দ্র চন্দ্র কার্তিকেয়ের তো কথাই নেই— দিগম্বর শিবেরও কন্দর্পনিন্দী চিরতরুণ রূপ।

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়ে যথোচিত প্রমাণসহ বলা হয়েছে সুন্দর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সুন্দর সঞ্চালনে সৃজিত 'নবস্থানানি রূপাণাম্'। সম্মুখ পার্শ্ব অথবা পশ্চাৎ থেকে,

১৮ আনন্দিত, আবিষ্ট, inspired। সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মুদ্রিত গ্রন্থের পাঠই স্বীকার করেছেন। অপর পক্ষে, গিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ 'স তু' কল্পনা করেছেন কতকটা অকারণে। 'মত্ত'ই ভালো মনে হয়। পূর্ববর্তী শ্লোক থেকেই চিত্রকরের কৃতিত্বসীমা বা চিত্ররূপের পরাকাষ্ঠা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে; প্রসঙ্গসূচক শ্লোকের কিয়দংশ পাওয়া যায় না।

ঋজু অথবা অনৃজু, ঈষৎ অধিক বা সম্যক্ নত, শরীরের প্রধান প্রধান যে-সব অঙ্গ দেখা যায় যত দিক থেকে, তারই বিস্তারিত বর্ণনা। নবস্থান-বর্ণনের শেষে যেখানে বলা হয়েছে 'এই নব স্থানের অতিরিক্ত স্থাবর জঙ্গম জীবলোকে আর কিছু দেখা যায় না', তার পরেই কিন্তু যথোচিত ক্ষয়বৃদ্ধির উল্লেখ -সহ পুনর্বার ত্রয়োদশ স্থানের বর্ণনা। উত্তম মধ্যম অধম তিন প্রকার প্রমাণ, প্রমাণের ইতর-বিশেষে চিত্রিত স্থানেরও ইতর-বিশেষ— অর্থাৎ সেও উত্তম মধ্যম অধম হয়ে থাকে—এমন কথাও বলা হয়েছে। (শ্রীমতী ক্রামরীশ মনে করেন, অধ্যায়ের এই অংশ প্রক্ষিপ্ত।) স্থান সংখ্যায় নয় বা তেরো যাই হোক, সে-সবের বর্ণনা থেকে পাঠ বা অর্থ -উদ্ধার সবিশেষ যত্নসাধ্য সন্দেহ নেই। সে চেষ্টা করব না। অনুসন্ধিৎসু পাঠক শ্রীমতী ক্রামরীশের গ্রন্থ থেকেও মূলের অনেকটা ধারণা করতে পারবেন আশা করি।

ত্রয়শ্চত্বারিংশ অধ্যায়ের যেখান থেকে মুখ ফিরিয়ে পশ্চাতের এই পরিপ্রেক্ষিতে একবার তাকানো গেল, সেখানেই ফিরে আমাদের এই দোষত্রুটিবহুল অসম্যক্ সূত্রানুশীলন শেষ করা ভালো। চিত্রসূত্র নিয়ে ঐটি শেষ অধ্যায়। বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করবার পূর্বে চিত্রকরের কৃতিত্বসীমা কোথায় ও কিরূপ ঋষি সেই কথাই বলছেন। হয়তো বিশেষভাবে লক্ষ্য করা হয় নি যে, কতকগুলি দুর্লভ অঙ্কননৈপুণ্যের যথালব্ধ যথেচ্ছ তালিকা গাঁথা হয়েছে এমন নয়, একটি উত্তরোত্তর সাধ্যসীমা-পানেই চিত্রী এবং চিত্ররসিক জনের প্রশংসাদৃষ্টি যথোচিত ক্রমে আকর্ষণ করা হয়েছে সন্দেহ নেই।—

অনলংকৃত, শল্যবিদ্ধ, বৃদ্ধ। বায়ুচলিত তরঙ্গ, অগ্নিশিখা, ধূম, বৈজয়ন্তী ও অম্বর। গূঢ়চৈতন্য সুষুপ্ত ব্যক্তি, বাহ্যতঃ সুপ্তবৎ হলেও আসলে হৃতচৈতন্য মৃতদেহী। রূপের গড়ন বা নতোন্নতভাব। এ-সব যিনি সার্থকভাবে আঁকতে পারেন তিনিই চিত্রবিৎ বা মস্ত চিত্রবিৎ। ভেবে দেখুন, রূপজ্ঞানে দৈন্য বা অভাব থাকলে নানারূপ অলংকরণে তা সহজেই ঢাকতে ইচ্ছা হয়, হয়তো ঢাকাও যায়। নিরভূষণ রূপের সত্যতা ও সার্থকতা ফোটানো অল্প কৃতিত্বের পরিচয় না। এর থেকে কঠিন শল্যবিদ্ধ বা বৃদ্ধের অঙ্কন। সে স্থলে ভূষণ তো দূষণ বটেই, তা ছাড়া আর্তের বা জরাগ্রস্তের নানারূপ দৈহিক মানসিক বিকার বিশেষ পর্যবেক্ষণ ও বহুদিনের অভ্যাস ব্যতীত আয়ত্ত করা যায় না। এ-সব থেকেও হয়তো উত্তরোত্তর দুরূহ হয়ে পড়ে স্বতশ্চঞ্চল, ধাবমান বা বিলীয়মান, জলস্রোত, অনল, অনিল (বাষ্প-ধূম-কুহেলী), বৈজয়ন্তী, বসন ও সর্বাশ্রয় শূন্যের অঙ্কন। অম্বর শব্দের মুখ্য অর্থটি উপেক্ষণীয় নয়— অবাস্তব অথচ নিত্য, নিকট অথচ সুদূর, সীমাহীন তাই

সর্বব্যাপী, এই আকাশ স্বভাবসচল না হলেও সদাগতি বায়ুর অনন্ত আশ্রয় এবং দিবানিশার প্রহরে প্রহরে তাঁরই লীলায় আসলে অব্যয় অবিকার হয়েও কার্যতঃ বহুরূপী বা অনন্তরূপ, সুতরাং নিত্যচলমান। সীমাবদ্ধ পাটাতনে পটে বা ভিত্তিতলে, স্থূলের আশ্রয়ে ও স্থূল উপায়ে উপকরণে, যেটি অসীম ও অতিসূক্ষ্ম, নিরাকার, তারই ব্যঞ্জনা-সৃজন কত কঠিন বলা যায় না। তবে, চিত্রোৎকর্ষের গণনায় 'এহোত্তম— আগে কহ আর' আমাদের তা বলতে হয় নি, ঋষি নিজেই বলেছেন, বায়ু থেকে, আকাশের থেকে, বহুগুণে সূক্ষ্ম ও নিরাকার হল জীবচেতনা— জড়রূপের আশ্রয়ে ঐ সূক্ষ্মতম 'বস্তু'টি কখন আছে আর কখন নেই এঁকে দেখানো অসাধ্য বা অযত্নসাধ্যই বলা চলে। ভালো কথা। সাধ্যের এই সীমায় এসে তবে চিত্রী ও চিত্ররসিক দর্শক ক্ষান্ত হোন? না, এখানেও নয়। সূক্ষ্মকে ফোটানো কঠিন বৈকি— স্থূলকে, বর্তুলকে গোচর করা তদপেক্ষা সহজ নয়, যখন আশ্রয় হল ভিত্তি বা পটের মতো সমতল মাত্র। কাজেই এটি অতিদুরূহ, হয়তো বা দুরূহতম। তাই প্রাচ্য অথবা পাশ্চাত্য ধ্রুবচিত্ররীতি ব্যতীত অন্যত্র এ দিকে বিশেষ কোনো চেষ্টাও দেখা যায় নি।

এ পর্যন্ত চিত্রসূত্রানুবাদ দিয়েই পূর্বে আমরা ক্ষান্ত হয়েছি। পরের শ্লোকটি এ প্রসঙ্গের অন্তিম শ্লোকও বলা চলে, যেহেতু অতঃপর সাধারণ কথাই আছে, কোনো বিশেষ কথা নেই। সেই শ্লোকটি হল—

এতেষাং খলু সর্বেষামানুলোম্যং প্রশস্যতে।
সম্মুখত্বমথৈতেষাং চিত্রে যত্নাদ্‌বিবর্জয়েৎ।

শ্রীমতী ক্রাম্‌রীশ-কৃত অনুবাদ: In painting (one) should carefully avoid, in case of all these, placing one (figure) in front of another. In every case (their) regular succession is praiseworthy.

অর্থাৎ, চিত্রে একটি রূপের বিন্যাসে দেখো যেন অন্য রূপের আবরণ না হয়। রূপগুলি যথোচিত ক্রমে সাজানো সর্বদাই প্রশংসার যোগ্য। —অসংগত কথা কিছু নয়, হয়তো স্পষ্ট ক'রে বলাও দরকার, একটু তবু হতাশ না হয়েও পারি নে।

ফলতঃ, এই শ্লোকের ওই-প্রকারই বাংলা অনুবাদ লিপিবদ্ধ ক'রে বর্তমান লেখক বড়ো বিজ্ঞতা-সহকারেই সঙ্গে সঙ্গে পাদটীকা জুড়েছিলেন: উত্তম প্রস্তাব, কিন্তু এ সময়ে এখানে কেন! অতিমূর্খ আধুনিকের এই অবিনয়েও প্রাচীন ঋষির মৌনভঙ্গ হয় নি। কাজেই, নিরুত্তর ঐ প্রশ্নটি কয়েক দিনরাত্রির সঙ্গী হয়ে রইল। স্বপ্নে ভগবান্ মার্কণ্ডেয় কখন দেখা দিলেন জানি নে— আজ নিদ্রাভঙ্গে হঠাৎ মনে হল, উত্তর তো পাওয়াই গিয়েছে। এখন আর সন্দেহ নেই যে, শ্লোকটি মোটেই

অনাহূত আকস্মিক বা অসার্থক নয়, এই মুহূর্তেই বিশেষ মনোযোগের অযোগ্য যে তাও নয়। কেন, সে কথা বিশদভাবেই বলা দরকার।

নিঃশেষ তাৎপর্য ধরা দেয় নি, বিদুষী ক্রামরীশও ভুল করেছেন, উক্ত শ্লোকে বিধির আগে নিষেধে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে, 'আনুলোম্য' শব্দের পরিবর্তে 'সম্মুখত্ব' শব্দকেই মুখ্য ভেবে। নিষেধ অপেক্ষা বিধিকে সর্বদাই বেশি গুরুত্ব দেওয়া ভালো। এটিও দেখতে হয়; উদ্‌ধৃত শ্লোকে বিধি আর নিষেধ সে কি একই বক্তব্যের এ পিঠ আর ও পিঠ। তা হয়তো নয়। নয় ব'লেই এখানে এই উক্তির চরম প্রাসঙ্গিকতা ও পরম বিস্ময়। আসলে কী সেই প্রসঙ্গ? কোথায় সেই চমৎকারিত্ব? সে হল এই—

রূপগুলি যথোচিত বিন্যাসে পর পর সাজাবে (ভালো গ্রুপ ফোটো তুলতে হলেও ন্যূনতম প্রয়োজন) এটুকু মাত্র বলবার জন্য পারম্পর্য, ক্রম, যথাক্রম, সুবিন্যাস, সন্নিবেশ ও শৃঙ্খলা, কত কথাই তো ছিল— আনুলোম্য এই পারিভাষিক শব্দটির প্রয়োগ হ'ত না। অনুলোমগতি একটি বিশেষপ্রকার গতি, তার একটি নির্দিষ্ট প্রস্থানভূমি ও নির্দিষ্ট লক্ষ্য আছে। সেই গতির দিগ্‌দেশ পাশাপাশি পর-পর নয়, পরন্তু **পশ্চাদগ্রে** একটির অনু-সরণে এগিয়ে আসছে অন্য রূপ এমনই— **এগিয়ে আসছে**, কেননা রঙ্গমঞ্চে অথবা চিত্রেও দর্শককে প্রত্যাখ্যান করা চলে না, পাত্রপাত্রী অধিকাংশ সময়েই দর্শকের অভিমুখ না হলে চলে না— ভাবান্তরে তা হলে বলতে হয়, এই অনু-লোম গতি রূপের অগ্রগতি বা প্রগতি মাত্র। তদ্‌বিপরীত হলে বলতেই হ'ত প্রতি-লোম গতি বা প্রাতিলোম্য, চিত্রী বা চিত্ররসিকের দিকে পিছন ফিরে প্রত্যাবর্তন দূর থেকে দূরে, হয়তো নিরাকারে। চিত্রসূত্রের সেটি বিষয় হতে পারে না।

অনুলোম বিবাহের সাদৃশ্য স্বভাবতঃই মনে আসে, যে ক্ষেত্রে কন্যা (প্রকৃতি) বরমাল্য হাতে এগিয়ে এসে, সামাজিক মর্যাদায় অগ্রে-স্থিত উচ্চ বর্ণের পুরুষকে বরণ করেন। তত্ত্বদৃষ্টিতে প্রকৃতিই কার্যকারিণী ও সঞ্চারিণী, পুরুষই অকারী এবং স্থির।

এ কথা নূতন নয়। অজন্তাগুহাচিত্রে রূপসন্নিবেশের ব্যাখ্যায় ও বিশ্লেষণে শ্রীমতী ক্রামরীশ বিশেষ ভাবে বুঝিয়েছেন: It does not lead away, but it comes forth।[১৯] রূপরসিকের দৃষ্টি তৃতীয় আয়তনের দূরে বা গভীরে নিয়ে যায় না, সেই পশ্চাদ্‌ভূমি থেকে দর্শকের দিকে এগিয়ে আসে। এই অগ্রগতির প্রকৃত তাৎপর্য-নির্ণয়ে মনস্বিনী লেখিকা কিছুমাত্র ভুল করেন নি যখন বলেছেন, অগ্রগতিশীল এই রূপরাজি do not aim at giving a picture of the world as it is beheld by the eye··· [but] show it as it exists

in the mind।[১৯] চোখে দেখারই প্রাকৃত বিভ্রম উৎপাদন করতে চায় এমন নয়— তদ্‌গতচিত্ত চিত্রীর মননে ও ধ্যানে ত্রিলোকের রূপ মানসগহন থেকে যেভাবে উঠে আসে, এগিয়ে আসে, কদাচিৎ ঊর্ধ্ব থেকে 'জাগ্রত চেতনা'র পাদপ্রদীপের সামনে নেমেও আসে, সেই ভাবটি পরিস্ফুট ক'রে ধরে।

অজন্তা চিত্রে ও আলোচ্য চিত্রসূত্রে কী আশ্চর্য মিল! আনুলোম্য শব্দ ক্ষুদ্র একটি বীজের মতো, তার অভ্যন্তরে অতি বিশাল তাৎপর্য নিহিত। তিন-আয়তন (ত্রিমাত্র) রূপের উল্লেখের সঙ্গে সঙ্গেই তিন-আয়তনের দিগ্‌দেশটিও (three-dimensional space) দেখিয়ে দিতে হল। অথচ বাস্তবের হুবহু অনুকৃতিও নয়। যেমন রূপ তেমনি তার আশ্রয়, তার অবাধ সঞ্চরণক্ষেত্র, মননে গড়া, ধ্যানে আবিষ্কৃত। পাশ্চাত্য ধ্রুবচিত্ররীতির থেকে ভারতীয় ধ্রুবচিত্ররীতির এখানেই পার্থক্য।

চিত্ররূপ দর্শকের অভিমুখী হলেও, সোজাসুজি সম্মুখীন হবে কি? হয়তো তাও নয়। আধ' চলনি, আধ' বলনি, আধ' অধরে আধ' হাসি, রসিকজন জানেন, সেটিই বড়ো মনোহারী হয়ে থাকে। অথবা, কবিত্বের কথা থাক্— চিত্র যেমন অন্তর্‌মুখ বা অরূপে-আবৃত নয়, তেমনি যে একেবারেই বহির্‌মুখ তাও নয়। সুতরাং, নির্ভাঁজ সম্মুখত্বেও তার আত্মস্থিতির বিচ্যুতি আর গভীর তাৎপর্যের হানি হয়। কাজেই, একান্তবর্জনীয় সম্মুখত্বের দুটি অর্থ হতে পারে— এক, চিত্রের রূপরাজি নানারঙা ছায়াবাজির ছায়াছবিনিচয়ের মতো সম্মুখীন একটি সমতলে ভেসে উঠেছে মাত্র; আর-এক, দর্শকের দিকে সম্পূর্ণই মুখ ফিরিয়ে আছে, সোজাসুজি চেয়ে আছে।[২০]

১৯ দ্রষ্টব্য: *A Survey of Painting in the Deccan (1937)*

২০ মনে রাখা উচিত, সব নিয়মেরই সার্থক ব্যতিক্রম আছে। বহু বুদ্ধমূর্তি রয়েছেন সম্মুখীন, সুখাসীন। বহু বিষ্ণুমূর্তি বা সূর্যমূর্তিও দেখা যায় (যেমন কোণার্ক-রেখদেউলের দক্ষিণ এবং উত্তর -স্থিত পার্শ্বদেবতা) শুধু সম্মুখীন কেন, দণ্ডসদৃশ ঋজু এবং দণ্ডায়মান। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই 'সম্মুখত্ব' আমাদের চোখের দেখায়। অভিনিবেশসহ দেখলে, আসলে ঐ-সব বিগ্রহ বিশ্বতোমুখ বা অন্তর্‌মুখ— আপন অন্তরের অসীম শমতায় আপনি বিধৃত। এ ক্ষেত্রে রুশদেশীয় মিস্টিক উস্‌পেন্‌স্কির অদ্ভুত দর্শনের কথা স্বতঃই মনে পড়ে। মিশরের বালু-প্রান্তরে রহস্যময় স্ফিংক্স্ মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর মনে হয়, সে মূর্তির অসিথরধার বৈনাশিক দৃষ্টিতে নিখিল অস্তিত্বই লুপ্ত হয়ে যায়, 'না' হয়ে যায়; পক্ষান্তরে সিংহলের অখ্যাত কোনো তথাগতবিগ্রহের পদপ্রান্তে এসে অনুভব করলেন, সে দৃষ্টি নিখিল অস্তিত্বের পরপারে কোন্ অনন্তে প্রসারিত কে জানে, তবু কোনো সত্তাকেই অস্বীকার করে না, সর্বভূত সকল প্রাণীর প্রতিই অসীম মৈত্রী এবং করুণায় পরিপূর্ণ।

অতএব, চিত্রসূত্রের যথার্থ শেষ শ্লোকে অশেষতাৎপর্যপূর্ণ কথাটি এই বলা হয়েছে—

০একটির অনুসরণে আর-একটি এই ভাবের অনুলোম গতিতে চিত্রের রূপরাজি যদি দর্শকের দিকে এগিয়ে আসে (যেমন অজন্তায়, যেমন বাগগুহায় শ্যামঘনপুঞ্জিত হস্তী-আকারের অপূর্ব শোভাযাত্রায়) সে বড়ো প্রশংসনীয়। সম্মুখীন একটি সমতলে রঙিন ছায়াবাজির মতো স্থির বা সঞ্চরণশীল এ ভাব যেমন বিশেষভাবে বর্জনীয়, দর্শকের দিকে অথবা বাহিরের দিকে পুরোপুরি মুখ ফিরিয়ে আছে এমন হলেও তাৎপর্যের হানি এবং ভাবের লাঘব হয়— সুতরাং সে ভাবও সযত্নে পরিহার করবে।

প্রসঙ্গ পরিবর্তনের পূর্বে, শাস্ত্রকার সাধারণভাবে এই কথাগুলি বলেছেন—

০আলেখ্যগত রূপ সম্পর্কে যেমন যেমন বলা হয়েছে সুবর্ণ রৌপ্য তাম্রাদি -নির্মিত মূর্তি সম্পর্কেও সেই কথা। শিলা দারু লৌহেও অনুরূপ বিবিধ বিধানে প্রতিমানির্মাণ সম্ভবপর হবে। সেই সব পুত্তলিকা ঘন (নীরন্ধ্র) এবং সুষির (ফাঁপা) উভয়প্রকার হয়ে থাকে। উদ্দেশ মাত্র দেওয়া গেল, বহু শত বৎসরেও বিস্তার করে বলা যায় না। যা-কিছু বলা হল না নৃত্যোপদেশ থেকেই বুঝে নিতে হবে। নৃত্যে যা বলা হয় নি তা চিত্রেও (আলেখ্য ও মূর্তি এই ব্যাপক অর্থে ?) যোজনা করবে না।

০চিত্র কলাসমূহের মধ্যে প্রবর এবং ধর্মকামার্থমোক্ষদ। যে গৃহে চিত্র প্রতিষ্ঠিত মুখ্য কল্যাণও সেখানে। পর্বতসমূহের মধ্যে যেমন সুমেরু শ্রেষ্ঠ, মানব-সমাজে যেমন নৃপতি, জগতের কলারাজ্যে শ্রেষ্ঠ তেমনি চিত্রকল্প— চিত্রকল্পনা তথা চিত্রকল্পবৃক্ষ।

ইতি শৃঙ্গারাদিভাবকথনম্। সমাপ্তং চিত্রসূত্রম্।

অতঃপর মূর্তি বা প্রতিমা -নির্মাণের প্রসঙ্গ।

সম্মুখীন থাকা না-থাকার নিষেধ বা বিধি চিত্র মূর্তি উভয়ের সম্পর্কেই সমভাবে প্রযোজ্য মনে হয়, তাই মূর্তির কথাও আলোচনা করা গেল। চিত্র থেকে এ বিষয়ে মূর্তির তফাৎ এই যে, অর্ধমূর্তি বা ঈষদুৎকীর্ণ মূর্তি না হলে, যে মূর্তির ভঙ্গীটি সম্মুখীন, তাকেও পাশ থেকে দেখা যায়, তখন আর 'সম্মুখত্ব' থাকে না। যা হোক, চিত্রে বা মূর্তিতে ভঙ্গীর সম্মুখত্ব প্রশংসনীয় না হলেও, ভারতীয় রূপকলায় উক্ত সম্মুখত্বের বিচারও স্থূল দৃষ্টিতে করা যায় না এটুকু মনে রাখা দরকার।

চিত্রকে বহু স্থলেই আলেখ্য বলা হয়েছে, চিত্রাঙ্কন অর্থে চিত্রলিখন বা শুধুই লিখন এ প্রয়োগও অবিরল। চিত্র যে শিল্পীর মনোময়ী রচনা, সাবলীল স্বচ্ছন্দ তুলি-চালনার প্রত্যক্ষ পরিণাম, এ কথা তাই বিশেষভাবেই স্পষ্ট।

চিত্রকে কলাসমূহের মধ্যে প্রবর বলাও আশ্চর্য নয়। হিন্দুশাস্ত্রকারগণ হরি হর ইন্দ্র চন্দ্র লক্ষ্মী সরস্বতী মনসা ঘেঁটু যখন যাঁর কথা বলেন তাঁকেই শ্রেষ্ঠ বলতে ছাড়েন না, সে হয়তো ঋষিগণের অসামান্য সমদৃষ্টির ফল। হয়তো সকলেই শ্রেষ্ঠ এরূপ অর্থে যে, সংগীতের যে বিশেষ ক্ষমতা চিত্রে তা নেই, আর চিত্রের যে বিশেষ শক্তি সেও সংগীতে থাকতে পারে না। উপস্থিত প্রসঙ্গে এটুকু স্থির, চিত্র সর্বশ্রেষ্ঠ কলা নাই হল, শ্রেষ্ঠ চার-পাঁচটি কলার মধ্যে সে অন্যতম। সে যা হোক, অন্তিম শ্লোকেরও অন্তে হঠাৎ 'চিত্রকল্প' শব্দে চকিত বিভ্রান্ত হতে হয়। 'কল্প'— এ কি শুধু পাদপূরণে অনর্থক দুটি ধ্বনিদলের বিন্যাস? ন্যূনার্থ বা তুল্যার্থ অবশ্যই টেনে আনছে না। কাজেই, কল্পনা বা সৃজন এই অর্থই সংগত। তবে, একটি শ্লোকে পূর্বেই যে বলা হয়েছে চতুর্বর্গ দান করে চিত্র, সেও কিছু নিছক অতিশয়োক্তি নয়। যেহেতু, কল্যাণ (ধর্ম), প্রীতি (কাম), ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় (অর্থ), এবং জীবন্মুক্তি (মোক্ষ)[২১] —এ-সবই সার্থক শিল্পরূপের প্রত্যক্ষ ফল বা আগামী পরিণাম সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নেই। অন্তত ভারতীয় শিল্পপরম্পরায় (আচারে ও বিচারে) এটি স্বতঃই স্বীকৃত। সুতরাং কল্পবৃক্ষের দ্যোতনাও অনিবার্যই বলা যেতে পারে।

মার্কণ্ডেয় ঋষি প্রকরণব্যাখ্যাতা ও বিশেষবিৎ সত্য, তত্ত্বচিন্তাও নিশ্চিত তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ নয়— আর, কবিযোগ্য উক্তিতেও তাঁর অধিকার থাকবে না কেন? কেননা, এক দিকে যা প্রত্যক্ষে নেই, স্মৃতিতে বা দূরপ্রসারিত ধ্যানে মাত্র আছে, অন্য দিকে যা হল অশরীরী, অপ্রত্যক্ষ— উভয়কেই আনন্দময় এবং উজ্জীবিত রূপ দিয়ে বরণ করা হল চিত্র বা মূর্তি -কলার বিশেষ কার্য, সেই তো ভারতীয় প্রতিভার অনুপম বৈশিষ্ট্য, মার্কণ্ডেয় ঋষি তারই অন্যতম ব্যাখ্যাতা।

জোড়াসাঁকো
৭ ডিসেম্বর ১৯৫৮

২১ বর্তমান গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধে এ বিষয়ের যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা আছে।

ভারতশিল্পতত্ত্বে উৎসুক গবেষণার্থীদের জন্য প্রচুর দিগ্‌দেশের সন্ধান দিয়ে, পণ্ডিত শ্রীহরিদাস মিত্র যে মূল্যবান্ গ্রন্থখানি* লিখেছেন, ইতিপূর্বে দেখার সাহস বা সুযোগ হয় নি। প্রবন্ধরচনার পরেই উক্ত গ্রন্থের অভ্যন্তরে ইতস্ততঃ দৃষ্টি-নিক্ষেপে জানা গেল, শুধু যে ভারতশিল্পশাস্ত্রের পুঙ্খানুপুঙ্খ তালিকা সংকলিত তাই নয়, ভূমিকাংশে প্রচুর তথ্যেরও সন্নিবেশ। এই বিলম্বিত আবিষ্কারে 'হরিষে বিষাদ' উপস্থিত হল একাধিক কারণে— প্রথমতঃ এ-সব তথ্য যথাস্থানে হরণ বা আহরণ করা গেল না, দ্বিতীয়তঃ আমাদের পূর্বসঞ্চিত ধ্যান ধারণা অনুমানের সঙ্গে সব তার মেলাতে পারি নে। এ বিষয়ে যৎসামান্য আলোচনার মুখবন্ধেই মিত্রমহাশয়-ধৃত সমরাঙ্গনসূত্রধারের একটি শ্লোককেই সূত্রধারকৃত্যে আহ্বান করি—

> ন বেত্তি শাস্ত্রবিৎ কর্ম ন শাস্ত্রমপি কর্মবিৎ।
> যো বেত্তি দ্বয়মপ্যেতৎ স হি চিত্রকারী বরঃ॥

প্রায়শঃই শাস্ত্রবিৎ কর্মকৌশল জানেন না আর কর্মবিৎ জানেন না শাস্ত্র, যিনি উভয়ই জানেন তিনিই শ্রেষ্ঠ চিত্রকারী[১]।

প্রথম কথা, নারায়ণ ভূমিতলে রূপ লিখে উর্বশীর সৃষ্টি করলেন এ যেমন অসংগত কল্পনা নয়, স্বীয় উরুদেশে অঙ্কন করে ঐ ভুবনমোহিনীকে জন্ম দিলেন এই বা কেন অশ্রদ্ধেয় হবে? আম্ররস অত্যন্ত কণ্ডূতিজনক, এবং উক্ত স্থলে চিত্রাঙ্কন শিষ্টসম্মত নয়, মিত্রমহাশয়ের এ দুটি আপত্তির কোনোটি তেমন প্রত্যয়জনক মনে করি নে। কেননা, সত্ত্বগুণে নারায়ণের সঙ্গে সাধারণ নরের তুলনাই হয় না, আর কণ্ডূয়নই হয়তো বাঞ্ছিত[২]— দিব্য অঙ্গ থেকে দিব্যাঙ্গনার জন্মলাভে অনেক বেশি তাৎপর্য এবং সংগতি আছে। বিশেষতঃ অন্যান্য পুরাণেও যখন এরূপ কাহিনী রয়েছে, অন্যান্য মহারাজ বা মহাতপার অঙ্গ থেকেও অপত্যোৎপত্তি হয়েছে— বেণের দক্ষিণ বাহু থেকে পৃথুর জন্ম আর মহর্ষি উর্ব- কর্তৃক স্বীয় উরু-মন্থনে ঔর্ব-নামা পুত্রের সৃজন। প্রাচীনেরা মানবদেহের প্রতি অঙ্গে বিভিন্ন দেবতার অধিষ্ঠান দেখেছেন, উরুদেশও নিন্দিত নয়। মহাভারতে আছে, দেবী

* *Contribution to a Bibliography of Indian Art and Aesthetics* (1951)

১ শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রবিৎ না বলার কারণ কী?

২ শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় বলেন: উক্তি আঁকার প্রসঙ্গ নয় তো?

সুরধুনী প্রতীপের বাম উরুদেশে বসেন নি বলেই হলেন না বধূ, স্মিতহাস্যে তপস্বী বললেন, দক্ষিণ উরুতে স্থান কন্যার, সুষার।[৩]

ফলতঃ উরু থেকে উর্বশীর উৎপত্তি তাৎপর্যহীন বা অসুন্দর নয়, বরং তার বিপরীত, এবং আমাদের কালের (বর্তমান ভারতভূমির) শ্লীল-অশ্লীলের বোধ রামায়ণ-মহাভারতে, পুরাণে, এমন-কি বেদেও, আরোপ করার কোনো সার্থকতা নেই।

কিন্তু, 'এহ বাহ্য'। উর্বশী হয় তো হয় নি, হবে না। সমস্তটাই যখন কবি-কল্পনা, তার ভাবগ্রহ প্রয়োজন— তথ্যগ্রহের সম্ভাবনা কোথায়? আমাদের দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয়ের অনুরূপ গুরুত্ব আছে।

দৃষ্টং সুসদৃশং কার্যং সর্বেষামবিশেষতঃ।
চিত্রে সাদৃশ্যকরণং প্রধানং পরিকীর্তিতম্।

বিষ্ণুধর্মোত্তরের এই শ্লোকের তাৎপর্য-নির্ণয়ে বিভিন্ন সময়ে পণ্ডিত গিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ (১৯২২), শ্রীমতী স্টেলা ক্রাম্‌রীশ (১৯২৪) এবং সম্প্রতি শ্রীহরিদাস মিত্র (১৯৫১) প্রায় অভিন্নমত হয়েছেন বলে সন্দেহ হয়। The chief (aim) of painting is to produce an exact likeness : শ্লোকার্ধের এরূপ ভাষান্তর শ্রীমতী ক্রাম্‌রীশ -কৃত এবং মিত্রমহাশয়ের উদ্‌ধৃত হলেও আমাদের সংশয় তবু ঘোচে না, পূর্বপ্রত্যয়ও অক্ষুণ্ণ থাকে। 'সুসদৃশ' শব্দের অর্থ 'সুন্দরভাবে সদৃশ' করলেই যখন কোনো অসংগতি থাকে না, অন্য দেশকালের অনুরূপ মনোগত আদর্শ ও চিত্রভাবনা এনে আমাদের মহিমময় অতীতে অনুচিত আরোপ করা কেন? 'exact likeness' ভারতীয় চিত্রমূর্তির পরম্পরায় (তেমনি কাব্যপুরাণের সুপ্রচুর আখ্যানে ও বর্ণাঢ্য বর্ণনায়) কোথায় দেখা যায়? ঐ-দিকেই-মুখ-ফেরানো গান্ধার মূর্তিকলার যে একটা বন্ধ্য প্রয়াস, সে ঠিক এ দেশের নয়। সিন্ধুসভ্যতার বিস্ময়কর রূপকলাও যে গ্রীক বা গান্ধার মূর্তির নিকটতম জ্ঞাতি এ কথা কেউ বলেন না। যদি বা বলেন, বিষ্ণুধর্মোত্তর-সংকলন-কালে হরাপ্পা-মহেঞ্জদারোর শিল্পনিদর্শন কত হাত মাটির নীচে লুক্কায়িত ছিল কে বলবে। হুবহু নকলের শিক্ষানবিশি কোথাও তো দেখা যায় না (মোগল বাদশাহির পূর্বে সে চেষ্টাই হয় নি), আর সমস্ত শিল্প-শাস্ত্র ঘেঁটে (আমাদের সে বিদ্যাবুদ্ধি নেই) তদুপযোগী রীতিপদ্ধতির ইঙ্গিত পাওয়া যায় কি? লৌকিক দেশকালের পারে অলৌকিক কলা-উৎপত্তির কাহিনী তাৎপর্যহীন মনে করলেও, যেখানে মূর্তি বা আলেখ্য -রচনার পুঙ্খানুপুঙ্খ উদ্দেশ এবং উপদেশ রয়েছে বিষ্ণুধর্মোত্তরে এবং আরও অনেক শাস্ত্রে বা পুরাণে, শিক্ষার্থী

৩ গবেষণায় হয়তো জানা যাবে, উর্বশীর জন্ম নারায়ণের দক্ষিণ উরু থেকে।

হোন, সিদ্ধশিল্পী হোন, তাঁর ক্রিয়াসাধক সম্বল বলতে শাস্ত্রনির্দেশ, মানসী স্মৃতি, মনোময় আদর্শ, ধ্যান ও ভাবসমাধি ছাড়া কোথাও অন্য কোনো-কিছুরই উল্লেখ দেখা যায় না। —

আলিখেৎ কিট্টলেখিন্যা সুমুহূর্তে সুলগ্নকে
স্বস্থচিত্তঃ সুখাসীনঃ স্মৃত্বা স্মৃত্বা পুনঃ পুনঃ।[৪]

অহেতুকৃপণা 'অপরাপ্রকৃতি'র কাছে 'exact likeness' -আদায়ের প্রক্রিয়া যে অন্যরূপ, তার কত কষ্ট, কত বিচিত্র তোড়জোড়, সে শুধু পাশ্চাত্য শিল্পীরাই ভালো করে জানেন— আমাদের জানা নেই আর প্রয়োজনও হয় না।

কাজেই, 'সুসদৃশ' বা 'সাদৃশ্য' বললেই ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের সঙ্গে মানসকল্পনা হুবহু মেলানোর প্রসঙ্গ ওঠে না। চিত্রে বাস্তবের মতো গড়নের বা বর্তুলতার আভাস দেখানোই উক্ত 'সাদৃশ্য' মনে করা যেতে পারে— 'ষড়ঙ্গ'-গত শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যা যদি এ ক্ষেত্রে না'ই গ্রাহ্য হয়— অপ্সর কিন্নর দেবতা সামনে এসে না দাঁড়ালে, মানুষকে হয়মুখ বা বিহঙ্গদেহী বা ত্রিনেত্র চতুর্ভুজ না করা সেও এক-প্রকার বাস্তবতা। তা ছাড়া, ঠিক আজকালকার মতো অনুকৃতি বা প্রতিকৃতি রচনা না করলেও, চিত্রে বা মূর্তিতে টাইপ-সৃজন, বিশেষ ভাব এবং বিশেষ ব্যষ্টি বা সমষ্টি বিগৃহীত হয় এমন বিগ্রহ-বিরচন ও বিশেষপ্রকার ব্যঞ্জনা-সৃজন, সেকালের দৃষ্টিতে এটিও তো অল্প সাদৃশ্যসাধন নয়। এ হিসাবে গান্ধার বুদ্ধমূর্তিতে যে-প্রকার বাস্তবতা ও সাদৃশ্য আছে তা না থাকলেও, ভারত এবং বিশাল ভারতের যাবতীয় বুদ্ধমূর্তিতে ও চিত্রে বিশেষ একটি সাদৃশ্যই আছে— কোনো কালের কোনো-এক ব্যক্তির সাদৃশ্য না হলেও, চিরকালীন এক ভাবের সাদৃশ্য। বিভিন্ন জাতির এবং হিন্দুজাতির অন্তর্গত বিভিন্ন শ্রেণীর বিস্পষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে অজন্তার ভিত্তিচিত্রে। দক্ষিণভারতের বহু মন্দিরে মন্দিরস্থাপয়িতা বহু নৃপতি বা শ্রেষ্ঠী, সভার্যা, বিনম্রস্মিতদৃষ্টি, ধৃতকৃতাঞ্জলি, আজও দণ্ডায়মান আছেন জানি। সেই-সব অপূর্ব মূর্তিতে 'সৌসাদৃশ্য' আছে, টাইপ-সৃজনেরও অদ্ভুত সার্থকতা আছে জানি— কিন্তু কোনো ক্ষেত্রেই 'exact likeness' আছে যে এ কথা কেউ বলবে না।

ফলতঃ, যে চিত্র 'সত্য' তারও লক্ষণ-নির্দেশে যৎকিঞ্চিৎ লোকসাদৃশ্যের কথাই বলা হয়েছে, তার বেশি মার্কণ্ডেয় ঋষির ধ্যান-ধারণায় ছিল কি? স্থানান্তরে তাকেই বলা হয়েছে সৌসাদৃশ্য, অর্থাৎ সুন্দর সাদৃশ্য। যেমন 'হিতং মনোহারি চ বচঃ' প্রাচীনের স্পৃহনীয় ছিল, যেমন 'সত্যং বদ প্রিয়ং বদ— সত্যকে অপ্রিয় করে বোলো না' ছিল তাঁদের উপদেশ, তেমনি স্থূল সত্যে, বাস্তব সত্যে তাঁদের অনাদর

৪ শিল্পরত্নম্। ষোড়শ শতকের শেষার্ধে (?) কেরলদেশীয় ব্রাহ্মণ শ্রীকুমার রচনা করেন।

বা অনভিনিবেশ না থাকলেও, সততই তাকে গ্রহণ বা দান করেছেন ধ্যানের নয়নে রূপান্তরিত আর হৃদয়ের রসায়নে রঞ্জিত ক'রে। এমন-কি প্রতিকৃতিচিত্রেও তার অন্যথা হয় নি, দৃষ্টান্তনির্দেশে সে কথা পূর্বেই বলা গেল।

পরবর্তী কালে মানসোল্লাসে বা শিল্পরত্নে বিদ্ধ চিত্র বা চিত্রের প্রসঙ্গ আছে। তার লক্ষণে বলা হয়েছে : সাদৃশ্যং লিখ্যতে (দৃশ্যতে) যৎ তু দর্পণে প্রতিবিম্ববৎ। এই উক্তির সঙ্গে অষ্টাদশ শতকীয় এক তিব্বতী পুঁথির বক্তব্যের তুলনা করেছেন শ্রীমতী ক্রাম্‌রীশ। শেষোক্তের সম্যক্ পরিচয়ের অভাবে সে সম্পর্কে, অবশ্য, কিছুই বলা চলে না। শ্রীহরিদাস মিত্র বলেন, বিদ্ধ হল প্রতিকৃতি-চিত্র। তা হতে পারে, না হতেও পারে। তবু, ভারতবর্ষীয় ধারাবাহী শিল্পনিদর্শনের অজস্র সাকার সাক্ষ্যবচনের কিছু পরিবর্তন হয় না। কাজেই, প্রতিবিম্ববৎ সাদৃশ্যও 'হুবহু নকল' এমন মনে করবার হেতু নেই।

প্রাচীনদের ভাষায় কখনো কখনো বড়োই কৃপণতা ছিল, আসলে সেটি পরম উদারতারই আর-এক রূপ। তাই বড়ো জমিদারকেও তাঁরা সসাগরা ধরিত্রীর সম্রাট্ বলতে কুণ্ঠিত হতেন না। তাঁরা জানতেন, পাঠকমাত্রেই ভাবগ্রাহী জনার্দন। (হায় রে সেকাল!) ভূমি বা ভিত্তি -গত ছায়াতে যেমন দৈর্ঘ্য প্রস্থ মাত্র আছে, দর্পণগত প্রতিচ্ছায়ায় তারও বেশি আছে গড়নের বা নতোন্নত ভাবের অনুভব, আছে বিশেষ বিশেষ ভাবব্যক্তি ও বর্ণের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম ভাতি— হয়তো উপমাচ্ছলে এটুকু বলাই ছিল তাঁদের অভিপ্রায়। 'বসেৎ গঙ্গায়াম্' বললেই লোকটা গঙ্গায় ডুবে মরবে এ কথা তাঁরা ভাবেন নি। মোট কথা, বিদ্ধচিত্রও পরম্পরা-ধৃত, অথচ বাস্তব-ঘেঁষা— আলংকারিক (decorative) বা অবচ্ছিন্ন (abstract) রূপরীতির নিদর্শন নয় এই পর্যন্ত।

সে কালের শাস্ত্র-অনুধাবনে এ কালের ভাষাই ব্যবহার করা গেল। (এ কালের আদর্শ সে কালে প্রক্ষেপ করা হবে না, এই আমাদের প্রযত্ন।) মনুষ্যপ্রতিকৃতির কথাই যদি হয়, সেটি যে অনুকৃতির অনুকূল ক্ষেত্র সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু, তাতেও ভারতীয় আদর্শের বৈশিষ্ট্য কোথায়, দৃষ্টান্ত-ইঙ্গিতে পূর্বে তা বলা হয়েছে। অথচ কী বা বলতে পারি! মিষ্টভোজন ক'রে বোবা যদি কিছু বলতে চায় সাহ্লাদে (শ্রোতা নাই বা হল বধির) কতটুকুই বা ব্যক্ত করতে পারে? ভারতীয় প্রতিকৃতি-রচনার আদর্শ সম্বন্ধে সার-কথা পেয়েছি শ্রীঅরবিন্দের ভাস্বর বাক্যে, সেটুকু এখানে তুলে দিই : the Indian artist tones down the outward-going dynamic indices and gives only so much of them as will serve to bring out or to modulate something that is more of the grain of the subtle soul, something more *static and*

*impersonal of which our personality is at once the mask and the index.**

মূলের ভাবভঙ্গী অবিকৃত রেখে ভাষান্তর দেওয়া সহজ নয়, ভাবার্থ এই : ভারতীয় শিল্পী বহির্গামী প্রাণপ্রবেগকে শমিত ক'রে এমন রূপ দেন যাতে সূক্ষ্ম-স্বরূপের ভাবই কতকটা প্রকাশ পায়, সেই সুস্থির সর্বগত সত্তারই আভাস ফুটে ওঠে মানুষের ব্যক্তিসত্তা যার মুখের আবরণ এবং ইশারা মাত্র।

শ্রদ্ধেয় মিত্রমহাশয়ের ষড়ঙ্গব্যাখ্যা, ষড়ঙ্গের অন্যান্য ব্যাখ্যাতার ব্যাখ্যার মতোই সর্বসম্মত হবার আশা নেই। ভাব লাবণ্য রূপ সাদৃশ্য নিজের নিজের বুদ্ধি বিবেচনা -অনুযায়ী সকলে বোঝেন, বিশেষতঃ ষড়ঙ্গ-সম্বন্ধীয় শ্লোকটি যখন একক, বিচ্ছিন্ন। মিত্রমহাশয় 'বর্ণিকাভঙ্গ' শব্দের বিচারে 'বর্ণ'কেই মুখ্যার্থ ধরেছেন, বর্ণলেপক তূলিকে তুল্য মর্যাদা দেন নি। এ সম্বন্ধে এ যুগের বা অন্য যুগের, এ দেশের বা অন্য দেশের, চিত্রী এবং চিত্রবিদ্ ভিন্ন মত পোষণ করেন ব'লেই আমাদের ধারণা। বর্ণিকা শব্দে বর্ণ এবং তূলি উভয়ই যখন বিচার এবং ব্যুৎপত্তি -সম্মত, তখন 'কাকো নিন্দোঁ। কাকো বন্দোঁ।' স্থির করা সুকঠিন, পক্ষপাত হয়তো অনুচিত। যা হোক, আমাদের সাধ্য-মত ষড়ঙ্গের আলোচনা অন্যত্র করেছি।

এ পর্যন্ত পণ্ডিতে অপণ্ডিতে মতিভেদের কথা। এখানেই এ প্রস্তাব শেষ হতে পারে না। হরিনাম নিয়ে মাধুকরী ব্রতে বেরিয়ে, এখানেই বা শুধু-হাতে ফিরব কেন ? শ্রীহরিদাস মিত্র মহাশয়ের গ্রন্থে অভিলষিতার্থচিন্তামণি বা মানসোল্লাসের কতকগুলি শ্লোকের সঙ্গে শিল্পরত্নের 'অনুরূপ' শ্লোকাবলী মিলিয়ে দেখবার সুযোগ হয়েছে। জানা যায়, প্রথমোক্ত কোষগ্রন্থের সংকলনকর্তা দ্বাদশ শতাব্দের চালুক্য নৃপতি সোমেশ্বর আর দ্বিতীয় গ্রন্থটি ষোড়শ শতকের শেষ দিকে রচনা করেন কেরলব্রাহ্মণ শ্রীকুমার। সুতরাং, বিষ্ণুধর্মোত্তর, অভিলষিতার্থচিন্তামণি, শিল্প-রত্ন, গ্রন্থ তিনখানি অন্যূন চতুঃশতাব্দের অন্তরে অন্তরে এ কালের দিকে মুখ ফিরিয়ে অবস্থিত। শিল্পরত্নের পরেও চার শত বৎসর প্রায় শেষ হতে চলল। মার্কণ্ডেয় ঋষি চিত্রকলার মুখ্য তিনটি শ্রেণী-নির্দেশ কিভাবে করেছেন সে আমরা দেখেছি, 'চিত্রবিদ্যাবিরিঞ্চি' সোমেশ্বর এবং আরও পরে শ্রীকুমারশর্মা কিভাবের বিচার বিশ্লেষণ করেন সেটিও কম ঔৎসুক্যজনক নয়। শ্রীহরিদাস মিত্র মহাশয়-ধৃত শ্লোকই উদধৃত করি।—

* হেলানো হরপ আমাদের।
দ্রষ্টব্য : *Arya (April 1920)* or *The Significance of Indian Art (1947)*

অভিলষিতার্থচিন্তামণি

[৬] সাদৃশ্যং লিখ্যতে যৎ তু দর্পণে প্রতিবিম্ববৎ
তচ্চিত্রং বিদ্ধমিত্যাহুর্বিশ্বকর্মাদয়ো বুধাঃ।
আকস্মিকং লিখামীতি যদনুদ্দিশ্য লিখ্যতে
আকারমাত্রসম্পন্নে তদবিদ্ধমিতি স্মৃতম্।
শৃঙ্গারাদিরসো যত্র দর্শনাদেব গম্যতে
ভাবচিত্রং তদাখ্যাতং চিত্তকৌতুককারকম্।
সদ্রবৈর্বর্ণকৈর্লেখ্যং রসচিত্রং বিচক্ষণৈঃ।
চূর্ণিতৈর্বর্ণকৈর্লেখ্যং ধূলিচিত্রং বিদুর্বুধাঃ।
সুপ্রমাণং তথা বিদ্ধমবিদ্ধং ভাবচিত্রকম্
রসধূলিগতং প্রোক্তং মানসোল্লাসপুস্তকে।

সারার্থ : দর্পণস্থ প্রতিবিম্ব -হেন সাদৃশ্য থাকে বিদ্ধ চিত্রে। অনুদ্দিষ্ট বিষয়ের আকারমাত্র লেখা হয় যদি কল্পনাবলে, তাকেই অবিদ্ধ বলা হয়। দর্শনমাত্রেই শৃঙ্গারাদি রসের বোধ হয় এমন আলেখ্যই ভাবচিত্র। বিদ্ধ হোক আর অবিদ্ধ হোক, সুপ্রমাণযুক্ত ভাবচিত্র লেখা হয় চূর্ণিত অথবা দ্রবীকৃত নানা বর্ণ-যোগে।

শিল্পরত্ন

[৭] এতান্যখিলবর্ণানি চূর্ণয়িত্বা পৃথক্ পৃথক্
তৈশ্চূর্ণৈঃ স্থণ্ডিলে রম্যে কণিকানি বিলেপয়েৎ—
ধূলিচিত্রমিদং খ্যাতং চিত্রকারৈঃ পুরাতনৈঃ।
সাদৃশ্যং দৃশ্যতে যৎ তু দর্পণে প্রতিবিম্ববৎ
তচ্চিত্রমিতি বিখ্যাতং নালমাকারমাত্রকম্—
শৃঙ্গারাদিরসো যত্র দর্শনাদেব গম্যতে।
এবং হর্ম্যাদিভিত্ত্যাদৌ লক্ষ্যলক্ষণসংযুতম
লেখনীয়মিদং চিত্রং সর্বদৃষ্টিমনোহরম্।

[৬] কোনো কোনো শব্দের পাঠান্তর আছে। আমাদের বাক্যচ্ছেদচিহ্ন সর্বত্র পুরোবর্তী আদর্শের অনুগত নয়।

[৭] পূর্ববর্তী শ্লোকের শেষ পদাবলী দেখছি : চিত্রমিতি ত্রিধা। অথচ অন্য পণ্ডিত জনের বাংলা অনুবাদ পেয়েছি : এই দুইপ্রকার চিত্র। পরবর্তী শ্লোকগুলিতেও সংশয়াতীতভাবে তিনপ্রকার চিত্রের নির্ধারণ নেই। অর্থগ্রহণে তাই দ্বিধা ত্যাগ করে ত্রিধা বেছে নেওয়া গেল না। অন্বয় আমাদের বিচার-বিবেচনা-মত।

সারার্থ : এ-সকল বর্ণ পৃথক্ পৃথক্ চূর্ণ করে (জলে গুলে নিয়ে) রম্য ভূমিতে বা চত্বরে যে অচিরস্থায়ী লিখন, তাকে ধূলিচিত্র বলা হয়। আকারমাত্র নয়, পরন্তু দর্পণগত প্রতিবিম্ব -সদৃশ, দর্শনমাত্রে শৃঙ্গারাদি রসেরও উপলব্ধি হয়, সেই হল চিত্র— সকলের নয়নমনোহারী লক্ষ্য-লক্ষণ-সংযুক্ত এরূপ চিত্রই হর্ম্যভিত্তি এবং অন্যান্য স্থায়ী আশ্রয়ে লেখনীয় জানবে।

অভিলষিতার্থচিন্তামণি (মানসোল্লাস) এবং শিল্পরত্ন 'রসচিত্র' 'ধূলিচিত্র' শব্দ ব্যবহার করেছেন চিত্রের স্বরূপ-পরিচায়ক সংজ্ঞা হিসাবে নয়— গোলা রঙ ব্যবহার করা হচ্ছে অথবা রঙের গুঁড়ো এটুকু জানানোই তাঁদের উদ্দেশ্য— অর্থাৎ, চিত্রের জাতি প্রকৃতি দোষ গুণ -নির্ণয়ে ওই শব্দগুলির বিশেষ কোনো দায়িত্ব নেই। না থাকলেও, শিল্পরত্ন ধূলিচিত্র শব্দে আল্পনা বুঝিয়েছেন, প্রদেশবিশেষে যা গুঁড়ো গুঁড়ো রঙ ঝরিয়ে রচনা করা হয় আর বাংলাদেশে যা (প্রাচীন ব্যবহার -অনুযায়ী) প্রধানতঃ তণ্ডুলচূর্ণ জলে গুলে নিয়ে লেখা হয়— শিল্পরত্নে (উদ্ধৃতির দ্বিতীয় ছত্রে) 'বিলেপয়েৎ' শব্দে এরূপ প্রয়োগকৌশলের প্রতিও ইঙ্গিত রয়েছে মনে হয়। যা হোক, আলিপনা তবু চিত্র নয়। চিত্রকলার সীমান্তপ্রদেশ ভূষিত করছে মাত্র। অবশ্য, চিত্রসূত্রে এর উল্লেখের বিশেষ একটি সার্থকতা স্বীকার করাও যায়, যদি আচার্য নন্দলালের উপদেশ স্মরণ করি। তিনি বলেন, আল্পনা আঁকার সাবলীল অভ্যাসে রেখাছন্দে বা রূপচ্ছন্দে বিশেষ অধিকার জন্মে।

যা হোক, 'ভাবচিত্র' বা 'চিত্র'ই উদ্ধৃত চিত্রসূত্রাবলীর বিশেষ বিষয় (তলিয়ে দেখতে গেলে অনন্য বিষয়) তার আর সন্দেহ নেই। 'মুকুরিত প্রতিবিম্ব' বলতে কী বুঝি, সে বিষয়ে পূর্বেই বলেছি। সেই প্রত্যয়ে স্থির থেকে, এখন এটুকু লক্ষ্য করবার বিষয় যে, বিষ্ণুধর্মোত্তরের 'দৃষ্টং সুসদৃশং কার্যম্' এই উপদেশের ধারা বেয়েই এসেছে 'প্রতিবিম্ব-হেন[৮] বিদ্ধ চিত্র'। (মানসোল্লাসের ঐ উপমা শিল্পরত্ন

[৮] দর্পণার্পিত প্রতিবিম্বের উল্লেখ, হুবহু নকলের উদ্দেশে ততটা নয় যতটা মনোহারী সাদৃশ্য, মার্কণ্ডেয়কথিত সু-সাদৃশ্য, ফুটিয়ে তোলবার প্রেরণায়, তার নজির যেন পাওয়া যায় য়ুরোপের শ্রেষ্ঠ শিল্পী এবং সমঝদারের উক্তিতে। বেদ-উপনিষদের 'যথাদর্শে তথাত্মনি' উপমালংকার যদি বা হয়, দ্বাদশ শতাব্দে চালুক্য রাজা সোমেশ্বর তাই বিশেষ অর্থে শিল্পসূত্রে নিবদ্ধ করেছেন ; ষোড়শ শতকে শ্রীকুমার তা প্রতিধ্বনিত করেছেন বৈ নয় ; পরম আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যেন বা সবিশেষ ব্যাখ্যা করেছেন ব'লেই মনে হয় শ্রীকুমারের প্রায় সমকালীন পাশ্চাত্য গুণিগণ— পূর্বে পশ্চিমে কেউ কারও নাম শুনেছিলেন কিনা জানা নেই। দেশে দেশে, যুগে যুগান্তরে, রূপকলার ভাবনা ও সাধনা নিয়ে পার্থক্য যেমন আছে, স্বাভাবিক ঐক্যও নেই যে এমন হয়তো নয়। পাঠক নিজেই বিচার করবেন। *Artists on Art (1947)* বই থেকে

গ্রহণ করলেও, প্রাচীন কোনো পরিভাষাই গ্রহণ করেন নি।) রূপ বিদ্ধ হোক আর আকারমাত্রক (লাঞ্ছিত বা রেখাকার? রঞ্জিত নয়?) অবিদ্ধ হোক, শৃঙ্গারাদি রসের কোনো-একটি তার লক্ষ্য, তদুপযোগী তার লক্ষণ, এবং এইভাবে লক্ষ্যের সঙ্গে লক্ষণের সংযোগে যে-কোনো চিত্রের (বা ভাবচিত্রের) সম্পূর্ণতা বা সার্থকতা। সৌধভিত্তিতে বা অন্য স্থায়ী আশ্রয়ে আঁকা হয়ে, সাদৃশ্যগুণে দৃষ্টির বিস্ময় এবং রসের কারণে মানস তন্ময়তা যুগপৎ উৎপাদন করে। মার্কণ্ডেয়-ব্যাখ্যাত চতুর্বিধ চিত্রের ধারণা পরবর্তী কালে পরিত্যক্ত বা বিলুপ্ত হয়েছে সন্দেহ নেই, তবে 'সত্য' চিত্রের থেকে ভাবচিত্রের বিশেষ পার্থক্য আছে মনে হয় না— যে ভাবচিত্র বিদ্ধ। অবিদ্ধ ভাবচিত্রের সঙ্গে 'বৈনিক' চিত্রকে কতকটা মিলিয়ে দেওয়া চলে। আর, 'নাগর' বা 'মিশ্র' চিত্রকৃতি আলেখ্যলোকের সীমান্তবাসী, কদাচিৎ রসেও হয়তো উত্তীর্ণ হয়, প্রায়শঃই ধূলিচিত্র এবং তথাকথিত রসচিত্রের দলে ভিড়ে আলিম্পনে বা নিছক অলংকরণে নিযুক্ত থাকে। তবু আপন আপন স্থানে আর আপন আপন প্রেরণায় কিছুই একেবারে অসার্থক নয়।

এখানেই চিত্রসম্বন্ধীয় এই আলোচনা শেষ করা গেল। বিষ্ণুধর্মোত্তর প্রভৃতি গ্রন্থে আলেখ্যবিরচনের করণ উপকরণ পদ্ধতি সম্পর্কে খুঁটিনাটি আরও বহু কথা বিশদ ভাবেই বলা হয়েছে। যোগ্য ব্যক্তি জর্মন ফরাসী বা ইংরেজি ভাষায় অবশ্যই তার অর্থ উদ্ধার করেছেন বা ভবিষ্যতে করবেন। নানা রঙের নানা বস্ত্রখণ্ড কুড়িয়ে-বাড়িয়ে, চেয়ে-চিন্তে, ভারতীয় চিত্রানুশীলনের এই দরবেশী বসন-

দুজনের দুটি উক্তি এখানে সংকলন ক'রে দিই; দুজনেই ধীমান্ এবং কৃতী, একজন তো বিশ্ববরেণ্য শিল্পী। হেলানো হরফ আমাদের।—

A mirror will greatly help you to judge of *relief-effect.* And I do not know why good paintings, when reflected in a mirror, are full of *charm*; and it is wonderful how any defect in a painting shows its ugliness in the looking glass. Therefore things drawn from nature *are to be amended with a mirror.*

—Leon Battista Alberti (1404-72)

When you wish to see whether *the general effect* of your picture corresponds with that of the object presented by nature, take a mirror and set it so that it reflects the actual thing, and then compare the reflection with your picture and consider carefully whether the subject of the two images is in conformity with both, studying especially the mirror.

—Leonardo da Vinci (1452-1519)

খানির রচনা। সাধ্য আমাদের অল্প হলেও শ্রদ্ধার অভাব হয় নি, প্রচুর আনন্দও পাওয়া গিয়েছে। মনোময় সামগ্রী ব'লেই এই বিচিত্র আলখাল্লাখানা কোন্ খেয়াল-খ্যাপা ফকিরের যেমন, তেমনি সকলেরই— যার ভালো লাগে, যার মনে ধরে। পট্টবস্ত্র নয়, বহুমূল্য নয়, এ যেন মনে থাকে।

বরিষা
৩০ ডিসেম্বর ১৯৫৮

শিল্পের স্বরূপ সম্পর্কে

শ্রীশুভেন্দু ঘোষ

'শিল্পের স্বরূপ' প্রবন্ধ তিনবার পড়লাম। এটির প্রতিপাদ্য বিষয়: আদর্শ শিল্প হচ্ছে সুনীতি দুর্নীতির বাইরে। এ সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়ে দেবার জন্যে যে-সব যুক্তিতর্কের অবতারণা করেছেন সেগুলো খুব স্পষ্ট হয় নি, মাঝে মাঝে ফাঁক রয়ে গিয়েছে। বছর দুই আগে 'মাসিক বসুমতী'তে আমিও এ সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলাম, সে প্রবন্ধেরও ওই দোষ ছিল। প্রবন্ধটার নাম ছিল বোধ হয় 'সাহিত্য কেন?'[১] 'কেন' সংস্কৃত শব্দটার একটা অর্থ হচ্ছে 'আনন্দেন'। বিশ্বের সব-কিছুর অন্তরতম রহস্য হচ্ছে এই আনন্দ। দাদূর একটা শ্লোক আছে—

জিহিঁ বরিয়াঁ য়হু সব ভয়া সো হম কিয়া বিচার।
বখনাঁ বরিয়াঁ খুসী কী, কর্তা সির্জনহার॥

এ-সব যখন হয়েছিল সে ক্ষণের কথা আমি চিন্তা করে দেখেছি। সে ক্ষণটা হল আনন্দের।— সৃষ্টির গভীরে চলেছে একটা আনন্দপ্রবাহ, চৈতন্যপ্রবাহ, একটা বিশুদ্ধ অস্তিত্ববোধের প্রবাহ— এ তিনই মূলে এক কিন্তু— সে প্রবাহ নিরন্তর চাইছে নিজেকে বাইরে খুঁজে পেতে। একেবারে জড় থেকে শুরু করে সৃষ্টির সব-কিছুতে এই আনন্দ চৈতন্য এবং বিশুদ্ধ অস্তিত্ববোধ প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে— প্রকাশ চাইছে। সব-কিছুই তো সেই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম। অসৎ, অচিৎ, অনন্দ বলে যা মনে হচ্ছে তাও তিনিই; না-তিনিতে involved হয়ে স্বরূপে ফিরছেন, evolve করছেন, তিনিই। এই হল সৃষ্টির আদিরহস্য। সৃষ্টিটা হল সগুণ ব্রহ্মের লীলা। নির্‌গুণ ব্রহ্মের এ-সব বালাই নাই—

না ছিল অস্তি নাস্তি তখন
না ছিল আলোক অন্ধকার।

এখন শিল্পকথায় ফেরা যাক্‌। শিল্পের কাজ হচ্ছে জীবনের আর সব activityর মতোই সৃষ্টির অন্তরের আনন্দকে বাইরে টেনে আনা। মানুষ আমরা অবিরত আনন্দ খুঁজছি; সুখ খুঁজছি, শান্তি খুঁজছি, তৃপ্তি খুঁজছি। মায়া-কুহেলিকার আড়ালে প্রচ্ছন্ন রয়েছে আনন্দ; কত আবিলতার মধ্যেও, সব কাজেই

[১] দ্রষ্টব্য: শিল্প কেন: শিল্পদর্শনের ভূমিকা (১৯৫৯)

আমরা আসলে খুঁজছি ওই আনন্দকে— ব্রহ্মকে— আমাদেরই অন্তরতম বিশুদ্ধ ভাবকে। একমাত্র সচ্চিদানন্দই হচ্ছে সত্য : The Reality। এ'কে, আমাদের এই স্বরূপকে আমরা অবিরত আবিষ্কার করে চলেছি— খণ্ডশঃ, একেবারে ভাসা-ভাসা ভাবে। সামান্যতম আভাসে পেয়ে তাকেও সত্য বলে জানছি; এই ভাবেই আমরা এগুচ্ছি। এই খণ্ড সত্য, সত্যেরই অংশ ব'লে সত্য, অথচ সমগ্রটা পাচ্ছি না বলে মিথ্যেও।··· আপনার প্রবন্ধে 'সত্য কী বস্তু' ইত্যাদি বড়ো অস্পষ্ট হয়েছে।···

সৃষ্টির সব-কিছুর মধ্যেকার সত্য, তার আনন্দময় রূপ, আমরা শিল্পে ফুটিয়ে তুলি। দেখি কী করে? অন্তরের বা আত্মার যোগে। আনন্দ বা চৈতন্য বা অখণ্ড-অস্তিত্ব-বোধ এই যোগসূত্র। এর কৃপায় আমরা জানি আমরা এক, অখণ্ড— ওই পাথর, ওই ফুল, ওই গোরু, ওই ছেলেটা, এরাও আমি নিগূঢ়তম অন্তরের মধ্যে। অর্থাৎ, intuitionএর মাধ্যমে আমরা সৃষ্টির সব-কিছুর রস আহরণ করি। Intuition is the state of common self-existence in which the knower and the known are one through knowledge। সাদা বাংলায়, কোনো কিছুতে তন্ময় হতে পারলে তার স্বরূপরহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়— তাকে আমি 'ওটাও আমি' বলে চিনি। আমাদের আত্মবোধের বাতায়ন হঠাৎ খুলে গিয়ে যখন (আমাদের চৈতন্যরূপের) এক-আধটা জ্যোতীরশ্মি এসে পড়ে তখন সেটা প্রায়ই নিখুঁতভাবে আমাদের বহিশ্‌চেতনায় ধরা পড়ে না। তার কারণ, আমাদের egoর বিকাশের স্তর -অনুযায়ী, মন প্রাণ বা দেহ -আত্মিকা বুদ্ধি লড়ালড়ি করে সেটাকে দখলে নেয় আর নিজের মতো করে বহিশ্‌চেতনার কাছে ধরে দেয়। শিল্পের মধ্যে যে সত্য ফুটিয়ে তোলা হয় তার মৌলিক রূপ কতটা বজায় থাকবে সেটা নির্ভর করে সত্যের প্রকাশের প্রণালীর উপর।

আপনার প্রবন্ধে আদর্শ শিল্প ও আদর্শ শিল্পীর কথা আলোচিত হয়েছে।··· একটা কথা আপনার স্পষ্ট করে বলা উচিত ছিল, সেটা হচ্ছে: স্বরূপের সাক্ষাৎ হয়ে গেলেই আনন্দের বহিঃপ্রকাশ হবে, অন্তত শিল্পাদিতে, এ তো বলা চলে না। নির্‌গুণ ব্রহ্ম লাভ করলে যোগী তো ডুবে গেল Absoluteএ। সৃষ্টি করায় তার প্রয়োজন বা অবকাশ কৈ? অতল সাগরের গর্জন নর্তন নাই। পরিষ্কার আকাশে সূর্যের দিকে চাইবে যে তার নজরে আর-কিছুই পড়বে না। এবং বলা চলে, মায়ার কুহেলিকা কিছু না থাকলে, অন্তত, শিল্পাদির সৃষ্টি চলে না। সূর্যের আলো রামধনু করে ফুটিয়ে তুলে প্রকৃতি শিল্পসৃষ্টি করে। কিছু খাদ না দিলে দশ জনের হাতে ফিরবার মতো সোনার অলঙ্কার, বোধ হয়, হয় না। শিল্পীর ব্যক্তিত্ব এই খাদ জোগায়।

আপনার প্রবন্ধে এই দশ জনের, রসিকসাধারণের, বিশেষ কোনো স্থান দেখছি না— সেই কথা এবার আলোচনা করা যাক।

শিল্পে সুনীতি-দুর্নীতির স্থান নাই বলেছেন। কথাটা ঠিক, কিন্তু ··· সত্য প্রত্যক্ষলব্ধ হয়ে ঋজুভাবে প্রকাশিত হতে পারত যদি শিল্পে তা হলে নীতির প্রশ্ন উঠত না। পরমজ্যোতির কণা যে প্রায়শঃ মায়াকুজ্ঝটিকার মধ্যে দিয়ে ফুটছে শিল্পে— থাদের সাহায্য নিতে হচ্ছে যে। সংসারের 'শুভ-অশুভ সুখ-দুঃখ লাভ-ক্ষতি জয়-পরাজয়' অমূলক কল্পনামাত্র সত্যিই যে মনে করে সে তো শিল্পী হবে না। বরং যে এ-সবের মধ্যে দেখবে সত্যের রূপ সেই হবে শিল্পী, সেই সত্যকে দেখবে এ-সবের মধ্যে আর মুগ্ধ হয়ে তাকে রূপ দেবে। মোদ্দা, আদর্শ শিল্পীর পক্ষে সুনীতি-দুর্নীতি বলে কিছু নাই— সত্য সূর্যসমই। কিন্তু রসগ্রহীতাদের কথা তো বাদ দিলে চলবে না। শিল্প তো শিল্পীরই আনন্দবিধানের জন্য নয়, অন্যের অন্তরেও তার সঞ্চার হওয়া চাই। এইজন্যই ওঠে নীতির প্রশ্ন। রস-গ্রহীতাদের চেতনায় স্তরভেদ আছে; সত্য সবাই একই রূপে ধরতে পারে না। রোদ মানুষের প্রাণস্বরূপ, কিন্তু সবার পক্ষে সব সময় তা ভালো নয়। এক রামায়ণের সত্য কত জনে কত ভাবে দেখে, সকলের দেখাই ঠিক— কারণ, সকলের ভিতরের প্রয়োজন তাতে মেটে।

একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। সম্প্রতি 'রাসপঞ্চাধ্যায়' ভালো করে পড়লাম। ও জিনিস কি সবার জন্যে? বৈষ্ণবেরা অন্তত এই পাঠের ব্যাপারে অধিকারভেদ মানেন। ঠিকই করেন। রস কারও চেতনায় [অচেতনায়?] প'ড়ে তাড়ি হয় এটা তো অস্বীকার করা যায় না। মোদ্দা, সুনীতি-দুর্নীতির কথা শিল্পের ব্যাপারে তোলা চলে রসগ্রহীতার দিকে চেয়ে। দুর্নীতির দোষ যদি কিছু থাকে তা শিল্পীর নয়, শিল্পের নয়— রসগ্রহীতাদের।

১৯ নভেম্বর ১৯৫১

লেখকের বক্তব্য

জগৎ ও জীবন মিথ্যাও বটে, সত্যও বটে ; লৌকিক এবং অলৌকিক। মিথ্যা লৌকিকতা বাহ্যতঃ এবং আমাদের অজ্ঞান তথা অনুপলব্ধি-বশতঃ। সত্য স্বরূপ আমাদের জ্ঞানে তথা উপলব্ধিতে। সত্যের পরিমাপ হয় কি না জানি নে। স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ। আলোচনার বিষয়— শিল্পের স্বরূপ, শিল্পের বাহ্যতঃ প্রতীয়মান বিষয় বা রূপ নয়। শিল্পের আত্মা তথা স্বরূপ সম্পর্কে (এ দেশের অলঙ্কারশাস্ত্র তাকেই বলেছে 'ধ্বনি', বলেছে 'রস') প্রাচীনের উক্তি এই যে, তা ব্রহ্মাস্বাদসহোদর। (এ নির্‌গুণ ব্রহ্ম নয়, সগুণ বা চিন্ময়)। সেই কথাই আমারও বলবার বিষয়, ভিন্ন ভঙ্গীতে। ভাষার ত্রুটিতে সম্যক্‌ পরিস্ফুট না হলেও, অভিনব বা অশাস্ত্রীয় কিছু নয়। শিল্প যে বাহ্যতঃ লৌকিক হয়েও আসলে অলৌকিক, সে কথাটা প্রাচীনেরা খুব জোর গলায় বলেছেন। আর্টের ক্ষেত্রে অরসিক ছাড়া **সামাজিক** সুনীতি-দুর্‌নীতির দোটানায় কেউ পড়বে না, তাই সে কথার উল্লেখও করবে না। **শিল্প প্রকাশ**। অপ্রকাশেই অচৈতন্য, অসুখ, অসত্য। নইলে সব তো সচ্চিদানন্দেরই ব্যঞ্জনা, অসতের বা নির্‌গুণ ব্রহ্মের নয়। জগতে বা জীবনে যা আবৃত, শিল্পে তারও উদ্‌ঘাটন সম্ভবপর। শিল্পের তাই কার্য। অপ্রকাশই শিল্পের দুর্‌নীতি। কবি বা শিল্পীর সত্তায় সামাজিক মানুষের আবৃত-সত্তার রাগদ্বেষের, অর্থাৎ লোভ ঘৃণা ভয় আসক্তি ঔদাসীন্য ইত্যাদির, প্রক্ষেপই দুর্‌নীতি।

মানবিক রাগদ্বেষের রূপ শিল্পী প্রকাশ করেন এক আশ্চর্য রকম বিবিক্তভাবে। শিল্পীর মধ্যে এই ভাব থাকলেই রসিকেরও (অন্যের নয়) এই ভাব, এই attitude অবশ্যই হবে ; তিনি জানবেন 'এটি আমার এবং আমার নয়ও বটে'। তা হলেই সংসারাসক্ত সামাজিক দৃষ্টিতে যা ভালো, যা মন্দ, প্রকাশে উভয়েরই রূপ বা স্বরূপ মাত্র দেখবার ও অনুভব করবার বিষয় হয়ে উঠবে— তারই সংস্পর্শে এসে রসিক বা 'সামাজিক' (প্রাচীন আলঙ্কারিকদের সংজ্ঞায়) কোনো প্রকারে রঞ্জিত বা দূষিত হবে না (এই অবস্থায় 'ভালো'ও দোষের, 'মন্দ'ও তদ্রূপ)— আপন স্বভাবে নন্দিতই ছিল এবং থাকবে। (বলা চলে, আপন স্বভাবকে ফিরে পাবে।) অনাসক্ত অনুরাগের দৃষ্টিতে রসিকের এই-যে অ-লৌকিক অ-পূর্ব ভোগ, চরম ক'রে দেখলে, অন্তর্যামী ভগবানেরও এই ভোগ বিশ্বের প্রত্যেক অণু-পরমাণুতে, প্রত্যেক জীবনে, প্রতি ক্ষণে। সুতরাং এ হল ভাগবত ভোগেরই সগোত্র। সাধক কবি যে ভাবে বলেছেন : সিনান করিবি, চুল ভিজাবি না।

পুনশ্চ

রূপস্রষ্টা বা রসিক কোন্ চোখে কী বস্তু দেখেন— ভদ্র অভদ্র, শ্লীল অশ্লীল, সামাজিকভাবে সংগত অসংগত, এ-সবের 'ভাসা-ভাসা বিচার কত নিম্নে পড়ে থাকে— তার সাক্ষ্য হিসাবে রবীন্দ্রনাথের 'য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি' (খসড়া)[২] থেকে একটি অংশ সংকলনযোগ্য ('চিত্রা'র সুবিখ্যাত কবিতা 'উর্বশী' এবং তারই সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে কবির বিভিন্ন ব্যাখ্যান, সেও তো শিক্ষিতসাধারণের অবিদিত নেই)—

সেদিন French Exhibitionএ একজন বিখ্যাত artist-রচিত একটি উলঙ্গ সুন্দরীর ছবি দেখলুম। কী আশ্চর্য সুন্দর! দেখে কিছুতেই তৃপ্তি হয় না। সুন্দর শরীরের চেয়ে সৌন্দর্য পৃথিবীতে কিছু নেই— কিন্তু আমরা ফুল দেখি, লতা দেখি, পাখি দেখি, আর পৃথিবীর সর্বপ্রধান সৌন্দর্য থেকে একেবারে বঞ্চিত। মর্তের চরম সৌন্দর্যের উপর মানুষ স্বহস্তে একটা চির অন্তরাল টেনে দিয়েচে। কিন্তু সেই উলঙ্গ ছবি দেখে যার তিলমাত্র লজ্জা বোধ হয় আমি তাকে সহস্র ধিক্কার দিই। আমি তো সুতীব্র সৌন্দর্য-আনন্দে অভিভূত হয়ে গিয়েছিলুম— আর ইচ্ছে করছিল আমার সকলকে নিয়ে দাঁড়িয়ে এই ছবি উপভোগ করি। বেলি যদি বড়ো হ'ত, তাকে পাশে নিয়ে দাঁড়িয়ে আমি এ ছবি দেখতে পারতুম।··· এই ছবি দেখলে সহসা চৈতন্য হয়— ঈশ্বরের নিজহস্তরচিত এক অপূর্ব সৌন্দর্য পশুমানুষ একেবারে আচ্ছন্ন করে রেখেচে এবং এই চিত্রকর মনুষ্যকৃত সেই অপবিত্র আবরণ উদ্‌ঘাটন করে সেই দিব্য সৌন্দর্যের একটা আভাস দিয়ে দিলে। এই দেহখানির শুভ্র কোমলতা এবং প্রত্যেক সুঠাম ভঙ্গিমার উপর বিশ্বকর্মার— সেই অসীমসুন্দরের অঙ্গুলীর স্পর্শ দেখা যায় যেন— এ কেবলমাত্র দেহের সৌন্দর্য নয়— একটি প্রেমপূর্ণ সুকোমল নারীহৃদয়— একটি অমর সুন্দর মানবাত্মা এরই মধ্যে বাস করে; তারই ভালোবাসা, তারই লাবণ্য এর সর্বত্রে উদ্ভাসিত হয়ে উঠচে··· চিরপ্রচ্ছন্ন রহস্য কতকটা প্রকাশ করে দিচ্চে।[৩]

[২] দ্রষ্টব্য: বিশ্বভারতী পত্রিকা: মাঘ-চৈত্র ১৩৫৬, পৃ ১৬১-৬২।

[৩] বানান আধুনিক। 'বেলি' রবীন্দ্রনাথের বড়ো মেয়ের ডাক নাম ছিল

লেখাঙ্কন

'চিত্র' প্রবন্ধে লেখাঙ্কনের এবং তদ্‌ভাবে ভাবিত চিত্রপদ্ধতির আলোচনা আছে। এ সম্পর্কে দেশীয় বিদেশীয় দুইজন গুণীর উক্তি পাঠকদের উপহার দেওয়া যেতে পারে। মুল্লাহ্‌ মীর আলী (জহাঙ্গীর বাদশাহ এঁর লেখাঙ্কন অতিশয় প্রীত মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখতেন) নিজের লেখার গর্ব করে বলছেন : বিস্ময়ের পর বিস্ময়ের সৃষ্টি করে আমার লেখনী প্রতি পদে, লেখার রূপ লেখার অর্থকে অতিক্রম করে বিরাজ করে এক পরমোৎকর্ষের স্বর্গে। সুডৌল অক্ষরের এক-একটি বঙ্কিমার পদতলে পরাভূত গগনগুম্বজ নতি স্বীকার করে, এক-একটি টানের মূল্য শোধ করতে মহাকাল হয় কতুর।

মীর আলীর এই উক্তি মোহমুগ্ধ মনের অত্যুক্তি বা প্রলাপ নয় নিশ্চয়ই। সিদ্ধশিল্পীর জীবনে, পরম মুহূর্তগুলিতে, এজাতীয় উপলব্ধিও এক-প্রকার সত্যই। তবু চীনা শিল্পীর উক্তির সঙ্গে এর কত তফাত। চীনা শিল্পীর নামটি ঠিক জানি নে, কোনো গ্রন্থের নির্দেশও দিতে পারব না। কিন্তু, সে-সবের প্রয়োজনও নেই। কারণ, পাঠক দেখতে পাবেন উক্তিটি কোনো-একজন চীনা শিল্পীর উক্তি নয়, যেন সমস্ত চৈনিক চিত্রশিল্পের, চৈনিক লেখাঙ্কনেরও বটে— কারণ, চীনা রসোত্তীর্ণ চিত্রে আর লেখাঙ্কনে আন্তরিক মিল আছে— উভয়েরই মর্মকথা। গুণী বলছেন : ঘাসের একটি পাতা যখন আঁকি তখনই স্পর্শ করি আমি অনন্তের অঞ্চলপ্রান্ত : I touch the hem of Eternity.

এরূপ শিল্পও অসামান্য, তার সমঝদারিও সুকঠিন।

কারুকলা প্রসঙ্গে

শ্রীনন্দলাল বসু

প্রিয় কানাই, চীনাদের প্রদর্শনীর কথা তোমার পত্রে জানলাম ও একটি catalogue'ও পেয়েছি। হাঁ, চীনাদের কারিগরি বিশ্ববিখ্যাত। চীনারা বড়ো যত্ন ও 'finish' করে কাজ করতে জানে। এখনকার আমাদের মতো তাড়াহুড়ো, যা তা কাজ চালানোর মতো কাজ করে না।

চীনাদের decoration একটু realistic-ঘেঁষা, আমাদের decoration বেশি-রকম abstract-ধর্মী— অবশ্য সেখানেই আমাদের সাহস ও বিশেষত্ব খানিকটা। চীনাদের প্রকৃতির জিনিসের প্রতি এত ভালোবাসা যে তাকে একটুও ক্ষুণ্ণ করা তাদের সয় না। বৌদ্ধ শিল্প থেকে আমাদের abstract decoration'ও চীনারা নিয়েছিল। কিন্তু তাতে ওদের প্রাণকে তত নাড়া দেয় নাই। যতটুকু নিয়েছিল তা ওরা বেশ খাপ খাইয়ে ব্যবহার করেছিল। চীনারা পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ কারিগর। ভারতীয় শিল্পীদের মন sculptor হবার উপযোগী। চীনারা প্রকৃতির উপাসক, প্রকৃতির দুলাল। কিন্তু বিলাতী শিল্পীদের মতো প্রকৃতির অন্ধ উপাসক নয়। বোকার মতো হুবহু নকল করে ক্ষান্ত হয় নি, aesthetic sense বজায় রেখেই তা কাজে লাগিয়েছে।

ভারতীয় শিল্পীরা abstract-ঘেঁষা বলে ভাস্কর্যে ভালো হয়েছে। আর চীনারা পৃথিবীতে নৈসর্গ চিত্রে ওস্তাদ। ওরাই জাত-চিত্রশিল্পী।

২২।৩।১৯৫৫
শান্তিনিকেতন

অজন্তাচিত্রের উত্তমর্ণ-সন্ধান

শ্রীপৃথ্বীশ নিয়োগী

দ্রষ্টব্য পাদটীকা ৬, পৃ ৫৮-৫৯

'চীনে মেজাজ' কী? Han যুগে, প্রায় 2nd century A. D.তে ইঁটের উপর আঁকা ছবিই হয়তো প্রথম-পাওয়া খাঁটি চীনে ছবি। ঐ সময়েরই কবরের ভিতরের খুব নিচু relief— যে-সবের কালীতে তোলা ছাপ প্রায়ই দেখা যায়— এই দু ধরণের জিনিস থেকে অনুমান করা যেতে পারে ছবির 'মেজাজ'।

কিংবদন্তীর ক্ষেত্রে বিখ্যাত প্রথমে Ku Kai-chih (4th century A. D.), তার পর Wu Tao-tzu (8th century A. D.)। এঁদের কাজ কী ধরণের ছিল তার বর্ণনা পাওয়া যায় 5th & 9th century A. D. থেকে। Ku Kai-chihর ছবির একটি পরবর্তী কালের নকল আছে British Museumএ। আর, Wu Tao-tzuর ছবির বর্ণনা থেকে পরের প্রায় সমস্ত খাঁটি চীনে ছবির 'মেজাজ' বোঝা যায়। এর সঙ্গে Hanএর ইঁটের অমিল নেই। কম রঙের জোরালো calligraphic কাজ। লেখার অক্ষরের সঙ্গে ছবির বিশেষ মিল এর মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত। spaceএ ভাসছে form— যা পরে আরো স্পষ্ট হয়। figures সর্বদাই drapery দিয়ে ঢাকা। depictionএর বদলে suggestion, আর brush strokesএর বর্ণমালা। ভারতীয় ছবির সঙ্গে মিল কতটা?

অন্য দিকে ভাবুন Herat, Bamiyan, Begram, Hadda, Taxila আর Khotan, Dandan Uliq, Kizil, Kucha, Turfan আর Tun-huang ইত্যাদি। রোমান, ইরানীয়, ভারতীয়, চীনের পদ্ধতির নানাবিধ মিশ্রণ। প্রেরণা— বুদ্ধ। মেশা— 'mechanical mixture', উপর উপর প্রায়ই।

চীনের Tun-huang— প্রথম গুহা late 4th century A. D., আর বেশির ভাগ 6th century A. D.— কখনো চীনে কখনো ভারতীয় ধারা প্রখর। ঠিক মিশ্রণ যদি হয়ে থাকে, তবে তা চীনের Tang যুগের (7th-10th century A. D.) বৌদ্ধ ছবিতে।

অজন্তা 2nd or 1st century B. C. — late 6th century A. D. মোটের উপর। প্রথমেই সহজেই নজরে পড়ে form এবং space -এর সম্পর্ক — spaceও আসলে যেন formই। Time অখণ্ড। রঙ গভীর, luminous,

সম্পূর্ণ। ideal light, abstract modelling, আর রেখা calligraphyর দিকে না গিয়ে formative হয়েছে, ভৌল দেখাচ্ছে। অজন্তার grouping এবং composition -এর বৈশিষ্ট্য বাগ গুহায়ও মেলে। ভঙ্গ এবং মুদ্রার চিরাভ্যস্ত অমোঘ প্রয়োগ কোন্ দেশ থেকে এল ? তারিখগুলোর কথাও ভাবুন।

চীন দেশের সম্পূর্ণ নিজস্ব ধারা এবং 'মেজাজের' সঙ্গে অজন্তার সুদূর কোনো মিল নয়, লেখক বলছেন চীনেরাই প্রধানতঃ অজন্তা এঁকেছেন প্রায়। বুঝলাম এমন বলতে পারি না। আর, Tangএর বৌদ্ধ ছবিতে অজন্তার প্রভাব সন্দেহের বাইরে।

ইতিহাসের অন্যান্য নজির আর অলৌকিক বুদ্ধমূর্তির চীন-যাত্রার প্রসিদ্ধির কথা তুলছি না।

অজন্তার সময়ে ভারতবর্ষ পৃথিবীর বাইরে ছিল না ঠিক। এখানকারই নানা জাত ছাড়াও অনেক বিদেশী চেহারার সঙ্গে অপরিচয়ের কারণ ছিল না। দেশী এবং বিদেশী types অজন্তায় যত্ন করেই দেখানো হয়েছে। এরকমও হতে পারে যে, কখনো কোনো বিদেশী শিল্পী ভারতবর্ষেই থেকে গিয়ে কাজ করেছেন এখানে। সে কাজ ভারতীয় শৈলীরই অন্তর্গত। technical details নিয়ে কিছু speculate করা যেতে পারে।··· তবে লেখক বোধ হয় বলতে চান যে, চীনে এবং পারসীক শিল্পীরা ছাড়া কেই বা ভারতবর্ষের নানা স্তরের জীবনযাত্রার খুঁটিনাটি, ভাবভঙ্গি, এমন অন্তরঙ্গভাবে ও সহজে দেখাতে পারত। [ভারতবাসীর পারবার কথাই তো ওঠে না।] এ কথা ভাববার।

আর, লেখক যখন অজন্তার বিশেষ করে grouping, space এবং রঙকে খুব চীনে 'মেজাজের' বলে ধরতে পেরেছেন, তখন নিতান্ত originalityর জন্য তাঁকে সাধুবাদ না দিয়ে সত্যিই কি গতি আছে ?

৩।১০।১৯৫৭

'গোষ্ঠলীলা' চিত্র সম্পর্কে

শ্রীনন্দলাল বসু

দ্রষ্টব্য পাদটীকা ৩, পৃ ৯০

কানাই, চিঠি দেখলাম। আর, ছবিটিও দেখলাম। হাঁ, ইহাকে কালীঘাটের landscape বলতে পারো। তবে একটা তফাত আছে; সে হল কালীঘাটের পটের নিদর্শন যা সচরাচর দেখি তা খানিকটা চীনা এক stroke-এর কাজের মতো একটিমাত্র rhythmএ করা। আর, এই landscapeএ কেবল আঁকায় ও তুলিচালনার কায়দায় কালীঘাটের পটের মতো ঠিক হয়েছে। খানিকটা রাজপুত ও কাংড়া ছবির মতো। এইরূপ একটি ছবি হ্যাভেলের কি কুমারস্বামীর বইয়ে আছে; প্রায় একই subject, গোষ্ঠের ছবি।

তবে কি এই ছবির পূর্বপুরুষ রাজপুত ছবি? অন্তত এ ছবির line ও execution একই ধরণের; কেবল সেই-সব tempera কাজে কালীর line নয় এইমাত্র। সাদা কাগজে এর finish করার ধরণ একই রকম। lineএর টান calligraphic line-এর মতন। কিছু পর্দাজ করাও আছে। shade দিয়ে মিলিয়ে দেওয়া আছে— খানিকটা চীনা ছবিতে যেমন কালী জল-তুলি দিয়ে মিলিয়ে দেওয়া হয়ে থাকে। যা কালীঘাটের পটেও আছে। subjectএর দিক দিয়ে কালীঘাটের পটে একটিমাত্র subject, যাকে হাইকাই ছবি জাপানী আর্টিস্ট্‌রা বলে। ছবির execution ও লাইনের execution সব মিলে complete whole— artist ছবার ভাবে নি। কিন্তু এই landscapeএ বেশ ধ'রে ধ'রে composition করা হয়েছে। কেবলমাত্র কালীতে করা নয়, সাদা কাগজে (জমি তৈরি করা হয় নি) টেম্পারা। এইরকম কাজ আমি ঢাকাই আর্টিস্ট্‌দের করা oil painting-এ দেখেছি— একটি 'অবিদ্যা' তব্‌লা বাজাচ্ছে— আর, দুর্গার চালচিত্রে কুমারটুলির পোটোরাও করে। যমপটের scrollএ বাঁকুড়ার আর্টিস্ট্‌রা করে। এসবের নমুনা কলাভবনে আছে।

'কালীঘাটের ছবি'র জাতই আলাদা। মাত্র একটি ভঙ্গিমা। বড়ো simple। compositionএর জটিলতা নাই। ঠিক বুঝাতে পারলাম কি না জানি না।

শান্তিনিকেতন
২৯. ৮. ১৯৫৬

অবনীন্দ্র-প্রতিভা সম্পর্কে

শ্রীনন্দলাল বসু

কানাই, তোমার পত্র পেলাম। অবনবাবুর ছবির বিষয়ে আমি আর কী বলতে পারি। উনি একজন ক্ষণজন্মা প্রতিভাবান্ শিল্পী এ যুগের। বিচার-বিশ্লেষণে ওঁর প্রতিভার নিঃশেষ ধারণা সম্ভবপর নয়। রঙেতে আর বস্তুর বাস্তব রূপেতে মিলে ওঁর ছবিতে অদ্ভুত দরদ আছে। রঙের মিড়ই ওঁর ছবির গতি ও প্রাণ। প্রথাসম্মত প্রাচ্য ছবির মতো রেখানির্ভর নয়। অথচ বিলাতি ছবির মতো বাস্তব রূপের উগ্র প্রত্যক্ষতা নাই, আছে তার আভাস, তার ব্যঞ্জনা। টাট্‌কা ফোটা ফুলের সৌগন্ধ আছে, শুক্‌নো আর পচা ফুলের শুষ্কতা ও দুর্গন্ধ নাই। ফুলের আলোক-উন্মুখ জীবনের দিকটাই বেছে নেওয়া হয়েছে, মৃত্যুর দিক না। বিলাতি উগ্রবাস্তবপন্থী ছবিতে রূপের এরূপ selection বা বাছ-বিচার নাই। অবনবাবুর ছবির এসব গুণ, এরূপ প্রকৃতি, প্রাচ্য ছবিরই গুণ ও প্রকৃতি। সেজন্য তাঁর ছবিতে বিলাতি বাস্তবপন্থী ছবির গুণ ও oil painting-এর ও জাপানি সিল্কের ছবির ধোওয়াঁটে ধরণের technique থাকা সত্ত্বেও, তা প্রাচ্য। ওঁর ছবি ব্যঞ্জনাময় ও কল্পনাপূর্ণ ঠিক যেন কবিতার মতো, গানের মতো। **এরূপ একাধারে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিস্ময়কর সংমিশ্রণ এবং তা থেকে একটি নিজস্ব ও সার্থক স্টাইলের সৃষ্টি কেবল অসামান্য প্রতিভার ক্ষেত্রেই সম্ভব।**

এ মিশ্রণ ও মিলন তাঁর শেষ দিকের আরব্য উপন্যাসের ছবিগুলিতে ভালো-ভাবে ও প্রচুর ভাবে হয়েছে। আগেকার সব ছবিতে একটা প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়ে একটা নিজস্ব স্টাইলের অনুসন্ধান দেখা যায়। এই struggle এবং অনুসন্ধান ওঁর চিত্রসৃষ্টির ইতিহাস অনুধাবন করলে বুঝতে পারা যাবে।

গোড়ায় বিলাতি পদ্ধতিতে water colour-এর কাজ, pen & ink-এর কাজ, pastel-এর কাজ বহু করেছেন; খুব ভালো ভাবেই আয়ত্ত করেছেন। হঠাৎ বিলাতি, হাতে আঁকা, একখানি যিশু খৃস্টের ছবি ওঁর পিতার কোনো-এক হাঙ্গেরিয়ান বন্ধুর কাছে পেয়ে[১], ঐ ধরণে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার ছবি আঁকার ইচ্ছা হল। *ঘটনাচক্রে ঐ সময়েই ওঁদের এক আত্মীয়া পাটনা কলমের ছবির একখানি album*

১ শ্রীমুকুল দে বা 'শ্রুতিধরী' শ্রীমতী রানী চন্দ অন্যরূপ লিখেছেন। সবগুলি তথ্যের সামঞ্জস্য-সাধন, বা উক্তিবিশেষের ভ্রম-প্রদর্শন, সে দায়িত্ব নেবেন অবনীন্দ্রনাথের ভাবী জীবনী-কার। কা. সা.

দিলেন। তখন অবনবাবুর ইচ্ছা হল বিলাতি পদ্ধতিতে না এঁকে, দেশী পদ্ধতিতেই ছবি আঁকবেন। এ বিষয়ে বৈষ্ণবপদাবলীর ভাব ও বর্ণনা তাঁকে বহুশঃ প্রভাবিত করেছিল আর রবীন্দ্রনাথের 'ভানুসিংহের পদাবলী' গান এবং কবিতাও তাঁর প্রতিভার বিকাশে সাহায্য করেছিল। ক্রমশ স্বতন্ত্র অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দেখতে পেলাম। দেশী[২] ছবির মতো কাটা কাটা রঙের blocks নাই, কিন্তু রঙের স্বাতন্ত্র্য আছে। রঙের কর্কশতা ও উগ্রতাকে রঙের মিড় দিয়ে, আবছা আবছা ভাব দিয়ে, মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং একটি রঙের স্বপ্নলোক রচনা করা হয়েছে যেখানে চোখ ভ'রে যেন বীণার ঝঙ্কার শুনি, গানের তান ও মিড় শুনতে পাই— যেমনটি পরবর্তী অন্য কোনো শিল্পীর কোনো ছবিতে নাই। ডাচ্ স্কুলের বাস্তব ছবির মতো বাস্তব, অথচ বাস্তবতার উগ্রতা নাই, ছবির বিষয়কে ঘিরে আছে ও ব্যাপ্ত করে আছে অপরূপ একটি ভাবের পরিমণ্ডল— ব্যঞ্জনার আবহাওয়া।

জানুয়ারি ১৯৫৬

২ রাজস্থানী কাংড়া প্রভৃতি

ভ্রমসংশোধন

পৃষ্ঠা। ছত্র নির্দেশ-পূর্বক কতকগুলি মুদ্রণপ্রমাদের সংশোধন এখানে দেওয়া গেল। × চিহ্নে পাদ-টীকার ছত্র দ্রষ্টব্য। প্রমাদের উল্লেখ প্রায়শঃই অনাবশ্যক —

৫।১২	রূপায়ণের
৬।২৩	অনুদ্গতশৃঙ্গ
৯।১৯	দেখিবারে
১৪।১০	অণুপরমাণু
২৬।১০	অণুতে অণুতে
৫১।৫	লাঠাই ('লাট্টু' স্থলে)
৬৪।২৮	ধ্রুব
৬৮।৩	ধ্রুব
৬৯।১৮	মধ্যে,
৯৪।শেষ	কী
১০৭।২২	ভাগীরথী
১১৬।৩	গৃহত্যাগ
১১৬।শেষ	গগনেন্দ্রনাথ
১১৮।৪×	কুহেলী
১২৪।শেষ	নীরঞ্জন
১২৬।২৩	নয়।
১৪৪।৩	উচ্ছ্রিত আকুল···ফোয়ারা ('অকূল আকুল···ঝর্ণা' স্থলে)
১৪৪।২৯	অনমুভূতপূর্ব ('অনমুভূত' স্থলে)
১৪৭।১-২	[২]পোয়ে-নাচের ··· বিচিত্রবর্ণক্ষর
১৪৮।২	কন্‌ভেন্‌শন-গত
১৪৯।২৭	বিশেষের ('বিশেষ' স্থলে)
১৫৬।২	নিশ্চেতনাসিন্ধুর
১৬৫।২১	ভাগীরথী
১৭৮।৫×	অবশ্যক ('আবশ্যক' স্থলে)
১৮০।১×	আকরগ্রন্থে মুদ্রিত ('মুদ্রিত' স্থলে)